তফসীরে নূরুল কোরআন

নবম পারা

৯

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

নবম খণ্ড

তফসীরে নূরুল কোরআন

নবম খন্ড

৯

নবম পারা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ,
তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ
এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

চতুর্থ প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০১৬ইং

গ্রন্থ সত্ত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩০০.০০

মুদ্রণে ঃ নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০

মোবাইল ঃ ০১৭১৩-০১৪৮৮৯, ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (V); 9. Published by Al-Balag Publications 12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A, Dhaka-1207 Price : 300.00.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

পরম করুণাময় অনন্ত অসীম দয়াময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের নবম খন্ড (নবম পারা) পেশ করার তওফিক দান করেছেন। তাঁর তওফিক ব্যতীত এ মহান কাজ কোন দিন কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। তাই তফসীরে নূরুল কোরআনের নবম খন্ড প্রকাশনার এই শুভ মুহূর্তে দরবারে এলাহীতে পেশ করি সেজদায়ে শোকরানা। অগনিত দরূদ ও সালাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর আল আওলাদের প্রতি, যাঁর নেক নজরের বরকতে আল্লাহ্ পাকের এ তওফিক লাভ করেছি। হে আল্লাহ্! দরূদ পেশ কর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, দুনিয়ার শুরু থেকে এ পর্যন্ত বৃষ্টির যত ফোঁটা মাটিতে পড়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত পড়বে সে সবের সংখ্যা মোতাবেক। বস্তুতঃ প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নেক নজর না হলে আল্লাহ্ পাকের রহমত হতো না। আর আল্লাহ্ পাকের রহমত না হলে তফসীরে নূরুল কোরআন রচনা করা সম্ভব হতো না। অতএব, আল্লাহ্ পাকের দরবারে পেশ করি অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠ থেকে অন্তহীন শোকর।

মানব-মনে পবিত্র কোরআনের প্রতিক্রিয়া

পবিত্র কোরআন এমনি একটি মহান গ্রন্থ যার সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনাতীত। এর সবই বিস্ময়কর, সবই অলৌকিক এবং এতে বর্ণিত প্রতিটি বিধি নিষেধ চির অনুসরণীয় চির অনুকরণীয়। মানুষের মন-জগতে পবিত্র কোরআন যে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা মানব রচিত কোন গ্রন্থ দ্বারা শুধু যে অসম্ভব তাই নয়; বরং অচিন্তনীয়ও বটে। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরায়ে মুজাম্মেলের এ আয়াত খানি তেলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَّجَحِيمًا وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيمًا

নিশ্চয় আমার নিকট আছে শৃংখল প্রজ্জলিত অগ্নি, আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি। তখন তাঁর পশ্চাতে ছিলেন হযরত হামরান এবনে আইয়ুব (রাঃ) তিনি এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর মনে এ আয়াতের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। একবার

খলিফাতুল মোসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) পবিত্র কোরআনের এ আয়াত খানি তেলাওয়াত করছিলেন–

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

(যখন আমলনামা খোলা হবে)

এ আয়াত পাঠ করা মাত্রই তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন এবং অনেকক্ষণ বেহুশ ছিলেন। একরাত্রে হযরত হাসান এবনে সালেহ (রঃ) সূরায়ে নাবা বার বার পাঠ করছিলেন। এরপর বেহুশ হয়ে গেলেন। তিনি সূরা শেষ করতে পারলেন না। বেহুশ অবস্থায়ই রাত শেষ হলো।

রবি এবনে হোসাইন (রঃ) শ্রবণ করলেন এক ব্যক্তি এ আয়াত তেলাওয়াত করছেঃ

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا

যখন দোজখ তাদেরকে দূর থেকে দেখবে তখন তারা শ্রবণ করবে তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার। এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র রবি এবনে হোসাইম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। লোকেরা তাঁকে বাড়ী পৌঁছায়, তাঁর চার ওয়াক্ত নামায (যোহর, আসর, মাগরিব, এশা) কাজা হয়ে গেল। এরপর তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, মানব মনে পবিত্র কোরআন কি ইনকিলাব আনে এ ঘটনা তারপ্রিকৃষ্ট প্রমাণ।

একবার এজিদ রোকাসী (রঃ) হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ)-এর নিকট গমন করলেন। হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ তাঁকে নসিহত করার জন্য বললেন। তিনি বললেনঃ হে আমিরুল মোমেনীন। আপনি প্রথম ক্ষমতাবান ব্যক্তি নন যে মৃত্যু মুখে পতিত হবে। ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ) ক্রন্দন কররেন এবং আরো নসিহত করার জন্য বললেন। তখন তিনি বলরেন হে আমিরুল মোমেনীন! আপনার এবং আপনার দাদা আদম (আঃ) এর মধ্যে যত পিতা ছিলেন বর্তমানে তাদের কেউ জীবিত নেই। আমিরুল মোমেনীন তখন ক্রন্দন করলেন এবং আরো নসিহতের কথা বললেন, তখন তিনি বললেনঃ জান্নাত এবং দোজখের মধ্যখানে আর কোনস্থান নেই, আখেরাতে হয় জান্নাত নয়ত দোজখে যেতে হবে। তখন আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ ক্রন্দন করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের নূরে যখন মানব অন্তর আলোকিত হয় তখন তাদের এ অবস্থায়ই হয়। ফোজায়েল এবনে ইয়াজ (রঃ) একদিন ফজরের নামাযে সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করছিলেন। যখন এ আয়াত–

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ

(তা হবে এক মহান নিনাদ ফলে তারা সকলে আমার নিকট হাজির হবে।)

পাঠ করলেন তখন হযরত ফোজায়েল এবনে ইয়াজে পুত্র আলী (রঃ) বেহুশ হয়ে গেলেন, সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলো না। তাঁর অবস্থা এই ছিল

কোরআনে করীমের কোন সূরা পাঠ করার ইচ্ছা করতেন, কিন্তু কোন দিনও শেষ করতে পারতেন না। এমনকি সূরা "জিলজাল" এবং সূরায়ে "আল ক্বারিয়া" কোন দিন শ্রবণও করতে পারতেন না। কেননা, এ সূরা সমূহের মধ্যে কেয়ামতের পূর্বের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ রয়েছে। তিনি তাঁর পিতা হযরত ফোজায়ের এবনে ইয়াজ (রঃ) এর নিকট বলতেন আমার জন্য দোয়া করুন যেন আমি কোন একটি সূরা বা সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি।

হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ পূর্ব যুগে যদি কেউ রাত্রে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন তবে সকারৈ তার চেহারার অবস্থা দেখলে এর প্রমাণ পাওয়া যেত।

এখন প্রশ্ন হলো বর্তমানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করলে এমন প্রতিক্রিয়া কেন পরিলক্ষিত হয় না? এর একাধিক কারণ রয়েছেঃ এ পর্যায়ে প্রথম কারণ হলো এ যুগের মানুষ পবিত্র কোরআন রোঝেনা, বিশেষ করে বাংলা ভাষী মুসলমান ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় কোন মৌলিক প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ না থাকার কারণে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করা সম্বব হচ্ছে না। অনেকেই ইচ্ছা আছে কিন্তু উপায় নেই। বস্তুতঃ আজ পবিত্র কোরআনের মর্মবাণীর প্রচার প্রসারের একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের আয়োজনেই তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা।

এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আখেরাতের নাজাতের আশায় শুরু হয়েছে এ সাধনা।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক দয়া করে অদ্য তফসীরে নূরুল কোরআনের নবম খন্ড পর্যন্ত রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দান করছেন। এজন্যে শোকর গুজারীর ইচ্ছা আছে কিন্তু সাধ্য নেই। কেননা, আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত তাঁর শোকর আদায় করাও সম্ভব নয়। আর শোকর আদায়ের তৌফিকও একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত, এই নেয়ামতের শোকরগুজারীও আমাদের একান্ত কর্তব্য, অতএব, নেয়ামতের সংখ্যা অগনিত, আর শোকরগুজারীর সাধ্য সীমিত, তাই মোনাজাত করি– হে আল্লাহ! তোমার নেয়ামতের শোকর আদায়ের তৌফিক দান কর। তফসীরে নূরুল কোরআনের এই সাধনাকে কবুল কর এবং এই মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। আখেরাতে এই অধমকে তোমার খাছ রহমতে নাজাত দিও।

হে আল্লাহ! তোমার দরবারেই আমাদের আশা, আর তোমার প্রতিই আমাদের ভরসা। যারা তফসীরে নূরুল কোরআন রচনা ও প্রকাশনায় আমার সাথে সহযোগিতা করেন এবং ভবিষ্যতে করবেন, আর যারা এ মহান গ্রন্থ পাঠ করেন তাদের অন্তরকে পবিত্র কেরআনের নূর দ্বারা আলোকিত কর এবং দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে আমাদের সকলকে সফলকাম কর। আমীন।

বিনীত

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
তফসীরুল কোরআন	২
হেদায়েত আল্লাহ পাকের হাতে	৩
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১২
বরকতের তাৎপর্য	১৩
বরকত ও নেয়ামত ঈমান ও পরহেযগারীর ফলশ্রুতি	১৪
যাদু দ্বারা মোজেযার মোকাবেলা করা যায় না	২১
হযরত মূসা (আঃ) এর মোজেযার বিবরণ	২৪
যাদুরকররা একত্রিত হলো	২৭
আল্লাহ ওয়ালা ও দুনিয়াদারদের পাথর্ক্য	২৭
যে সত্য প্রমাণিত হলো	৩০
ঈমান লাভের পর ভয় শুধু আল্লাহর প্রতি	৩৪
মোজেযা ও যাদুর পার্থক্য	৪২
ফেরাউন সম্প্রদায় শিক্ষা গ্রহণ করলোনা	৪৭
কাফেরদের প্রতি বিভিন্ন আযাব	৪৯
আল্লাহর নাফরমানদের জীবন দুর্বিসহ	৫০
পূর্ববর্তী আয়াতে সাথে সম্পর্ক	৫৭
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	৬৫
প্রয়োজনে প্রতিনিধি নির্বাচন করা	৬৬
বনী ইসরাঈলের পথভ্রষ্টতা	৬৭
মধুর আলাপের পরিবেশ	৬৮
মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের কালাম কিভাবে শ্রবণ করলেন	৬৮
আল্লাহ পাকের দীদার লাভের আরজী	৬৯
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	৭০
আল্লাহ পাকের দীদার	৭১
হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহর দীদারের আরজী পেশ করলেন	৭২
আয়াত সম্পর্কে আর কিছু কথা	৭৬
আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করা	৭৭
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর উচ্চ মর্তবা	৭৯
উম্মতে মোহাম্মাদয়ার ফজিলত	৮২
আল্লাহ পাকের মুবারক কুদরতী হস্তে যা তৈরী হয়েছে	৮৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৯২
কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়	৯৭

গো-বৎসের নির্মাতা সামেরীর পরিণাম--১০১
কোন কোন গুনাহর শাস্তি দুনিয়াতে হয়-- ১০১
হযরত মূসা (আঃ)-এর আরজীর জবাব--১০৯
উম্মী নবীর ব্যাখ্যা--১১১
জীবনের সাফল্য কোন্ পথে?--- ১১৬
পবিত্র কোরআন হলো নূর--- ১১৭
পবিত্র কোরআনের সাথে সুন্নতে রসূলের অনুসরণও জরুরী-------------------১১৭
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান, তা'যীম এবং
মহব্বত অবশ্য কর্তব্য--- ১১৭
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব-------------------------১১৮
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তা'যীম-------------------------- ১১৮
আয়াতের মর্মকথা-- ১২৪
খাতেমুন নাবিয়্যীন-- ১২৫
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য------------------------------১২৫
আয়াতের মর্মকথা-- ১৩২
আয়াতের আলোকে আজকের পৃথিবী--- ১৩৩
আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি কথা---১৪০
ইহুদীদের চির শাস্তির ঘোষণা--- ১৪৩
ইসরাঈল রাষ্ট্র এই ঘোষণার পরিপন্থী নয়------------------------------------ ১৪৪
আয়াত সম্পর্কে আরও কিছু কথা-- ১৪৯
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ঘোষণা-- ১৫২
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব---১৫৩
আমালুল কোরআন--১৫৪
হাদীস শরীফের আলোকে আলোচ্য আয়াত------------------------------------ ১৫৬
অঙ্গীকার কোথায় গ্রহণ করা হয়েছে---১৫৮
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব--১৬০
অঙ্গীকার কখন গ্রহণ করা হয়েছে--- ১৬১
বলঅমের পরিণাম--- ১৬৬
শানে নুযুল সম্পর্কে আরো কথা--- ১৬৮
বনী ইসরাঈলের একজন বিখ্যাত আলেমের পথভ্রষ্টতার দৃষ্টান্ত----------------১৭০
ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য---১৭০
আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষনীয় বিষয়--১৭১
আয়াতের মর্মকথা-- ১৭৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক-- ১৭৯
শানে নুযুল---১৮০

আয়াতের দু'টি শিক্ষা-- ১৮৫
একটি প্রশ্ন ও জবাব-- ১৮৮
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক-- ১৯২
শানে নুযুল--১৯৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক-- ১৯৪
কেয়ামত ঘটবে অতর্কিত ভাবে--১৯৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক--২০৪
নেককার হওয়া পূর্বশর্ত-- ২১৫
একটি পরিপূর্ণ হেদায়েত নামা-- ২১৭
শানে নুযুল-- ২২৩
শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার পন্থা--২২৪
রসূলের দায়িত্ব-- ২২৭
পবিত্র কোরআনের আদব-- ২২৮
মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নীরব থাকার মধ্যে পার্থক্য--২৩১
জিকরে এলাহীর গুরুত্ব--২৩৩
জিকরে এলাহীর আদব-- ২৩৫
পবিত্র কোরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে--২৩৭
প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য-- ২৪৯
ঈমানের তাৎপর্য--২৫০
শানে নুযুল-- ২৫৪
আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা--২৫৮
বদরের যুদ্ধের আরো কিছু বিবরণ-- ২৫৯
আল্লাহর সাহায্য-- ২৬৬
ফেরেশতাগণ কি লড়াই করেছেন?--২৬৭
বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতরণ--২৬৮
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক--২৮০
ইসলামের জঙ্গী আইন-- ২৮২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক--২৮৫
শানে নুযুল-- ২৮৬
বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত-- ২৮৮
বদরের যুদ্ধে বিজয়ের আরো একটি বিবরণ--২৯০
আয়াতের মর্মকথা--৩০৩
আমানতের ব্যাখ্যা--৩০৯
আমানতের সর্বক্ষেত্রে-- ৩১০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক--৩২৬

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

নবম খণ্ড **নবম পারা**

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ
كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم
بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾

তরজমা

(৮৮) তাঁর জাতির দাম্ভিক প্রধানরা বলল, হে শোয়ায়েব! আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গের মোমেনদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। শোয়ায়েব বললেন, আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও?

(৮৯) তোমাদের ধর্ম থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে নাজাত দেয়ার পরও যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এমন অবস্থায় আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক ইচ্ছা না করলে তোমাদের ধর্মে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেকটি বিষয়কে তার জ্ঞানে ঘিরে রেখেছেন, আমরা তাঁরই উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ন্যায্য ভাবে ফয়সালা করে দাও, তুমি সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী।

তফসীরুল কোরআন

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতির দাম্ভিক লোকেরা বললোঃ আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদের সবাইকে আমাদের শহর থেকে বের করে দেব, আর যদি তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আস তবে তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন কলহ নেই।

অতএব, তোমাদের জন্য দু'টি পথ খোলা রয়েছে, হয় আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে নতুবা আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে لتعودن শব্দটি عود ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হল কোন কিছু থেকে বের হওয়ার পর আবার তাতে ফিরে আসা। এ শব্দটির তাৎপর্য হল, যারা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁর সাথী হয়েছেন তারা ইতোপূর্বে কাফের ছিল। এখন আবার যদি কাফের হতে হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার নিঃসন্দেহে সঠিক হবে।

কিন্তু হযরত শোয়ায়েব (আঃ) কখনও কাফের ছিলেন না। তাই তাঁর সম্পর্কে এ শব্দের ব্যবহার করা হয়নি; বরং তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরাম কুফর ও শেরক থেকে সর্বদা পবিত্র থাকেন। কোন ব্যক্তি নবুওয়্যতের পূর্বে কাফের ছিল, এরপর নবুওয়্যত লাভ করে মোমেন হয়েছে এমন কথা অবাস্তব, অসম্ভব, অকল্পনীয়।

এজন্যে তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এ শব্দটির প্রয়োগ হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সঙ্গীদের ব্যাপারই বিশেষভাবে করা হয়েছে। কেননা কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তনের কথাটি তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, এ শব্দটি কাফেরদের ধারণা মোতাবেক তাঁর সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, নবুওয়্যত লাভের পূর্বে তিনি তাদেরকে তৌহীদের দাওয়াত দেননি। হয়ত তারা ধারণা করেছে যে, তিনিও তাদের ধর্মেই আছেন। তাই তারা একথা বলেছে। যাহোক শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে এই হুমকি দেয় যে তোমাদেরকে আমরা শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে।[১]

قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَٰرِهِينَ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫০

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের কথার জবাবে বললেন, আমরা যদি তোমাদের ধর্মের নামে অধর্মে ফিরে যেতে না চাই তবে কি আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমরা বলপূর্বক আমাদেরকে তোমাদের ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতে চাও?

যখন এ সত্য উপলব্ধি করেছি যে, তোমরা আল্লাহর নাফরমানী এবং অবাধ্যতায় লিপ্ত এবং তোমরা অসত্য অধর্মকে ধর্ম মনে কর, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমাদের ধর্মকে গ্রহণ করব? বিশেষতঃ যখন আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অন্যায়, অসুন্দর, অসত্য এবং বাতিল থেকে নাজাত দিয়েছেন। এমন অবস্থায় যদি আমরা ঐ বাতিল ধর্মে ফিরে যাই তবে এর অর্থ হবে আমরা যে এতদিন আল্লাহ্ পাকের পয়গাম শুনিয়েছি এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনের কথা প্রচার করেছি– এসবই মিথ্যা এবং অপবাদ ছিল।

তাই হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, শেরকের অবস্থায় ফেরত যাওয়া আমাদের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না।

إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

তবে যদি আমাদের তকদীরে আল্লাহ্ পাক কুফর লিখে দিয়ে থাকেন এবং আমাদের মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হওয়া তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি হয় তবে তা ভিন্ন কথা।

হেদায়েত আল্লাহ্ পাকের হাতে

তফসীরকারগণ বলেছেন যে, এ বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হেদায়েত এবং গোমরাহী আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, হেদায়েত লাভ করে কে ভাগ্যবান হবে আর পথভ্রষ্ট হয়ে কে হতভাগ্য হবে– এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দের ভাবনা এবং চেতনা দেখা দেয়, আর মানব অন্তর আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান অপরিসীম, তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তাঁর হেকমত সূক্ষ্ম, তোমরা যত অত্যাচার-উৎপীড়নই কর না কেন, আমরা কখনো তোমাদের বাতিল ধর্ম গ্রহণ করব না।

عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করি, আমাদের সকল আশা তাঁর নিকট, সকল ভরসা তাঁর প্রতিই, তিনিই আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখবেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর জাতির দাম্ভিক প্রধানদেরকে এ জবাব দেয়ার পর আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে এই বলে মোনাজাত করলেন ঃ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে সঠিক ফয়সালা করে দাও, তুমি উত্তম ফয়সালাকারী। কাফেরদের উপর আযাব নাযিল কর যাতে করে তাদের বাতিল হওয়া এবং আমাদের হক্ব হওয়া সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত শোয়ায়েব (আঃ) এ দোয়া তখন করেছিলেন যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছিলেন।[১]

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর ভাষায় পবিত্র কোরআন মোমেনগণকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, মোমেন মাত্রকে সকল অবস্থা এবং পরিস্থিতিতে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতিই ভরসা করা উচিত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের প্রতি অবিচল আস্থা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস, সুদৃঢ় ভরসা এবং অটুট নির্ভরতা এনে দেয় মোমেনের জীবনে পরম সাফল্য।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হেদায়েত লাভের মাধ্যমে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া, আল্লাহ্ পাকের তওফিক ব্যতীত সম্ভব নয়। এজন্যে সূরা ফাতেহায় হেদায়েতের তৌফিকের জন্যে আরজী পেশ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

'হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর'। এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত এবং বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন ঃ

শপথ! সেই আল্লাহ্ পাকের যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোক (সারা জীবন) দোযখীদের কাজ করে, এমনকি তার মধ্যে আর দোযখের মধ্যে এক হাতের দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার তকদীর প্রাধান্য বিস্তার করে। আর সে জান্নাতী লোকদের আমল করা শুরু করে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর কোন লোক অনেক দিন যাবত জান্নাতীদের আমল করে কিন্তু অবশেষে দোযখীদের আমল করে দোযখে প্রবেশ করে। আমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮২-৮৩

ভরসা করি। তিনিই আমাদেরকে ঈমানের উপর সুদৃঢ় রাখবেন এবং আমাদের একীন বৃদ্ধি করার তৌফিক দান করবেন।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সমগ্র মানব জাতির অন্তর দয়াময় আল্লাহ পাকের কুদরতী (হাতের) মুঠোয় রয়েছে। তিনিই যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন। হে আল্লাহ! অন্তর সমূহের অবস্থা পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যে সুদৃঢ় রাখ।[১](মুসলিম শরীফ)

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর বক্তব্যকে দু'টি বিষয়ের উপর শেষ করেছেনঃ

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

আমরা এক আল্লাহর প্রতি ভরসা করি। অতএব, তোমরা যত অত্যাচার অবিচার কর-না কেন এবং আমাদেরকে শহর থেকে বের করে দেয়ার যত হুমকিই দাওনা কেন তাতে আমাদের কিছু যায় আসেনা কেননা, আমরা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করেছি। তিনি সাহায্য করলে কারো কোন ভয় থাকেনা।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর বক্তব্যের শেষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করেছেন।

অতএব, যারা যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে নায়েবে নবী হিসেবে আল্লাহ পাকের দ্বীন প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন, তাদেরও এ দু'টি কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। তথা সকল অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা করা এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করা।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫২-৫৩
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৮০

وَ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ
اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۛ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا
كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَ
مَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا
وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

তরজমা

(৯০) তার জাতির কাফের প্রধানরা বললো, তোমরা যদি শোয়ায়েবের অনুসরণ কর তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৯১) অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প আক্রমণ করে, পরিণামে তারা সকলেই প্রত্যুষে নিজ নিজ গৃহে মরে উপুড়ভাবে পড়ে রইল।

(৯২) যারা শোয়ায়েবকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল তারা যেন কখনও বসবাস করেনি। যারা শোয়ায়েবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারাই হয়েছে সর্বস্বান্ত।

(৯৩) এরপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলাম, আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম অতএব, আমি কাফেরদের জন্যে কি করে আক্ষেপ করি!

(৯৪) আর আমি যেখানেই কোন পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, সেখানকার অধিবাসীদেরকে আমি দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেছি যেন তারা কাকুতি মিনতি করে।

(৯৫) এরপর আমি তাদের অবস্থা মন্দের বদলে ভাল করে দেই। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষরাও সুখ-দুঃখ ভোগ

করেছে। এরপর আমি তাদেরকে এত অতর্কিতভাবে পাকড়াও করি যে, তারা উপলব্ধিও করতে পারে না।

তফসীরুল কোরআন

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁর শত্রুতায় এবং পথভ্রষ্টতায় এত চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তাদের প্রধানরা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে যে, তোমরা যদি শোয়ায়েবের অনুসরণ কর তবে তোমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তোমরা হয়ে যাবে সর্বস্বান্ত কেননা, শোয়ায়েবের (আঃ) কথা মেনে নিলে ওজনে ফাঁকি দিতে পারবেনা; বরং সঠিকভাবে ওজন করতে হবে। এছাড়া মানুষের পাওনা পুরোপুরি আদায় করতে হবে। চুরি-ডাকাতি-লুণ্ঠন সবই পরিহার করতে হবে। এভাবে তোমরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

দ্বিতীয়তঃ বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিলে তোমাদের ধর্মীয় ক্ষতিও হবে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ এ হতভাগা সম্প্রদায় পরস্পর শপথ করে অঙ্গীকার করে যে, আমরা কোন অবস্থাতেই শোয়ায়েবের (আঃ) কথা মানবনা, তাহলে আমরা বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হব। যখন তাদের হেদায়েতের কোন আশা রইলনা তখন হযরত শোয়ায়েব (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ! আমাদের ও তাদের মাঝে একটা মীমাংসা করে দিও। এরপরই তাদের উপর আযাব আসল। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَخَذَتۡهُمُ الرَّجۡفَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِىۡ دَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ

'তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তারা তাদের নিজ নিজ ঘরে মরে অধোমুখ হয়ে পড়ে রইল'।

যারা কয়েকদিন পূর্বেই হযরত শোয়ায়েব (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে দেশ থেকে বহিঃস্কার করার হুমকি দিয়েছিল, তারাই আল্লাহ পাকের গজবে পতিত হয়ে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হলো।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতির ঘটনা সূরা হুদ এবং সূরা শোয়ারায় আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা জানা যায় হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতির প্রতি তিন প্রকার আযাব এসেছে। ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করে।

কালবী (রঃ) লিখেছেন, الرجفة এর অর্থ ভূমিকম্প। ঐ ভূমিকম্পের কারণেই তারা তাদের নিজেদের ঘরে ঘরে উপুড়মুখী হয়ে মরে পড়ে রইল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক তাদের জন্যে দোযখের দ্বার উম্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তারা এত চরম গরমে পড়ে গেল যে তাদের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ল। কোন প্রকার ছায়া তাদের জন্যে উপকারী হচ্ছিল না। আত্মরক্ষার জন্যে তারা মাটির নীচে নির্মিত গৃহে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেও বিপজ্জনক তাপমাত্রার কারণে কারণে তাদেরকে বের হয়ে ময়দানের দিকে চলে যেতে হয়। তখন তাদের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মেঘ ছায়া ফেলে। তাতে আনন্দদায়ক বাতাস ছিল। তখন তারা একে অন্যকে ডাকতে থাকে। যখন নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই সেই আবর বা ছায়ার নিচে একত্রিত হল তখন সেই আবরের মধ্য থেকে অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হতে লাগলো। নিচে পূর্বেই গরম ছিল এবং উপর থেকেও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হলে তারা জ্বলে ছাই হল।

এজিদ জারিরী বর্ণনা করেন, প্রথমে সাত দিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে তুফানের আযাবে পতিত করেন। এতে ছিল লু-হাওয়া। এর্পর তারা সম্মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো একটি পাহাড়, এক লোক দেখলো পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে নহর এবং ঝরণা। তখন সকলে সেখানে সমবেত হল। এরপর পাহাড় তাদের উপর নিপতিত হল। এভাবে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় ধ্বংস হল।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে আসহাবুল আইকার হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা অবাধ্য নাফরমান হয় এবং হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়। তখন তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। প্রথমে তারা আবর অথবা পাহাড়ের ছায়ায় একত্রিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করে। তৃতীয়তঃ হযরত জীব্রাঈল (আঃ) ভয়ংকর গর্জন করেন, পরিণামে তারা সকলে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ج

অর্থাৎ যারা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল তারা এভাবে ধ্বংস হল যে তারা যেন এ স্থানে কোনদিন বসবাস করেনি। তাদের মূলোৎপাটন হয়েছে। আর তাদের কোন চিহ্নমাত্র রয়নি। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ

যারা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তারাই হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। অথবা ঐ সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা বলেছিলো যারা শোয়ায়েব (আঃ)-এর অনুসরণ

করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু বাস্তব বড় কঠোর। বাস্তব সত্য হল এই, যারা এ পৃথিবীতে আল্লাহর নাফরমান হয় তাদের শাস্তি অবধারিত। যারা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয় তাদের ধ্বংস অনিবার্য। যেমন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তি হয়েছে।[১]

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ

যখন আযাব আপতিত হলো, অবাধ্য কাফেররা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো তখন হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তফসীরকাগণ বলেছেনঃ এর অর্থ হল তিনি ঐ অভিশপ্ত স্থানটি ত্যাগ করতঃ অন্যত্র গমন করলেন। বিদায়ের সময় তাদের ধ্বংসের ঐ করুণ দৃশ্য দেখে বললেন, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের মহান বাণী পৌঁছে দিয়েছি, তোমাদেরকে অনেক নসীহত করেছি, তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি, বর্তমান ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে কত সতর্ক করেছি কিন্তু তোমরা আমার নসীহত গ্রহণ করোনি। পরিণামে তোমরা অভিশপ্ত ও কোপগ্রস্ত হয়েছ। তাই আজ তোমাদের অবস্থা যত মন্দ, যত করুণই হোক না কেন তোমাদের জন্যে আফসোস করার কোন যুক্তি নেই। কেননা, তোমরা নিজেরাই আল্লাহর আযাবের পথ বেছে নিয়েছ, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছ, অসত্যকে গ্রহণ করেছ, আল্লাহর বিধানকে অমান্য করেছ। অতএব, তোমাদের জন্যে আজ কোন দুঃখ নেই।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّآ اَخَذْنَا

আর আমি যে জনপদেই কোন নবী প্রেরণ করি, সেই জনপদের অধিবাসীরা যখন নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে তখন আমি তাদেরকে পাকড়াও করি অভাব-অনটন এবং রোগ তাপ দ্বারা, হয়তো তারা কাকুতি মিনতি করে।

বস্তুতঃ কোন এলাকায় যখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে কোন নবী আগমন করেন তখন সে এলাকার অধিবাসীরা তাঁর বিরোধিতা করে। তাঁর নবুওয়্যতের দাবীকে মিথ্যা মনে করে, এমন অবস্থায় তাদেরকে সতর্ক এবং সাবধান করার লক্ষ্যে দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র-অভাব-অনটনে পতিত করা হয় যেন তারা আত্মসংশোধনের সুযোগ পায়, যেন তারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে কাকুতি-মিনতি করে এবং নিজেদের অন্যায়-অনাচার পরিহার করে সত্য পথ গ্রহণ করে।

যদি তারা আত্মসচেতন হয়, সত্যকে গ্রহণ করে তবে তাই কাম্য এবং উত্তম। যদি তারা সঠিক পথ অবলম্বনে প্রস্তুত না হয়, সত্যকে বর্জন করতে থাকে, অন্যায়-

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫০-৫৪

অনাচারেই লিপ্ত থাকে এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের জন্যে সুখ-সমৃদ্ধি, আনন্দ-উল্লাসের দ্বার উন্মুক্ত করেন। আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়ে তারা মানবতার খাতিরে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লজ্জাবোধ করে এবং আল্লাহ পাকের অযাচিত ও অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু যদি এর দ্বারাও তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহ পাকের বিধান মানতে রাজি না হয়; বরং তাদের জনবল ও ধনবল যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই তাদের আনন্দ-উল্লাসের মাত্রা বাড়তে থাকে। অতীতে কত দুঃখ কষ্ট পেয়েছে সে কথাও তারা ভুলে যায়, ভুলে যায় আল্লাহর নেয়ামতের কথা। মনে করে তাদের বুদ্ধির দৌড়ে, জ্ঞান এবং গুণের কারণে তাদের সমৃদ্ধি লাভ হয়েছে। আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়ে তারা সব কিছু পেয়েছে একথা ক্ষণিকের জন্যেও চিন্তা করেনা; বরং তারা আল্লাহকে ভুলে যায়। শুধু তাই নয়;

وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ

বরং তারা কখনও একথাও বলে, সুখ দুঃখের এই অবস্থা শুধু আমাদের জীবনেই নয়; বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদের জীবনেও সুখ দুঃখ এসেছে। অতএব, একথা বলা যে, আমাদের অন্যায় অনাচারের কারণে দুঃখ কষ্ট এসেছে সঠিক নয়। যদি কুফর ও শেরকের কারণে অন্যায় অনাচারের দরুণ দুঃখ কষ্ট এসে থাকে তবে আজ আমাদের এত সুখ-সাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধি ও পরিবৃদ্ধি কেন? আমরা ইতোপূর্বে যেমন ছিলাম আজও তেমনি আছি। আমাদের নীতি, চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় এবং জীবন ধারায় এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। এতদসত্ত্বেও আমাদের সৌভাগ্য অব্যাহত রয়েছে। তবে এমন অবস্থায় তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে, তাদের প্রতি হঠাৎ আল্লাহর আযাব আপতিত হয় তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

তারা যখন আত্ম বিস্মৃত এবং আত্ম প্রসাদ লাভে মুগ্ধ হয়, তখন হঠাৎ আল্লাহর আযাব তাদেরকে আক্রমণ করে বসে। আমি তাদেরকে অতর্কিতভাবে পাকড়াও করে বসি। তাদেরকে পাকড়াও করার পূর্বে, তাদের চরম ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্তে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।

আল্লামী বগভী লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে البأساء শব্দটির অর্থ অভাব-অনটন। আর الضراء শব্দটির অর্থ হল রোগ তাপ। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন البأساء অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং الضراء অভাব-অনটন।

لعلهم এর অর্থ হল তারা যেন অভাব-অভিযোগ, রোগ-তাপ দেখে আল্লাহ পাকের দরবারে কৃত অন্যায়ের জন্য তওবা করে এবং কাকুতি-মিনতি জানায়,

অন্যায়-অনাচার পরিহার করে সত্যকে গ্রহণ করে। এ স্থলে السيئة। অর্থ অভাব-অনটন, শারীরিক দুঃখ-কষ্ট আর الحسنة। শব্দটি অর্থ সম্পদের আধিক্য, সমৃদ্ধি ও পরিবৃদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ তাদের সমৃদ্ধি ও আনন্দ উল্লাসের কারণে তারা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে ভুলে যায়, তাঁর বিধান অমান্য করতে থাকে।

فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً

তখন অতর্কিতভাবে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। তথা হঠাৎ আল্লাহর আযাব তাদের উপর আপতিত হয়। এমন অবস্থায় যে, এ আযাব আসার পূর্ব মূহূর্তে তারা কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا
وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى
وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ
اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا
يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ
جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ
كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ
وَاِنْ وَّجَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾

তরজমা

(৯৬) যদি ঐসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো, পরহেযগারী অবলম্বন করতো তবে আসমান জমিনের নেয়ামত ও বরকত সমূহ তাদের জন্যে খুলে দিতাম।

কিন্তু তারা পয়গম্বরগকে মিথ্যাজ্ঞান করে তাই তাদেরই জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করি।

(৯৭) তবে কি জনপদের অধিবাসীরা সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসতে পারে রাত্রিকালে যখন তারা থাকবে নিদ্রিত অবস্থায়।

(৯৮) অথবা জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভয় যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসতে পারে দিনে-দুপুরে যখন তারা খেলাধূলায় মত্ত থাকে।

(৯৯) তারা কি আল্লাহ পাকের গোপন কৌশলকে ভয় করেনা? বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হতে পারে না।

(১০০) কোন এলাকার অধিবাসীদের ধ্বংস হওয়ার পর যারা সে এলাকার উত্তরাধিকারী তাদের নিকট কি একথা প্রমাণিত হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের অন্তরকে মোহর করে দিতে পারি– এমন অবস্থায় তারা শ্রবণ করতে পারে না।

(১০১) (হে রসূল!) এই সমস্ত জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণনা করছি এবং নিশ্চয় তাদের নিকট তাদের রসূলগণই সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ এসেছিলেন, কিন্তু প্রথমে যে বিষয়ে তারা মিথ্যাজ্ঞান করেছে তাতে তারা ঈমান আনেনি। এ ভাবেই আল্লাহ পাক কাফেরদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দেন।

(১০২) আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার রক্ষাকরী পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকে আমি নাফরমান পেয়েছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যারা আল্লাহর নাফরমান হয়, যারা তাঁর প্রেরিত নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে, যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঈমানের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদেরকে আল্লাহ পাক অতর্কিত ভাবে পাকড়াও করেন এবং তাদেরকে তাদের অন্যায় আচরণের কারণেই নিপাত করা হয়।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যাদের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ বর্ণিত হয়েছে, যে সব জনপদ ও তার অধিবাসীরা আল্লাহর আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে তারা যদি আল্লাহ পাকের একত্ববাদে ঈমান আনতো, নবী রসূলগণের আহ্বানে সাড়া দিত এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন

করতো, পাপাচার পরিহার করে নেক আমলের দিকে আকৃষ্ট হত তবে আমি তাদের জন্য আসমান জমিনের নেয়ামত সমূহের দ্বার খুলে দিতাম। সম্পদের ভান্ডারতো আল্লাহর কাছেই, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। তারা যদি ঈমান আনতো এবং নেক আমল করতো, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ না হত, যদি তারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করতো তবে আসমান জমিনের বরকত তারা লাভ করতো। সমস্ত নেয়ামত ও সম্পদের ভান্ডার তাদের জন্যে খুলে দেয়া হত। কিন্তু তারা আল্লাহর নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে কোপগ্রস্ত হয়েছে।

"বরকত"-এর তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত "বরকত" শব্দটি কখনও স্থায়ী কল্যাণ এবং কখনও কল্যাণ বৃদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ মর্মে আয়াতের অর্থ দাড়ায় যদি লোকেরা আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থ সমূহের এবং তাঁর প্রেরিত রসূলগণের প্রতি এবং কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করতো তথা যে সব বিষয় আল্লাহ পাক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকতো, তবে আমি তাদের জন্যে আসমান জমিনের নেয়ামতের ভান্ডার খুলে দিতাম। আসমানের বরকত বৃষ্টি এবং জমিনের বরকত ফল-ফলারী তথা জমিনে যা কিছু উৎপন্ন হয় সবই এবং পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা-এসবই তাদেরকে দান করতাম।[১]

কিন্তু তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং ঈমানের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে তাই তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে। তারা তাদের কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভোগ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে 'বারাকাতুন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল "বাড়তি কিছু"। আসমান জমিনের বরকতের তাৎপর্য হল সার্বিক কল্যাণ তথা প্রয়োজন মোতাবেক আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত এবং জমিনে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক ফল-ফলারী উৎপন্ন হত আর নিঃশঙ্ক মনে নিশ্চিন্তে আল্লাহর পাকের নেয়ামত সমূহ ভোগ করতে পারতো।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ পৃথিবীতে বরকতের বহিঃ প্রকাশ দু'ভাবে হয়। কখনও যে বস্তুতে বরকত হওয়ার কথা সে বস্তুটি বেড়ে যায় যেমন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসে এক বাটি দুধ সত্তরজন সাহাবী পান করেছেন এবং

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৮৫

তৃপ্তি লাভ করেছেন। আর দ্বিতীয় হল যে বস্তুর বরকত হওয়ার কথা তা বৃদ্ধি পায় না, তা দ্বারা অধিক সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় ঘরের অনেক জিনিস পত্র এমন মোবারক হয় যে সারা জীবন তা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া যায়, পক্ষান্তরে কোন কোন জিনিস তৈরী হওয়ার পরই বা বাড়ীতে আসার পরই ভেঙে যায়, ফলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না।

বরকত ও নেয়ামত ঈমান ও পরহেযগারীর ফলশ্রুতি

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হল, আসমান জমিনের বরকত ঈমান এবং তাকওয়ার বিনিময়ে লাভ করা যায়, যদি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান থাকে এবং ঈমানের দাবী মোতাবেক তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা যায় তবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসমান জমিনের বরকত লাভে ধন্য হওয়া যায়।[১]

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে নূহ (আঃ)-এর জাতি, আদ জাতি, সামুদ জাতি, লূত (আঃ)-এর জাতি, সালেহ (আঃ)-এর জাতির কুফর ও নাফরমানী, আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা এবং তাদের যাবতীয় পাপাচারের যে শাস্তি হয়েছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এসব ঘটনা থেকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর, পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর যারা তাঁর বিরোধিতা করে, যারা দুনিয়ার সম্পদ ভোগে মত্ত রয়েছে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে তারা কি ভয় করেনা? যখন রাত্রিকালে তারা নিদ্রা মগ্ন থাকে তখন তাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ আযাব আসতে পারে।

অথবা দিনে দুপুরে যখন তারা খেলাধূলায় মত্ত থাকে তখন হঠাৎ তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হতে পারে।

পূর্বকালের অভিশপ্ত জাতিগুলোর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তারা নিঃশঙ্ক এবং নির্ভয় হয়ে আছে?

অর্থাৎ তাদের ভয় করা উচিত, যে কোন সময় তাদের কৃতকর্মের পরিণামে তারা কোপগ্রস্ত হতে পারে কেননা, যে সব কারণে পূর্বকালের জাতিগুলোর প্রতি আল্লাহর আযাব এসেছে সে কারণগুলো বর্তমান নাফরমানদের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে।

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৮১

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ

তবে কি তারা আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল সম্পর্কে বেপরোয়া হয়েছে?

তারা কি একথা ভেবে দেখেনা? যে সুখ-সম্পদ, ভোগ-বিলাসের উপকরণ নিয়ে তারা ব্যস্ত, যে কারণে তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত তা-ই একদিন তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংসের জন্যে এমন গোপন কৌশল গ্রহণ করবেন যা তারা কোন দিন বুঝতেই পারবেনা, অথচ অতর্কিতভাবে নেমে আসবে তাদের ধ্বংস। তবে একথা মনে রেখো আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল সম্পর্কে শুধু সে-সব লোকই গাফেল থাকে, যারা হয় ক্ষতিগ্রস্ত এবং যারা হয় কোপগ্রস্ত।

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ

যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তাদের স্থানে যারা আজ বসবাস করছে, তারা কেন এসব শিক্ষণীয় ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে না? পাপাচারের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়, কুফর ও শেরক কত বিপজ্জনক হয়, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় নিকট ও দূর অতীতের ইতিহাসে। যাদের আবাস-স্থলে তোমরা আজ বাস করছো তারা কেন সর্বস্বান্ত হয়েছে, কেন তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং শিক্ষা গ্রহণ কর। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে কেউ এ পৃথিবীতে টিকতে পারে না, ইতোপূর্বেও পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবেনা। একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়রত নূহ (আঃ)-এর জাতি, আদ জাতি, সামুদ জাতি, লূত (আঃ)-এর অভিশপ্ত সম্প্রদায় এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর পথভ্রষ্ট জাতি।

অতএব, যারা পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে তারা কিভাবে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েও নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত হতে পারে!

আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তাদের পাপাচারের শাস্তি দিতে পারেন। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ

"আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিদায় করে দিতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন"।

যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে, সত্যকে বুঝে শুনেও তা অস্বীকার করে তাদের অন্তরকে আমি মোহরাঙ্কিত করে দেই। তাই সত্য

কথা তারা শ্রবণ করে না কেননা, তাদের অন্তরের দ্বার রুদ্ধ থাকে, ফলে অন্তর দিয়ে তারা কোন কথা শ্রবণ করেনা। আর আল্লাহ্ পাকের বাণী শ্রবণ করতে হয় অন্তরের কর্ণ দ্বারা, এটি চর্মের কর্ণের কাজ নয়; বরং অন্তরের কাজ, এজন্যে মওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন ঃ

این سخن ازگوش دل باید شنود

گوش گل این جا ندارد هیچ سود

একথাটি অন্তরের কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করতে হয়, শুধু চর্মের কর্ণ এখানে উপকারী হয় না।

گوش سر باجمله حیوان همدم است

گوش سر مخصوص نسل ادم است

মাথার সঙ্গে যে কর্ণ রয়েছে তাতো সকল প্রাণীরই আছে কিন্তু অন্তরের গোপন কর্ণ শুধু মানব জাতিরই বৈশিষ্ট্য।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا

এ আয়াতে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) মক্কাবাসী আজ আপনার বিরোধিতা করছে এবং আপনার আহবানে সাড়া দেয়ার স্থলে আপনাকে সত্য প্রচারে বাধা দিচ্ছে। তবে এ অবস্থা নতুন নয়, যে সব জনপদবাসীর কথা আপনার নিকট আমি এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছি তাদের নিকট আমার নবীগণ সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ, মোজেযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারা নবী রসূলগণের আহবানে সাড়া দেয় নাই, নবী রসূলগণ তাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন কিন্তু তারা সতর্ক হয়নি। তারা একবার যে সত্যকে অস্বীকার করেছে শেষ পর্যন্ত শত সহস্র দলিল-প্রমাণ দেখা সত্ত্বেও তাকে তারা অস্বীকার করেছে।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ

যেহেতু কাফেররা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, নবী রসূলগণের আহবানকে অস্বীকার করতে থাকে এবং তাদের বিরোধিতায় তৎপর হয়ে থাকে, কোন আদেশ উপদেশ, কোন জীবন্ত নিদর্শন, কোন মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা, কোন জাজ্বল্যমান প্রমাণ তাদের মনে দাগ কাটে না, কোন অবস্থাতেই তারা সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না, এভাবে তারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাই হারিয়ে বসে। এ

হতভাগারা আর সত্যকে গ্রহণ করেনা, তাদের এ অবস্থাকেই আল্লাহ পাক তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ

আর আমি তাদের অধিকাংশকেই অঙ্গীকার রক্ষাকারী পাইনি এবং তাদের অধিকাংশকেই আমি নাফরমান পেয়েছি।

যে কাফেরদের কথা আলোচিত হল তাদের আরেকটি অবস্থা এই, তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনা, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, কথা মানুষকে দেয়া হোক অথবা আল্লাহ পাকের সঙ্গে অঙ্গীকার করা হোক, তারা কারো সাথেই তাদের কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেনা।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সুদ্দী (রহ.) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন, সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষ থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, এই কাফেররা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতির রূহ সমূহকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى

আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? এ প্রশ্নের জবাব সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির প্রথম কথায় সেদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। তুমি আমাদের প্রতিপালক। এরপর তাঁকে অনুসরণ করেছেন সমস্ত নবী রসূলগণ, এরপর একে একে প্রত্যেকটি মানুষ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল। আলোচ্য আয়াতে সে অঙ্গীকারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সেদিন এ কাফেররা ঈমানের কথা মৌখিক স্বীকার করেছিল কিন্তু তাদের অস্বীকৃতি গোপন রেখেছিল। আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমনের পর তারা তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

মুজাহেদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, এ অভিশপ্ত সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করার পূর্বে তারা যেভাবে নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে যদি তাদেরকে ধ্বংসের পর পুনঃ জীবন দেয়া হত তবুও তারা ঈমান আনতো না।

যেমন অন্য আয়াতে একথাটি এভাবে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

"যদি তাদেরকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হয় তবে তারা নিষিদ্ধ কাজগুলোর পুনরাবৃত্তি করতো"।

ইয়ামান এবনে জোবাব এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ প্রত্যেক নবী তাঁর জাতিকে আল্লাহ্ পাকের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছেন কিন্তু তারা নবীর সত্যতা মেনে নেয়নি; বরং নবীর বিরোধিতায় তৎপর হয়েছে। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। এরপর তাদের স্থলে এসেছে অন্য জাতি, তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্ পাক অন্য নবী প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে আল্লাহ্র নবী সতর্ক করেছেন, তারাও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মত তাদের নবীকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে যেমন, এ কথাটি অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

তাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট যে রসূলই আগমন করেছেন তারা তাকে যাদুকর অথবা পাগল বলেছে। এভাবেই অর্থাৎ যেভাবে অতীতের কাফেরদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করা হয়েছিল তথা তাদের অন্তর সত্য গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল ঠিক সেভাবে (হে রসূল!) আপনার যুগের কাফেরদের সম্পর্কেও আমি লিখে দিয়েছি যে, তারা ঈমান আনবেনা এবং সকল দলিল প্রমাণ দেখা সত্ত্বেও তাদের মন বিনম্র হবে না।

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ

অথবা এর অর্থ হল যে সব অভিশপ্ত জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের অধিকাংশ লোককে আমি অঙ্গীকার রক্ষাকারী পাইনি। এ অঙ্গীকারের দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. সেই অঙ্গীকার যা সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে করা হয়েছে।

২. সেই অঙ্গীকার যা তারা বিপদ মুহূর্তে করেছিলো, যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করা হয় তবে আমরা শোকর গুজার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো। আর এই লোকদের অধিকাংশই পাপী তাই তাদের শাস্তি অনিবার্য।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫৮

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾
وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ
لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ
بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ
مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

তরজামা

(১০৩) তাদের পর আমি ফেরাউন ও তার দলবলের কাছে আমার নিদর্শন সহ মূসাকে প্রেরণ করি কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে, অতএব, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য করে দেখ।

(১০৪) হে ফেরাউন! নিশ্চয় আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রসূল।

(১০৫) একথা নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ পাকের সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলবনা, তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছি, অতএব, বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।

(১০৬) ফেরাউন বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।

(১০৭) অতঃপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করেন তখনই তা প্রকাশ্য অজগরে পরিণত হয়ে যায়।

(১০৮) আর তিনি তাঁর হাত বের করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র সমুজ্জ্বল পরিলক্ষিত হতে থাকে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পাঁচজন পয়গম্বরের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এরপর ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের নীতি হল যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করে, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারা কোপগ্রস্ত হয়। আসমানী গজবের মাধ্যমে তাদের মূলোৎপাটন করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ের ষষ্ঠ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আর এ ঘটনা হল হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্পর্কে। পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে এ ঘটনা তুলনামূলক ভাবে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

এ ঘটনা অধিকতর বিস্তারিত ভাবে বর্ণনার কারণ হিসেবে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন যে, অন্যান্য নবীগণের মোজেযা থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা ছিল অধিকতর শক্তিশালী এবং বিস্ময়কর।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন আর একথা সর্বজন-বিদিত যে, বনী ইসরাঈল তথা ইহুদীরা মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা, দৌরাত্ম ও বিশ্বাসঘাতকতায় এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে জঘন্যতম। এছাড়া, হযরত মূসা (আঃ)-কে সংখ্যার দিক থেকেও অনেক বেশী মোজেযা দান করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রথম মোজেযা হল তাঁর লাঠি। দ্বিতীয় মোজেযা হল তাঁর হাত শুভ্র হওয়া। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি দ্বারা যখন ফেরাউনের ফটকে আঘাত করলেন তখন ফেরাউন ভীত-সন্ত্রস্ত হল এবং লাঠির আঘাতের কারণে এত বেশী ভীত হয়েছিলো যে তার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, তাই সে সাদা চুল নিয়ে জনসমক্ষে হাযির হতে লজ্জাবোধ করল। তখন সে কালো খেজাব ব্যবহার করল। বর্ণিত আছে যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ফেরাউনই কালো খেজাব ব্যবহার করে, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি দ্বারা অনেক কাজ নিতেন।

পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৮৯

যাদু দ্বারা মোজেযার মোকাবেলা করা যায় না

এ বিবরণে একটি সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তা হল যাদু এবং মোজেযার মধ্যকার পার্থক্য। ফেরাউন তার দেশের যাদুকরদেরকে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় একত্রিত করেছিল কিন্তু তাদের যাদুকরী বিদ্যা ক্ষণিকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় কেননা, মোজেযার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়, যার মোকাবেলা যাদুবিদ্যা দ্বারা কোন অবস্থাতেই করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনার সাথে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঘটনার কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। বনী ইসরাঈল জাতি ছিল অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং ফেরাউন কর্তৃক নির্যাতীত। হযরত মূসা (আঃ)-এর বরকতে বনী ইসরাঈল জাতি সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করেছে, ঠিক এমনিভাবে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে আল্লাহ পাক উচ্চ মর্যাদা, বিশেষ সম্মান এবং প্রাধান্য দান করেছেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল এমরান। কিবতী ভাষায় (মু) অর্থ হল পানি। আর (সা) অর্থ হল বৃক্ষ। জন্মলগ্নে ফেরাউনের ভয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা তাঁর নবজাতক শিশুকে কাঠের তৈরী বাক্সে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু তাঁকে পানি এবং বৃক্ষের মাঝে পাওয়া যায় তাই তাঁর নাম মূসা হয়ে যায়। হযরত মূসা (আঃ)-এর বয়স হয়েছিলো ১২০ বছর। তাঁর এবং হযরত ইউসূফ (আঃ)-এর মধ্যে রয়েছে ৪০০শ' বছরের পার্থক্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ৭০০শ' বছর পর আগমন করেন হযরত মূসা (আঃ)। যেভাবে পারস্য রাজার উপাধি ছিল কেসরা এবং রোমক সম্রাটের উপাধি ছিল কায়সার ঠিক তেমনি মিশরের বাদশার উপাধি ছিল ফেরাউন। যে ফেরাউনের সঙ্গে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা হয়েছিল তার আসল নাম ছিল কাবুস। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেনঃ তার নাম ছিল ওলিদ এবনে মাসআব এবনে রাইয়্যান। সে কিবতী জাতির বাদশাহ ছিল। সে ৪০০শ' বছর রাজত্ব করে। অবশেষে সে খোদায়ী দাবী করে বসে (নাঊজুবিল্লাহ), কিবতীরা তার দাবী মেনে নেয় কিন্তু বনী ইসরাঈল অস্বীকার করে। ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে বলে, তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে গোলাম হিসেবে ক্রয় করা হয়েছিল, অতএব তোমরা আমাদের পূর্ব পুরুষের গোলামের বংশধর হিসেবে আমারও গোলাম। একথা বলে বনী ইসরাঈল জাতিকে সে তার গোলামী করতে বাধ্য করে।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৯

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا

হযরত নূহ (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ) এবং হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রমুখ নবীগণের পর আমি মূসা (আঃ)-কে ফেরাউন ও তার দলবলের নিকট প্রেরণ করলাম।

فَظَلَمُوْا بِهَاۚ

কিন্তু তারা নাফরমানী করল, আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল। জুলুম বলা হয় কোন জিনিসকে তার সঠিক স্থানে না রাখাকে। আল্লাহ পাক যাদের হেদায়েতের জন্যে তাঁর নবীকে নিদর্শন সমূহ সহ প্রেরণ করলেন, তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহর প্রেরিত নবীকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো এবং তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমান লাভে ধন্য হওয়া। কিন্তু এ হতভাগারা আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাঁর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়। তাদের এ পথভ্রষ্টতা এবং অকৃতজ্ঞতাকে "জলামু" শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। কেননা, তারা সত্যকে গ্রহণের স্থলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঈমানের স্থলে কুফরকে স্থান দিয়েছে।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তা লক্ষ্য করে দেখ'।

কেননা, অবশেষে ফেরাউন এবং তার দলবলের লোহিত সাগরে সলিল সমাধি হয়েছিল। এ পৃথিবীতে যে বা যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়, যারা অন্যায়-অনাচার দ্বারা সুন্দর এ বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তোলে এবং মানুষের জীবনকে করে তোলে দুর্বিসহ, অবশেষে আল্লাহ পাক তাদেরকে পাকড়াও করেন, তারা কোপগ্রস্ত হয়।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে ফেরাউন! আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রসূল হয়ে এসেছি, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের আহবান নিয়ে এসেছি। আল্লাহ পাক আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন তাই আমার কর্তব্য হল তোমার নিকট হক্ব কথা পৌঁছে দেয়া, আল্লাহ পাকের রসূল হক্ব ব্যতীত কিছু বলেন না; আমি আল্লাহর রসূল অতএব, যা হক্ব, যা সত্য তাই আমি তোমাকে বলব এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কখনো সামান্যতম

অসত্য বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যকে প্রকাশ করতে এবং অসত্যের উপর সুদৃঢ় থাকতে আমি সংকল্পবদ্ধ।

তফসীরকারগণ حَقِيْقٌ শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন যোগ্য, তবে এরপর على ب এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মনের দৃঢ়তা প্রকাশ করার জন্যে ب এর বদলে على ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়াবে এই, তোমরা রসূল হিসেবে যদি আমাকে না মান এবং আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ কর বা আমাকে কোন প্রকার ভয় দেখাও তাতে কিছু যায় আসেনা। আমি আল্লাহর রসূল হিসেবে সত্যের উপর অবিচল থেকে সত্য প্রচারে সুদৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করব।

قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

এতদ্ব্যতীত, আমি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণও নিয়ে এসেছি, নবুওয়্যতের দলিল হিসেবে আল্লাহ পাক নবীগণকে মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন যা মানুষকে নবীর প্রতি ঈমান আনয়নে সাহায্য করে।

যেহেতু বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউন তার গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, তাই ফেরাউনের অমানুষিক নির্যাতনে তাদের জীবন যাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলরা মিসরের প্রকৃত বাসিন্দা ছিলনা। তাদের জন্মভূমি ছিল সিরিয়া। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সিরিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাই তাঁর বংশধররা সিরিয়ারই অধিবাসী ছিল।

পরবর্তীতে যেহেতু হযরত ইউসূফ (আঃ) মিশরে অবস্থান করেন তাই বনী ইসরাঈলীরা মিশরে চলে আসে।

হযরত ইউসূফ (আঃ)-এর পর বনী ইসরাঈলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ ফেরাউনের আমলে বনী ইসরাঈলের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। ইট বানান, ইট ধৌত করা সহ অন্যান্য কঠিন কাজ তাদের দ্বারা করানো হতো। তারা ছিল গোলাম-বাঁদী এবং বন্দী দশায় তারা বাস করছিল তাই হযরত মূসা (আঃ) বললেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

অর্থাৎ হে ফেরাউন! বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও, তাদেরকে বন্দী দশা থেকে মুক্তি দাও এবং তাদের পৈত্রিক দেশ সিরিয়ায় যেতে বাঁধা দিওনা।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ

তখন ফেরাউন বললো, তুমি যদি তোমার নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি এই দাবীতে সত্যবাদী হও।

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযার বিবরণ

হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিটি (মাটিতে) ফেলে দিলেন, তখন লাঠি তাঁর মোযেজা স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট অজগর সর্পে পরিণত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ঐ অজগর সর্পটির বর্ণ ছিল হলুদ। তার শরীরের উপরে কিছু চুলও ছিল, সে তার মুখ খুলে রেখেছিল, তার উপরের চোয়াল এবং নীচের চোয়ালের মধ্যে দূরত্ব ছিল আশি হাত। তার শরীর মাটি থেকে এক মাইল পরিমাণ উঁচু ছিল, তার নিচের চোয়াল যখন মাটিতে থাকত তখন উপরের চোয়াল ফেরাউনের রাজমহলের উপরে থাকত। ঐ অজগর সর্পটি যখন ফেরাউনের দিকে অগ্রসর হলো, সে তখন সিংহাসন থেকে পলায়ন করল আর এতো ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলো যে, চারশ' বার তার দাস্ত হয়েছে। অজগর সর্পটি যখন মানুষের দিকে হামলায় উদ্দত হয় তখন মানুষ চিৎকার করে পলায়ন করতে থাকে, এই পলায়নের সময় ভিড়ে ৫ জন মারা যায়। ফেরাউন তার গৃহে প্রবেশ করে বলে, হে মূসা! আমি তোমাকে তাঁর দোহাই দিচ্ছি যিনি তোমাকে আমার নিকট প্রেরণ করেছেন। এই অজগর সর্পটি নিয়ন্ত্রণ করো, আমি তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকেও প্রেরণ করবো। হযরত মূসা (আঃ) তখন অজগর সর্পটির ধরে ফেললেন ফলে সে সাবেক লাঠিতে পরিণত হলো কাতাদা (রহঃ) আবদুর রাজ্জাক, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম ঘটনার এ বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন।[১]

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ

এরপর ফেরাউন বললো, এছাড়া তোমার নিকট আর কি মোজেযা আছে, তখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর হাতটি বের করলেন যা ছিল অত্যন্ত সমুজ্জল, আলোকময়, যার চমক ছিল অসাধারণ। সূর্যের কিরণের চেয়েও অধিকতর আলোকময়, যারা সেদিকে দৃষ্টিপাত করত তারা আকৃষ্ট হতো। এরপর হযরত মূসা (আঃ) হাতটি জামার ভেতরে নিয়ে গেলেন তখন তা পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬০

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ
قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ
أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ
حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ
قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ
الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ
الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ
وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا
هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾
فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

তরজমা

(১০৯) ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, নিশ্চয় এ হল একজন অত্যন্ত পাকা যাদুকর।

(১১০) সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিঃস্কার করতে চায়। এখন তোমাদের পরামর্শ কি?

(১১১) তাকে ও তার ভ্রাতাকে অবকাশ দাও এবং বিভিন্ন শহরগুলোতে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ কর।

(১১২) যেন তারা সুদক্ষ যাদুকর মাত্রকে তোমার নিকট উপস্থিত করে।

(১১৩) এবং যাদুকররা ফেরাউনের নিকট এসে বলল, আমরা যদি বিজয় লাভ করি তবে আমরা বড় পুরস্কার পাব?

(১১৪) ফেরাউন বলে, অবশ্যই পাবে, অধিকন্তু তোমরা আমার সান্নিধ্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(১১৫) যাদুকররা বলল, হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করব?

(১১৬) মূসা বললেনঃ তোমরাই নিক্ষেপ কর, যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা মানুষের চোখে যাদু করল, তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে এক বিরাট যাদু উপস্থিত করল।

(১১৭) আমিও মূসার প্রতি নির্দেশ প্রদান করলাম, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর ফলে তখনই তা তাদের অলিক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

(১১৮) অতঃপর সত্য সু-প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হল।

(১১৯) সেখানেই তারা পরাজিত হয় এবং অপমানিত হয়ে ফিরে যায়।

(১২০) এবং যাদুকররা সেজদায় পতিত হয়।

(১২১) তারা বলে, আমরা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছি।

(১২২) যিনি মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর প্রতিপালক।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক যে মোজেযা দান করেছিলেন তন্মধ্যে দু'টি মোজেযা ফেরাউন দেখেছিলো এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরামর্শ করলো যে, এ মুহূর্তে আমাদের কী করণীয়? তারা মনে করেছে হযরত মূসা (আঃ) যাদু প্রদর্শন করছেন, তাই তারা পরার্শ করলো যাদুর মোকাবেলা যাদু দিয়েই করতে হবে। তারা বললো, মূসা (আঃ) অত্যন্ত সুদক্ষ যাদুকর। সে লাঠিকে সর্পে পরিণত করেছে এবং স্বীয় হস্তকে অত্যন্ত আলোকময় এবং সমুজ্জ্বল করে দেখিয়েছে।

يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ

তারা আরো বললো, মূসা চায় যাদুর জোরে সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে। শুধু তাই নয়; ফেরাউনের স্থলে সে নিজেই বাদশাহ হতে চায়।

فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ

ফেরাউন বললো, তাহলে তোমরাই বল এ মুহূর্তে কি কর্মসূচী গ্রহণ করবো? আমি তোমাদের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করবো।

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ

ফেরাউনের পরামর্শ দাতারা বললো, এ মুহূর্তে মূসা ও তার ভাইকে একটু অবকাশ দাও এবং মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে তড়িঘড়ি করে কিছু করোনা।

এখানে উল্লেখ্য, এই পরামর্শে ফেরাউন ও তার দলবলের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে কেননা, ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে হত্যা বা বন্দী করতে সাহস করেনি। এমনকি, তাঁর সম্পর্কে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেও সক্ষম হয়নি। ফেরাউনের দলবল তাকে আরেকটি পরামর্শ দিয়েছে আর তা হলঃ

وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ

এবং দেশের বিভিন্ন শহরে লোকজন প্রেরণ কর যারা তোমার নিকট দেশের দক্ষ যাদুকরদেরকে একত্রিত করবে, এই যাদুকরেরা মোকাবেলা করবে মূসা (আঃ)-এর এবং তাকে পরাজিত করবে। ফেরাউনের দলবলের এ পরামর্শ গ্রহণ করা হল এবং দেশের বিভিন্ন নগরে সরকারী লোকজন ছড়িয়ে পড়লো ও যাদুকরদেরকে ফেরাউনের নিকট একত্রিত করলো।

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ

যাদুকররা একত্রিত হল

যথাসময়ে দেশের বিখ্যাত এবং দক্ষ যাদুকররা ফেরাউনের নিকট হাযির হল। তারা বললো, যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমাদের বিরাট পুরস্কার রয়েছে তো! আমরা বড় রকমের পুরস্কার পাবতো!

আল্লাহ ওয়ালা ও দুনিয়াদার লোকের মধ্যে পার্থক্য

ফেরাউন যে পেশাদার যাদুকরদের একত্রিত করেছে তারা শুরুতেই তাদের পুরস্কারের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছে, দুনিয়াদার স্বার্থান্ধ মানুষের মধ্যে এবং আল্লাহ ওয়ালা লোকদের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। আল্লাহর নবীগণ সবচেয়ে বড় আল্লাহ ওয়ালা। তাঁরা আল্লাহর মনোনীত, পছন্দনীয়, তাই তাঁরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো নিকটই তাঁদের সাধনার প্রতিদান আশা করেন না।

পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়াদার, যারা পেশাদার তারা পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে ব্যাকুল থাকে তাই যাদুকররা তাদের স্বার্থের ব্যাপারে আগেই ফেরাউন থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চেয়েছে। আর পয়গম্বরগণ বলেনঃ

لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ

আমার পরিশ্রমের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। যাহোক, ফেরাউন যাদুকরদের প্রশ্নের জবাবে বললো ঃ

نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট পুরস্কার। শুধু তাই নয়; বরং যারা আমার নৈকট্য-ধন্য, তোমরা হবে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

যাদুকরদের সংখ্যা

এতে কোন সন্দেহ নেই, তদানীন্তনকালে যাদু বিদ্যা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিলো। এমনকি ঐ সময় পৃথিবীতে মিশর ছিল যাদু বিদ্যার কেন্দ্র। কিন্তু প্রশ্ন হল হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় যে যাদুকরদের একত্রিত করা হয়েছিলো তাদের সংখ্যা কত ছিল?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ এ সম্পর্কে তফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে। মোকাতেল (রহঃ) বলেছেন, সমবেত যাদুকরের সংখ্যা ছিল ৭২। যাদের মধ্যে ৭০ জন ছিল ইসরাঈলী আর ২ জন ছিল শামুন। আর সে-ই ছিল যাদুকরদের দলপতি। কালবী (রহঃ) বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। আর একজন তাদের নেতা ছিল তার নিকট থেকেই সকলে যাদু শিখেছিল, সে ছিল ইরাকের 'নাইনোয়া' নামক স্থানের অধিবাসী, সে তখন ফেরাউনের কারাগারে বন্দী ছিল।

কা'ব (রহঃ) বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার। আর সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজারের কিছু বেশী।

একরামা (রহঃ) বলেছেন যে, ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় ৭০ হাজার যাদুকরদের একত্রিত করেছিলো আর মোহাম্মদ এবন মোনকাদের (রহঃ) বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার।[১]

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ

যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললো, প্রথমে আপনি নিক্ষেপ করবেন, না আমরা নিক্ষেপ করবো?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬২

قَالَ اَلْقُوْاۚ

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, 'তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর'।

এখানে উল্লেখ্য, যেহেতু ইতিপূর্বে ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠির মোজেযা দেখেছিল হয়তো এজন্যেই যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে অনুরূপ যাদুর মোকাবেলা করার ইচ্ছা করে। হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি সিদ্ধান্তই নিয়ে থাক যে, আমার সাথে যাদু বিদ্যায় মোকাবেলা করবে তবে তোমরাই প্রথমে যা ইচ্ছা নিক্ষেপ কর এবং নিজেদের শক্তি পরীক্ষা কর। যাদুকরদের ধারণা ছিল, যখন আমরা সমবেতভাবে আমাদের যাদু প্রদর্শন করবো তখন হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত বিস্মিত হবেন। হযরত মূসা (আঃ) শরাফত এবং ভদ্রতার খাতিরে বললেন, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর, আমি এজন্যে চিন্তিত নই যে, কে প্রথমে নিক্ষেপ করলো আর কে পরে। কেননা, তাঁর অন্তরে পরিপূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস ছিল যাদু বিদ্যা কোন দিন মোজেযার মোকাবেলা করতে পারে না, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিজয়তো সু-নিশ্চিত। তাই তিনি বললেন, তোমরাই আগে নিক্ষেপ কর।

فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ

যখন যাদুকররা তাদের লাঠি এবং রশি নিক্ষেপ করলো তখন তারা মানুষের চোখে যাদু করল অর্থাৎ লাঠি এবং রশিগুলোকে মানুষ সর্পরূপে দেখতে লাগল। এক মাইল দৈর্ঘে এবং এক মাইল প্রস্থে সর্বত্র শুধু সাপ। এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হল এবং এই ধারণা করল, এই যাদুর মোকাবেলা করা হয়তো কারো পক্ষেই সম্ভব হবেনা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি ছিল বিরাট যাদু। এখন হযরত মূসা (আঃ)-এর তরফ থেকে মোকাবেলার পালা। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ

আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। যখন মূসা (আঃ) লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন তা এক বিরাট ভয়ংকর অজগরে রূপান্তরিত হল এবং যাদুকরদের প্রদর্শিত সর্পগুলো গ্রাস করতে লাগল। তফসীরকার এবনে যায়েদ লিখেছেনঃ এ ঘটনাটি ঘটে মিশরের এস্কান্দরিয়া শহরে। এ অজগরের মুখটি ছিল আশি হাত চওড়া, যখন সে হা করল তখন যাদুকরদের প্রদর্শিত সর্পগুলো মিছিল করে তার মুখে প্রবেশ করল, অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত সাপ সে গ্রাস করে ফেলল,

এরপর সে সমবেত জনতার দিকে অগ্রসর হল। ঐ ভয়ংকর দৃশ্য দেখে মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে পলায়ন করতে লাগল। পলায়নপর মানুষের ভীড়ের চাপে অনেক লোক মারা যায়। এরপর মূসা (আঃ) অজগরটিকে ধরে ফেললেন। সে পুনরায় লাঠিতে পরিণত হল। বুদ্ধিমান যাদুকররা এ সত্য উপলব্ধি করল যে, হযরত মূসা (আঃ) যা দেখিয়েছেন তা আদৌ যাদু নয়; বরং এটি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র যা আল্লাহর নবীর মোজেযা স্বরূপ দেখানো হয়েছে। এ অলৌকিক সত্য আমাদের মিথ্যা যাদুকে গ্রাস করে ফেলবে, এটিই স্বাভাবিক। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۞ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ

আর তারা যা করছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হল এবং যাদুকররা পরাজিত হল এবং অপমানিত অবস্থায় ফিরে গেল। তারা তাদের পরাজয় স্বীকার করে নিল এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা তথা অলৌকিক শক্তি দেখে তারা সত্য উপলব্ধি করল এবং সেজদায় পতিত হল, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ۞ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۞ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ۞

তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেজদায় পতিত হয়ে বলল, আমরা ঈমান আনলাম বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি। যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রতিপালক। যাদুকররা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনার কথা ঘোষণার পর ঃ

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

কথাটি এজন্যে সংযোজন করেছে যেন ফেরাউনের দলের কেউ এ ভুল ধারণা না করে যে, তারা ফেরাউনকে সেজদা করেছে কেননা, ফেরাউনও “রব্বে আ'লা” হওয়ার মিথ্যা দাবী করতো।

যে সত্য প্রমাণিত হল

এ ঘটনায় যে সত্য প্রমাণিত হল তা হচ্ছে, বাতিল কোনদিনও হক্বের মোকাবেলা করতে পারেনা। হক্ব সর্বদাই জয়ী হয় আর বাতিল পরাজিত হতে বাধ্য হয়। মক্কা বিজয়ের দিন যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দশ হাজার পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পবিত্র কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে আগমন করলেন,

সেদিন কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাতে পৌত্তলিকদের রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি একটি একটি করে ভেঙে দিলেন, তখন তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেনঃ

وَقُلْ جَاۤءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে আর মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য। বস্তুতঃ এ সত্য যুগে যুগে বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিজয় একমাত্র সত্যেরই হয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর বেলায়ও তাই হয়েছে।

ফেরাউনের ডাকে যে যাদুকররা সমবেত হয়েছিল তারা এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল যে, যেখানে তাদের যাদু বিদ্যার শেষ, সেখানে শুরু হয় হযরত মূসা (আঃ)-এর অলৌকিক শক্তি। তারা এ সত্য অবিলম্বে উপলব্ধি করল, কোন প্রকার বস্তুগত সাহায্য ব্যতীত যিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের মত শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে ফেরাউনের বিরুদ্ধে বিজয় মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন তিনিই সত্যিকার প্রতিপালক, তিনিই রব, আর তিনি শুধু মিশরের নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেন।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

আল্লাহ পাক ফেরাউনের হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন, কিন্তু হেদায়েত লাভ করল ফেরাউনের যাদুকররা। এর কারণ কি?

তফসীরকারগণ বলেছেন, যাদুকররা মোকাবেলা করার সময় হযরত মূসা (আঃ)-এর আদব রক্ষা করেছে এভাবে যে, তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছে, আপনি আগে নিক্ষেপ করবেন, না আমরা আগে নিক্ষেপ করব? আল্লাহর নবীর প্রতি তাদের এই আদবের বরকতেই আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েতের তওফিক দান করেছেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ যাদুকররা যে পোষাক পরিধান করেছিল তা ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর পোষাকের অনুরূপ, তারা পোষাকের ক্ষেত্রে হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুকরণ করেছিলো, এর বরকতে আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত নসীব করেছেন এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত হয়েছিলো। ঐ মুহূর্তে যাদুকরদের অন্তরে যে অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করেছিলো তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাদের সেজদারত হওয়ার মাধ্যমে।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৫-৯৬

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যখন যাদুকরগণ বললো ঃ

آمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করেছি'।

তখন ফেরাউন বললোঃ তোমরা আমার উদ্দেশ্যেই একথা বলছ, তখন তারা বললঃ

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

'যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক, আমরা তাঁর প্রতিই ঈমান এনেছি'।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ হযরত মূসা ও হারুন (আঃ)-এর নাম এজন্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁরাই আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়েছেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন যাদুকররা ঈমান আনল তখন ৬ লাখ বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হলো।[২]

قَالَ فِرْعَوْنُ
اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى
الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾ لَاُقَطِّعَنَّ
اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾
قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا
لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

তরজমা

(১২৩) ফেরাউন বললো, তোমরা কি আমার অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস করলে? এ হল তোমাদেরই ষড়যন্ত্র, নগরবাসীদেরকে নগর থেকে বহিষ্কার করার উদ্দেশ্যেই তোমরা এ ষড়যন্ত্র করেছ। অতএব, তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারবে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২০৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৪

(১২৪) আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং বিপরীত দিকের পা কর্তন করবো এবং অবশ্যই তোমাদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাবো।

(১২৫) তারা বললো, আমাদেরকে তো আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতেই হবে।

(১২৬) আর তুমি তো আমাদেরকে শুধু এজন্যে শাস্তি দিচ্ছ যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহের উপর ঈমান আনয়ন করেছি যখন তা আমাদের নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে ধৈর্যের দ্বার উন্মুক্ত কর আর মুসলমান অবস্থায় আমাদের মৃত্যু ঘটাও।

তফসীরুল কোরআন

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ج

ফেরাউন যখন দেখল যে তার সকল পরিকল্পনা বাতিল হল, যে যাদুকরদের সে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় হাযির করেছিলো, যারা এসেছিল সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা হল সত্যের অনুসারী। তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি হল অনুগত, আল্লাহ পাকের দরবারে হল সেজদারত, তাদের মধ্যে এ বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখে ফেরাউন তাদেরকে বলল, তোমরা ঈমান আনলে আমার অনুমতির পূর্বেই? আমিই যে তোমাদেরকে এনেছি এখানে অতএব, আমার অনুমতি ব্যতীত কি করে তোমরা তোমাদের কার্যক্রম নির্ধারণ করতে পার?

তবে হ্যাঁ আমি লক্ষ্য করছি তোমরা পূর্ব থেকেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, তোমরা নগরবাসীকে এখান থেকে বের করতে চাও, তবে তোমাদের ওস্তাদ মূসার (আঃ) পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেকই এসব কিছু করেছ, তোমরা ইচ্ছা করেই এ পরাজয় বরণ করেছ। বস্তুতঃ মিশরের ক্ষমতা দখল করাই হল তোমাদের মূল লক্ষ্য।

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

যাহোক, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে এই ষড়যন্ত্রের পরিণাম কত ভয়াবহ!

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ সমবেত জনতার সম্মুখে ফেরাউন তার অপমান ঢাকা দেয়ার জন্যেই এসব হুমকি-ধমকি দিয়েছে, পরবর্তী বাক্যে ফেরাউন যাদুকরদের উদ্দেশ্যে শাস্তি ঘোষণা করেছে এভাবে–

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ

'আমি তোমাদের হাত এবং বিপরীত দিকের পা কেটে দেব এবং তোমাদের সকলকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেব'।

ফেরাউন যাদুকরদেরকে দু'টি কথা বলেছেঃ প্রথম কথাটি হল মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে মিলে তোমরা এ ষড়যন্ত্র করেছ, সে তোমাদের ওস্তাদ। ফেরাউনের এসব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা কেননা, হযরত মূসা (আঃ) মাদায়েন থেকে আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে মিশর এসেছেন এবং সরাসরি ফেরাউনের নিকট গমন করেছেন, এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে তাকে আহবান জানিয়েছেন এবং তাকে তাঁর মোজেযা প্রদর্শন করেছেন, ফেরাউনই তাঁর মোকাবেলায় যাদুকরদের একত্রিত করেছে, এ যাদুকরদের সঙ্গে হযরত মূসা (আঃ)-এর ইতিপূর্বে কোন পরিচয় ছিলনা। কোনদিন তাদের সঙ্গে দেখাও হয়নি, কিন্তু ফেরাউন সমবেত জনতার দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতেই এ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

ফেরাউন এ পর্যায়ে দ্বিতীয় কথা বলেছে, আমি তোমাদের হাত পা কেটে দেব, তোমাদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেব। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হাত পা কর্তন এবং ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানোর শাস্তি ইতিহাসে সর্ব প্রথম ফেরাউনই দিয়েছিলো।[১]

ঈমান লাভের পর ভয় শুধু আল্লাহর প্রতি

যাদুকররা যখন ফেরাউনের তরফ থেকে শাস্তির ঘোষণা শুনল তখন তারা অত্যন্ত নিঃশঙ্ক এবং নির্ভীক চিত্তে, শান্তকণ্ঠে ফেরাউনকে জবাব দিল, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ

আমাদেরকে তো একসময় আমাদের প্রতিপালকের মহান দরবারে ফিরে যেতেই হবে। অতএব, তোমার ঘাড়ে চেপেও যদি যেতে হয় তাতে আমাদের কোন আপত্তি থাকতে পারেনা, আমরা তোমার শাস্তির ঘোষণায় আদৌ ভীত-সন্ত্রস্ত নই। ফেরাউনের মুখের ওপর যাদুকরদের একথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের হুমকি ধমকি যাদুকরদের মনে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, এক আল্লাহর প্রতি যারা প্রকৃত ঈমান আনে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনা কেননা, প্রকৃত মোমেন বিশ্বাস করে আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁর

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৬

নিয়ন্ত্রণাধীন, কতৃত্বাধীন, প্রকৃত মোমেন একথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো উপকারও করতে পারেনা এতটুকু অপকারও করতে পারে না।

অতএব, সে আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেনা। প্রকৃত মোমেন আশা করে শুধু আল্লাহর কাছে, ভয় করে শুধু আল্লাহকে আর ভরসা করে শুধু আল্লাহর প্রতি, ঈমান লাভের পর মানব মনে এমনি বিপ্লব আসে আর এ বিপ্লব ঈমানেরই ফলশ্রুতি। আমরা এ সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ লক্ষ্য করি ফেরাউন কর্তৃক আহুত যাদুকরদের মধ্যে। তারা তওহীদের পেয়ালা পান করেছে একটু পূর্বেই, ঈমান তাদের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, আল্লাহর প্রেমের মদিরা পান করে তারা হয়েছে প্রকৃত মোমেন, তাই মিশরের রাজা ফেরাউনের ভয় তাদের অন্তর থেকে দূর হয়েছে, তারা সত্যের সন্ধান পেয়েছে, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাই তারা উপলব্ধি করেছে আখেরাতের কষ্টের তুলনায় দুনিয়ার কষ্ট কিছুই নয়। আখেরাতের সাফল্যই হল প্রকৃত সাফল্য, তাই তারা বলেছেঃ

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ

"তারা বলল, নিশ্চয় আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতেই হবে"। তারা আরো বলল, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا

আমরা যে আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, এ কারণেই আমাদের প্রতি তোমার এত আক্রোশ, আমাদের নিকট যখন আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ এসেছে, তখন আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে নিয়েছি।

অতএব, আমরা তোমার শাস্তির ভয় করিনা, অবশেষে একদিন আমাদের প্রতিপালকের নিকট হাযির হতেই হবে।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য, যাদুকররা যেহেতু ফেরাউনের ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত ছিল তাই তারা একথা বলেননি যে, তুমি আমাদেরকে কাবু করতে পারবেনা, অথবা আমরা তোমার মোকাবেলা করব; বরং তারা ফেরাউনের ধমকিকে মেনে নিয়ে বলেছে, তুমি আমাদেরকে যে কোন প্রকার শাস্তি দিতে পার তবে সেই শাস্তি দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ব্যাপারেই হবে আর তা আখেরাতের শাস্তি থেকে

নাজাত লাভের কারণ হবে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে যাদুকরদের একথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে ঃ

فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ط اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ হে ফেরাউন! তোর যা ইচ্ছা তাই কর, ব্যাপার শুধু এতটুকুই যে, এ জীবন সম্পর্কে তোর আদেশ কার্যকর হতে পারে এবং তোর ক্রোধের পরিণতি স্বরূপ আমাদের এ জীবনের অবসান ঘটতে পারে, কিন্তু স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের পর আমাদের দৃষ্টিতে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনেরই কোন গুরুত্ব রয়নি। গুরুত্ব হল সেই চিরস্থায়ী জিন্দেগীর যা এ জীবনের পর আসবে যার পর আর কোন মৃত্যু নেই কেননা, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে সুখ হলে তা চিরসুখ আর দুঃখ হলে তা চিরদুঃখ।

লক্ষ্যনীয়, এসব কথা তাদের, যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর আগমনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাফের ছিল, ফেরাউনের অনুগত ছিল, ফেরাউনের আহবানে সাড়া দিয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় হাযির হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর নবীর সান্নিধ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঈমানী নূরে তাদের অন্তর আলোকিত হল এবং বাতিলের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে এবং সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হল।

বর্ণিত আছে যে, এসব কথা বলার পর সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরগণ ফেরাউনের দিক থকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে এই বলে দোয়া করতে থাকেন ঃ

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

হে আমাদের প্রতিপালক! জালেম ফেরাউনের নির্যাতনের প্রেক্ষিতে আমাদেরকে সবর অবলম্বনের তৌফিক দিও, আর এ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা যেন মুসলমান থাকতে পারি তার তওফিক দিও, আর মুসলমান অবস্থায়ই মৃত্যু দান কর।

যাদুকরগণ যে আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করে ধন্য হয়েছিলেন এ দোয়া তারই নিকৃষ্ট প্রমাণ।

এবনে আব্বাস (রাঃ), কালবী (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, ফেরাউন তার ঘোষণা মোতাবেক যাদুকরগণের হাত পা কর্তন করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ফেরাউন তাদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেনঃ

فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيٰتِنَآ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ

"ফেরাউন ও তার দলবল তোমাদের উপর জুলুম করতে সক্ষম হবেনা, তোমরা আমার নিদর্শন সমূহ নিয়ে যাও, তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে"।[১]

وَقَالَ

الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ

وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَ

اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ

لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۸﴾ قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا

جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى

الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

তরজমা

(১২৭) এবং ফেরাউনের জাতির প্রধানরা বলে, তুমি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে এবং তোমাকে ও তোমার দেবতাদেরকে বর্জন করতে দেবে? ফেরাউন বললো, আমি অবশ্যই তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করবো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখবো আর তাদের উপর আমার সেই ক্ষমতা অবশ্যই আছে।

(১২৮) মূসা তার জাতিকে বললেন, তোমরা আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থনা কর এবং সবর অবলম্বন কর, পৃথিবীতো আল্লাহ পাকেরই, তিনি তাঁর বন্দাদের মধ্যে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৫

যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর উত্তরাধিকারী করেন আর শুভ পরিণতি তো শুধু পরহেযগার লোকদের জন্যেই।

(১২৯) তারা বললো, হে মূসা! তোমার আগমনের পূর্বেও আমরা নির্যাতীত হয়েছি এবং তোমার আগমনের পরও আমরা উৎপীড়িত হয়েছি। মূসা বললেন, অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং দেশে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। এরপর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন।

তফসীরুল কোরআন

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ

যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর এই বিরাট মোজেযা প্রকাশিত হল এবং যাদুকরগণ আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনে সেজদারত হল এবং ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীদের মনও এদিকে আকৃষ্ট হল তখন ফেরাউন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হল, তার দরবারের প্রধানরাও প্রমাদ গুণতে লাগলো। আর এজন্যেই ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করলো না। তাঁকে বন্দী করার বা হত্যা করার আদেশ দিলনা, ফেরাউনের দলবল তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বললোঃ

اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ

তুমি কি মূসাকে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে এভাবে ছেড়ে দেবে? তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বেড়াচ্ছে, তারা তোমাকে ও তোমার দেবতাদেরকে বর্জন করতে বলছে। অর্থাৎ মূসা বলছে যেন তোমারও উপাসনা না করা হয় এবং তোমার দেবতাদেরও।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ফেরাউনের নিকট একটি গাভী ছিল। সে তার পূজা করতো এবং সে এই আদেশ দিয়ে রেখেছিল সুন্দর গাভী পেলে, যেন তার পূজা করা হয়। এজন্যেই সামেরী গাভীর বাছুর বানিয়ে বনী ইসরাঈলকে তার পূজা করার আদেশ দিয়েছিল। হযরত হাসান (রঃ) বর্ণনা করেন, ফেরাউন তার গলায় একটি ক্রুশেড লাগিয়ে রাখতো যার সে পূজা করতো। সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, ফেরাউন কিছু মূর্তি বানিয়ে রেখেছিল এবং তার সম্প্রদায়কে ঐ মূর্তিগুলোর পূজা করার আদেশ দিয়েছিল এবং বলেছিল, এ মূর্তিগুলো তোমাদের উপাস্য তবে আমি হলাম তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৬

বর্ণিত আছে যে, ফেরাউন নক্ষত্রপুঞ্জের ক্রিয়ার উপরও বিশ্বাস করতো, সে চন্দ্র সূর্যের পূজা করতো এবং মানুষকে তার পূজা করার আদেশ দিত এবং বলতো, পৃথিবীতে আমিই তোমাদের প্রতিপালক। সে তার নিজের মূর্তি তৈরী করে মানুষের মধ্যে বিতরণ করতো এবং তার মূর্তিগুলোর পূজা করার আদেশ দিত। সে বলতো, এই মূর্তিগুলো হল ছোট খোদা। আর আমি হলাম তোমাদের সবচেয়ে বড় খোদা (নাঊজুবিল্লাহ মিন জালিক)।

যাহোক, ফেরাউনের পরামর্শ দাতারা বললো যে, মূসা (আঃ)-কে এমন স্বাধীনতা দান করা কোন অবস্থাতেই সমীচিন নয়। কেননা, সে তোমার এবং দেশের সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে।

قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ

সে বললোঃ আমরা অচিরেই তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করবো যেন তাদের বংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখবো যেন তাদেরকে আমরা আমাদের কাজে ব্যবহার করি যেভাবে ইতিপূর্বে আমরা করেছি। উল্লেখ্য, হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বেও ফেরাউন গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে বনী ইসরাঈলের সন্তানদেরকে হত্যা করেছিল এবং কিছুদিনের জন্যে এ কার্যক্রম বন্ধ ছিল। সে হত্যাকান্ড নতুন করে শুরু করার আদেশ দিল এবং বললো, বনী ইসরাঈলের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তারা আমাদের কর্তৃত্বাধীন, তাদের ব্যাপারে আমরা যা ইচ্ছা তা করতে পারি।[১]

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, ফেরাউন এ সংকল্প করেছে যে, বনী ইসরাঈলদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু সে একথা বলেনি যে মূসাকে হত্যা করবো। কেননা, তার এ বিশ্বাস ছিল যে মূসাকে হত্যা করার ক্ষমতা তার নেই। এদিকে ফেরাউন নতুন করে বনী-ইসরাঈলীদের হত্যা করার যে আদেশ দিয়েছে তা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে তাদের মনের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা প্রকাশ করলো যে, এখন আমাদের কি গতি হবে?

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْاۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ

হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমরা এই বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা, জালেম ফেরাউনের জুলুম

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৬-৩০৩

অত্যাচারের মোকাবেলায় আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন, আর সবর অবলম্বন কর, অধৈর্য হয়োনা কেননা, বিপদে অধৈর্য হলে বিপদ আরো বাড়ে। আর ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করা যায়। কেননা আল্লাহ পাক ধৈর্য ধারণকারীদের সঙ্গে আছেন। তবে মনে রেখ, এই পৃথিবী আল্লাহ পাকের তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করেন। যদিও বর্তমানে মিশর এক জালেমের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাফল্যমন্ডিত করবেন।

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

'আর শুভ পরিণতি সু-নিশ্চিত শুধু তাদের জন্যে যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে'।[১]

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে সাহায্য প্রার্থনার তাৎপর্য হল আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীতভাবে সাহায্যের জন্যে দোয়া কর।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখ।

তৃতীয়তঃ ফেরাউনের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যে জুলুম অত্যাচার করা হচ্ছে তার উপর সবর কর। আর একথাও জেনে রাখ, সারা পৃথিবীই আল্লাহ পাকের এবং যারা নেককার পরহেযগার তাদের শুভ পরিণতি সু-নিশ্চিত।

عاقبة তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য শুধু পরহেযগারদের জন্যেই।

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে দু'টি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন আর দু'টি বিষয়ের সু-সংবাদ দিয়েছেন। যে দু'টি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন তা হল ঃ

১. আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।

২. বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা।

আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনার আদেশের কারণ হচ্ছে এই, যারা একথা পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ পাক ব্যতীত এই পৃথিবীতে তার কোন সাহায্যকারী নেই তারা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করতে পারে, তাদের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৯

মনের কপাট খুলে দেয়া হয় এবং আল্লাহ পাকের নূরে তাদের অন্তর আলোকিত হয়। ফলে বিপদাপদে সবর অবলম্বন করা তাদের পক্ষে সহজ হয়। কেননা, সে এ সত্য উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত কিছুই হয়না। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তাঁর দয়ায় এই বিপদ অবশ্যই দূর করবেন।

আর যে দু'টি সুসংবাদ হযরত মূসা (আঃ) দিয়েছেন তা হল ঃ

১. এই পৃথিবী এক আল্লাহ পাকের, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে পৃথিবীর ক্ষমতা দান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে ফেরাউনের স্থলে তোমাদেরকেও এদেশের ক্ষমতা দান করতে পারেন।

২. অবশেষে শুভ পরিণতি শুধু মোত্তাকীদের জন্যে সুনিশ্চিত। তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল আখেরাতের সাফল্য। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ হল বিজয়, সাফল্য, এ পৃথিবীতে নেককার পরহেযগারগণই লাভ করবে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হল দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য সু-নিশ্চিত রয়েছে পরহেযগার লোকদের জন্যে।[১]

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا

ফেরাউন বনী-ইসরাঈল জাতির সম্পর্কে যে শাস্তির কথা বলেছে তাতে বনী ইসরাঈল অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট গেল যে, আমরা আপনি আসার আগেও নির্যাতিত ছিলাম এবং আপনি আসার পরও আমরা নির্যাতীত। ইতিপূর্বেও আমাদের সন্তানদের হত্যা করা হত এবং এখনও সেই কার্যক্রম শুরু করার আদেশ হল, আমরা আর কত সবর করবো? তখন মূসা (আঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ

قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

অর্থাৎ তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়োনা, আশা করি তোমাদের প্রতিপালক ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অর্থাৎ এদেশের ক্ষমতা তোমাদেরকে দান করবেন।

فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

তোমাদেরকে ক্ষমতা দেয়ার পর তিনি লক্ষ্য করবেন তোমরা কেমন কাজ কর। অর্থাৎ তোমাদেরকে ক্ষমতার নেয়ামত দেয়ার পর তোমরা কৃতজ্ঞ হও, না অকৃতজ্ঞ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২১২

তা লক্ষ্য করা হবে। যেমন তোমরা বিপদগ্রস্ত ছিলে তখন তোমরা সবর করছে কি-না তা লক্ষ্যণীয় ছিল।

মোজেযা ও যাদুর পার্থক্য

আল্লাহ্ পাক যাঁকে নুবওয়্যত ও রেসালত দান করেন তাঁকে মোজেযাও দান করেন। আর এ মোজেযা হয় নবুওয়্যতের দলিল। মোজেযা এমনি একটি অলৌকিক শক্তি যার মোকাবেলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নমরুদ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলে তাঁর জন্যে তা সুশীতল ও শান্তিময় হওয়া। হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি অজগর সর্পে পরিণত হওয়া। হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাতের স্পর্শে জন্মান্ধ চক্ষুস্মান হওয়া এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলির ইঙ্গিতে চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত হওয়া। এসব কাজের দৃষ্টান্ত পেশ করা নবী রসূল ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এ কাজটি স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের, বন্দার নয়।

আর যাদুর তাৎপর্য হল এমন বিস্ময়কর বিষয় যা দেখে মানুষ বিস্মিত হয়, যার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যাকে বলা হয় নজরবন্দী। যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা যায় কিন্তু মোজেযা কারো শিক্ষ্যনীয় বিষয় নয়; বরং এটি হল আল্লাহর নবী রসূলগণের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দান। যার দৃষ্টান্ত হল একটি কলম তাকে লিপিবদ্ধ করতে দেখা যায় কিন্তু লিপিবদ্ধ করা কলমের কাজ নয়; বরং লেখকের কাজ। ঠিক এভাবে মোজেযা আল্লাহ্ পাকের কাজ যা নবীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়, মোজেযা নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকই প্রকাশ করেন। আর যাদু হল একটি নিয়মের মাধ্যমে এবং বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ বিস্ময়কর কাজ করতে হয়। মোজেযা সম্পর্কে কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়নি। আর তা শেখাতে কোন পাঠাগারও তৈরী হয়নি। কেননা মোজেযা হল আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান যা আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় নবী রসূলগণকে প্রদান করেন। মোজেযার মোকাবেলায় যাদুর কোন গুরুত্বই নেই। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় ফেরাউন যাদুকরদের একত্রিত করেছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি যখন অজগর সর্পে পরিণত হয়ে যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত সর্প গিলে ফেলে, তখন যাদুকররা চিৎকার করে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো, আমরা ঈমান এনেছি মূসা এবং হারুনের প্রতিপালকের উপর।

মোজেযা এবং যাদুর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন মাওলানা রুমী (রহঃ)। এ পর্যায়ে তিনি একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ঘটনাটি এই, ফেরাউন যখন মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় যাদুকরদের একত্রিত করার আদেশ দিল তখন সে যুগের দু'জন বিখ্যাত

যুবক যাদুকরের নিকট ফেরাউনের চিঠি পৌঁছলো এ মর্মে যে, মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ) নামক দু'জন দরবেশ ব্যক্তি ফকীরের বেশে হাযির হয়েছে। একটি লাঠি ব্যতীত এই ফকিরের কাছে কিছুই নেই অথচ ফেরাউন তার মোকাবেলায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। তাই এমন কোন তদ্বীর কর, যার মাধ্যমে এ ব্যক্তিদের মোকাবেলা করা যায়।

شاه و لشکر جمله بے چاره شدند = ز ایں دو کس جمله با فغاں آمدند

প্রকৃত অবস্থা এই যে, বাদশাহ এবং তার সমস্ত বাহিনী এ দু' ব্যক্তির মোকাবেলায় অসহায় হয়ে পড়েছে। উক্ত যুবক যাদুকরদ্বয় যখন এ চিঠি পেল তখন তাদের অন্তরে হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে ভয় এবং মহব্বত সৃষ্টি হল। ভয় এজন্যে যে, দরবেশ ফেরাউনের ন্যায় শক্তিশালী রাজাকে অসহায় করে ফেলেছে তার শক্তি কত বেশী হবে কে জানে! আর মহব্বত এজন্যে পয়দা হয়েছে, ফকির দরবেশ হওয়া সত্ত্বেও যখন মিশরের বাদশাহ তাদের সম্মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত তবে অবশ্যই তারা আল্লাহর খাছ বন্দা হবেন।

উভয় যাদুকর এ খবর পেয়ে তাদের মাতার নিকট হাযির হল এবং বললো, আমাদের পিতার কবর দেখিয়ে দিন। আমরা তাঁর আত্মার সাথে কথা বলবো। তারা তিনটি রোজা রাখলো এবং এরপর তাদের পিতার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলললো, হে আমাদের পিতার আত্মা! আমরা আমাদের বাদশাহর কাছ থেকে এ পয়গাম পেয়েছি, আপনি আমাদেরকে এ নবাগতের অবস্থা এবং তাঁর লাঠির কথা জানিয়ে দিন। যদি এটি যাদু হয় তবে এক কথা, আর যদি তা আল্লাহ্ পাকের কুদরতের কোন বহিঃপ্রকাশ হয় তবে তা-ও বলে দিন যেন সঠিক পথ গ্রহণ করতে পারি। মাওলানা রুমীর ভাষায় ঃ

بعد ازاں گفتند اے با با بما = شاه پیغامے فرستاد ازجا

এরপর স্বপ্নযোগে তারা যা পয়গাম পেল ঃ

یک نشانے وانمایم باشما=تاشود پیدا شمارا این خفا

আমি একটি নিদর্শন তোমাদেরকে জানিয়ে যাচ্ছি যার কারণে রহস্য তোমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হবে।

آں زماں که خفته باشد آں حکیم= آں عصا گرید وبگزارید بیم

যখন সে দরবেশ ঘুমিয়ে থাকেন তখন চেষ্টা কর ঐ লাঠিটি সরিয়ে নেয়ার এবং ভয় করনা, যদি ঐ লাঠিটি তোমরা চুরি করতে সফল হও তবে মনে কর যে মূসা (আঃ) একজন যাদুকর। আর যদি ঐ লাঠি চুরি করতে সক্ষম না হও তবে মনে

করবে এটি আল্লাহ পাকের শক্তি, মূসা (আঃ) আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি, কেউ তাঁর মোকাবেলা করতে পারবে না।

گرجہاں فرعون گیرد ثرق وغرب=سرنگوں آید خدارا گاہ حرب

যদি ফেরাউন সারা পৃথিবীর শক্তির অধিকারী হয় তবুও তাকে মাথা নত করতে হবে, আল্লাহ পাকের সঙ্গে কেউ লড়াই করতে পারে না।

পিতার তরফ থেকে এ নিদর্শন জানতে পেরে উভয় যুবক হযরত মূসা (আঃ)-এর সন্ধানে বের হল। একটি বৃক্ষের নিচে তাঁকে নিদ্রিত দেখলো, তাঁর লাঠিটি পাশেই পড়ে আছে, এ অবস্থাকে তারা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে লাঠি চুরি করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল। কিন্তু এরই মধ্যে তা অজগর সর্পের রূপ নিয়ে আক্রমণে উদ্দত হল, তাই তারা পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলো।

মাওলানা রূমী (রহঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করে মোজেযা এবং যাদুর পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন। যাদু হল যাদুকরের কাজ। যাদুকর যখন তার যাদু সম্পর্কে অমনোযোগী হয় তখন তার যাদু শেষ হয়ে যায়। তাই মাওলানা রূমী বলেছেন ঃ

جان بابا ایں نشان قاطع است = تر بمیر ونیزحقش رافع است

'যাদুকর যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তার যাদুর কোন পথ প্রদর্শক থাকেনা'।

পক্ষান্তরে, মোজেযা হল স্বয়ং আল্লাহ পাকের কাজ যা তিনি তাঁর প্রেরিত নবী রসূলের মাধ্যমে সৃষ্টি করেন যেন তাঁর নবীর সত্যতা প্রকাশিত হয়। আর আল্লাহ পাক কোন জিনিষ যখন রাখতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে বিনাশ করার ক্ষমতা কারোই থাকেনা, স্বয়ং আল্লাহ পাকই তার হেফাজত করেন। আল্লাহর রসূলের দুশমনদের পরাজিত অসহায় এবং অক্ষম করার লক্ষ্যেই আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে মোজেযা দান করেন। মোজেযা কোন অবস্থাতেই নবী বা রসূলের কাজ হয় না; বরং এ কাজ হল আল্লাহ পাকের যা প্রকাশ পায় নবী রসূলের মাধ্যমে। কোন মোজেযা নবীর দোয়ার পরে প্রকাশিত হোক বা দোয়ার পূর্বে- যে কোন অবস্থায় তা আল্লাহ পাকেরই কাজ। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের আদেশ ক্রমে লোহিত সাগরে তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর মহান কুদরত এবং ক্ষমতা বলে লোহিত সাগরে বারটি পথ করে দিয়েছেন এবং পানিকে সরিয়ে দিয়েছেন। ঠিক এমনিভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের আদেশ ক্রমে তাঁর অঙ্গুলি দ্বারা চন্দ্রের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। ফলে আল্লাহ পাকের কুদরত, হেকমতে, শক্তিতে চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত হয়েছে।[১]

১। মসনবী মাওলানা রুম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০০-০১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৬-১০৮

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاِذَا
جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا
بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا
نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَ
الْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۫ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا
قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾

তরজমা

(১৩০) এবং আমি ফেরাউন ও তার দলবলকে দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করেছি যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

(১৩১) যখন তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হত তখন তারা বলত এ-তো আমাদের প্রাপ্য, আর যখন তাদের কোন অকল্যাণ হত তখন তারা বলত, এসব মূসা এবং তাঁর সঙ্গীদের দোষেই হয়েছে। জেনে রেখ, তাদের দুর্ভাগ্য তো আল্লাহ পাকেরই নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকেই তা জানেনা।

(১৩২) তারা বলল, আমাদেরকে যাদু করার জন্যে তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর-না কেন আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবনা।

(১৩৩) এরপর আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করি বান-তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত। এসব ছিল সুস্পষ্ট, ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন, কিন্তু তারা অহংকারীই রয়ে গেল, আর তারা ছিল এক পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে এ সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে,

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ পাক তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন।

আর এ আয়াতে প্রতিশ্রুত ধ্বংসের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। ফেরাউনের জাতিকে আল্লাহ্ পাক ক্রমশঃ ধ্বংস করেছেন। বিভিন্ন সময় তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার বালা-মছিবতে গ্রেফতার করেছেন। তারা যেন আত্মসংশোধন করে সেজন্যে তাদের উপর একাধিক বিপদাপদ আপতিত হয় যেন তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে, আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করার পরিণাম হয় ভয়াবহ। কখনো তাদের প্রতি দুর্ভিক্ষের আযাব নিপতিত হয়, কখনও তাদের ফল-ফলারী বিনষ্ট হয়, কখনো পঙ্গপাল তাদের ফসল ধ্বংস করে দেয়, কখনো তাদের গায়ে উকুন সৃষ্টি হয়, কখনো পোকা-মাকড় তাদের অশেষ কষ্টের কারণ হয়, কখনো ব্যাঙ তাদের ঘরে, তাদের পানাহারে, তাদের পোষাক–পরিচ্ছেদে এভাবে একত্রিত হয় যে, তাদের জীবন দূর্বিষহ হয়ে পড়ে। আবার কখনো তাদের পানি রক্তে পরিণত হয়, যখন তারা কোন পাত্রে পানি রাখত সে পানি রক্তে রূপান্তরিত হত। এসব বিপদের সময় তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আরজী পেশ করত যে, যদি আপনি দোয়া করেন, যদি এ বিপদ দূরীভূত হয় তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব।

হযরত মূসা (আঃ) দোয়া করতেন, আল্লাহ্ পাক তাদের বিপদ দূরীভূত করতেন। এরপর তারা পুনরায় আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হত, এভাবে বারে বারে তারা বিপদগ্রস্ত হয় এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে বিপদমুক্ত হলেই পুনরায় তারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হতো। যখন তাদের নাফরমানী, অবাধ্যতা এবং পাপাচারের কোন সীমা রইলনা, তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন। ফেরাউন তার সমস্ত সৈন্য সহ চিরতরে ধ্বংস হল এবং তাদের দেশ বনী ইসরাঈলের করতলগত হল। এভাবে বনী ইসরাঈলকে হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হল।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং মোহাম্মদ এবং মোনকাদের (রঃ) বর্ণনা করেন, ফেরাউন চারশ' বছর রাজত্ব করেছে এবং তার ৬২৬ বছর বয়সে সে কোন প্রকার কষ্ট পায়নি। ক্ষুধা, ব্যথা-বেদনা এমনকি জ্বর বা অন্য কোন রকম রোগ তাপ সে ভোগ করেনি। এসব কারণেই সে খোদায়ী দাবী করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। অবশ্য এ দাবীর মধ্যে একথা প্রমাণিত হয় যে, সে ছিল নির্বোধ। ফেরাউন ও তার সঙ্গী সাথীদের নির্বুদ্ধিতার কারণেই তারা আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্ পাকের যে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১১-১২

নেয়ামত সমূহ তারা ভোগ করতো তার শোকরিয়াও আদায় করেনি। আল্লাহর রসূল তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার আহবান জানান এবং তিনি নবুওয়্যতের দলিল হিসেবে মোজেযা পেশ করেন। কিন্তু ফেরাউন ও তার দলবল আল্লাহর নবীর আহবান প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ পাক তাদের অন্যায়-অনাচারের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের আযাবে পতিত করেন।[১]

فَاِذَا جَاۤءَتۡهُمُ الۡحَسَنَةُ قَالُوۡا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوۡا بِمُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗ ؕ

ফেরাউন সম্প্রদায় শিক্ষা গ্রহণ করলো না

কিন্তু অভাব-অভিযোগ, দুর্ভিক্ষ ও বিপদাপদে জর্জরিত হবার পরও তারা শিক্ষা গ্রহণ করলো না। আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে আনুগত্য প্রকাশ করলো না। তাই আল্লাহ পাক তাদের জন্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ ও নেয়ামতের দ্বার খুলে দিলেন। দুর্দিনে তারা যখন সুদিন দেখল তখন তারা বললো, এসব তো আমাদের প্রাপ্য, আমরাই এর যোগ্য। ক্ষণিকের জন্যেও তারা চিন্তা করলো না যে, এসব আল্লাহ পাকের নেয়ামত। আর এ নেয়ামত সমূহের জন্য তাদের আল্লাহ্ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ক্ষণিকের জন্যেও তারা আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার হতে রাজি হলোনা। আর নিজের যোগ্যতার কারণেই সব কিছু লাভ করছে বলে মনে করলো।

পক্ষান্তরে, যদি ঘটনাচক্রে এরই মধ্যে কোন বিপদাপদ দেখা দিত তখন তারা বলতো, এসব হয়েছে মূসা এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্য। অর্থাৎ ভাল কিছু হলে তারা মনে করতো তাদের গুণে হয়েছে আর মন্দ কিছু হলে তারা মনে করতো মূসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের কারণে হয়েছে।

اَلَاۤ اِنَّمَا طٰۤئِرُهُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ

অর্থাৎ তাদের জানা উচিত, তোমাদের দূর্ভাগ্য আল্লাহ্ পাকেরই হাতে আর তা মূসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের কারণে নয়; বরং তোমাদেরই কুফর, নাফরমানী, অকৃতজ্ঞতা এবং তোমাদের পাপাচারের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপই তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের আযাব আপতিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৮

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্য উপলব্ধি করেনা যে, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিপদাপদ তাদের অন্যায় আচরণের পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে শাস্তি হিসেবে এসেছে। আল্লাহ্ পাক সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। তোমাদের যাবতীয় কার্যবালী আল্লাহ্ পাকের নখদর্পণে। তোমাদের অন্যায়-অনাচারের কারণেই আল্লাহ্ পাক তোমাদের শাস্তি বিধান করেন। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের প্রিয় বন্দা। কাজেই তাঁর কারণে তোমাদের শাস্তি হয় না। আর তোমাদের প্রকৃত শাস্তি হবে আখেরাতে। তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এ সম্পর্কে অবগত নয়।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ

হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা এবং অলৌকিক নিদর্শন সমূহ দেখে তারা বলতো, তুমি যত মোজেযাই দেখাও না কেন এবং যত যাদুই কর-না কেন আমরা কিন্তু তোমার প্রতি ঈমান আনবনা। আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রহঃ) এবং মোহাম্মদ এবনে এসহাক (রহঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনল এবং ফেরাউন ও তার দলবল পরাজিত হয়ে চলে গেল, এত নিদর্শন থাকতেও তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনল না, তৌহীদে বিশ্বাস করলো না এবং তাদের জেদ চরমে উঠে গেল, তখন আল্লাহ্ পাক তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। নেমে আসল তাদের উপর দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। কিন্তু এরপরও তারা সৎ পথে ফিরে আসলো না, আল্লাহর নাফরমানীতেই লিপ্ত হল। কুফর শেরক এবং পাপাচারে মশগুল রইল। তখন হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ্! ফেরাউন তোমার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তারা সীমালজ্ঘন করেছে, তার সম্প্রদায় তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, এখন তাদেরকে তুমি তোমার আযাব দ্বারা পাকড়াও কর যেন তা তাদের জন্য হয় শাস্তি এবং আমার সম্প্রদায়ের জন্য যেন হয় উপদেশ এবং অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে হয় শিক্ষণীয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর এ বদদোয়া কবুল হয়েছিল। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ

কাফেরদের প্রতি বিভিন্ন আযাব

আমি প্রেরণ করলাম তাদের উপর বন্যা, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত। এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে, একের পর এক শাস্তি তাদের উপর আপতিত হত, প্রথমে বন্যা, ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি, উকুন এবং খাবার-দাবারে ব্যাঙের উপদ্রব এবং পানিগুলো রক্ত পরিণত হওয়া।

এবনে আবি হাতেম এবং সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি শাস্তি একমাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। আর এবনুল মুনজের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রত্যেক প্রকার শাস্তি শনিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এক সপ্তাহ ছিল। এরপর একমাসের জন্যে আযাব রহিত হতো। বর্ণিত আছে যে, যাদুকররা পরাজিত হওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ) তাদের মাঝে বিশ বছর অতিবাহিত করেন এবং কিছু দিন পর পর তাদের ঈমান আনয়নের জন্যে মোজেযা প্রদর্শন করতেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, যখন আল্লাহ পাক ফেরাউনের সম্প্রদায়কে ঝড়-তুফান এবং বন্যার শাস্তি দিলেন তখন অনবরত তাদের প্রতি বৃষ্টি হতে লাগলো। কিবতীদের ঘরগুলো পানিতে তলিয়ে গেল। তাদের বসার বা শোবার কোন স্থান ছিল না। ঘরের ভিতর তারা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হতো। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় ছিল এই, বনী ইসরাঈলদের বাড়ী-ঘর এবং ফেরাউন সম্প্রদায় কিবতীদের বাড়ী-ঘর পাশাপাশি থাকলেও বনী ইসরাঈলীদের বাড়ী-ঘর বন্যার আযাব থেকে সংরক্ষিত ছিল। পক্ষান্তরে, কিবতীদের বাড়ীতে পানি জমে থাকতো এবং তাদের জমিতেও পানি জমে থাকার কারণে তারা কৃষি কর্মে অক্ষম হত। এ অবস্থা এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার তথা এক সপ্তাহ অব্যাহত থাকত। হযরত মুজাহেদ (রহঃ) এবং আতা (রহঃ) বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে “তুফান” শব্দটি দ্বারা মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এবনে জরীর (রহঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) কথারও এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ওহাব (রহঃ) বলেছেন, ইয়ামনী ভাষায় “তুফান” বলা হয়ে প্লেগ রোগকে। আবু কোলাবা (রহঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে “তুফান” শব্দটি দ্বারা বসন্ত রোগকে বোঝানো হয়েছে। সর্বপ্রথম ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীদের মধ্যেই বসন্ত রোগের আযাব দেয়া হয়েছিল। এরপর এই রোগ পৃথিবীতে রয়ে গেল এবং বিভিন্ন সময় মহামারী রূপে দেখা দেয়।

হযরত মোকাতেল (রহঃ) বলেছেন, তুফান ছিল বন্যা। এই বন্যার পানি কিবতীদের বাড়ী-ঘরে এবং ক্ষেত-খামারে জমে থাকার কারণে তারা সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়। আবু জুবীয়ান হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তুফান ছিল আল্লাহর একটি হুকুম তথা আযাবের হুকুম। সেই আযাব এসেছিল ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীদের জন্যে।

আল্লাহর নাফরমানদের জীবন দুর্বিষহ

কিবতী সম্প্রদায়ের জীবন যখন দুর্বিষহ হল তখন তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো, এই বৃষ্টির বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। যদি এই পানির বিপদ দূর হয় তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার সাথে যেতে দেব। হযরত মূসা (আঃ) তখন দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ পাক বন্যার বিপদ থেকে নাজাত দিলেন এবং সে বছর তাদের জমিতে আল্লাহর রহমতে বিপুল পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হল। এত বিপুল পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হল যা ইতিপূর্বে কোনদিন হয়নি। দেশবাসী আনন্দিত হল। ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীরা বলতে লাগলো, এই বন্যাতো প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্যে নেয়ামত ছিল। হযরত মূসা (আঃ)-কে অমান্য করার কারণে বন্যা আযাব হিসেবে এসেছিল একথা আদৌ সত্য নয়। তারা এসব কথা বলতে লাগলো এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনল না। বেশ আনন্দ-উল্লাসেই তাদের সময় অতিবাহিত হতে লাগলো।

মাত্র একমাস পরই তাদের উপর আবার আযাব আসলো। আর সেই আযাব ছিল পঙ্গপালের, পঙ্গপাল ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগলো এবং কিবতীদের সকল ফল-ফসল কয়েকদিনের মধ্যেই খেয়ে সাবাড় করলো। ক্ষেত-খামারের ফসল বা বাগানের ফলই নয়; বরং কিবতীদের বাড়ী-ঘরের দরজা জানালা পর্যন্ত বিনষ্ট করে দিল। এ সময়ও পঙ্গপালের আযাব শুধু ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীদের জন্যেই এসেছিল। বনী ইসরাঈলরা ছিল পূর্ণ শান্তিতে। কিবতীরা হাহাকার করতে লাগলো এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট বিনীত হয়ে আরজী পেশ করলো, দয়া করে আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন এবং শপথ ব্যক্ত করলো, যদি আমরা এই পঙ্গপালের আযাব থেকে নাযাত লাভ করি তবে আমরা অবশ্যই আপনার প্রতি ঈমান আনবো।

তাদের আর্তনাদের কারণে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে পঙ্গপালের এ আযাব দূর করলেন। এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার পর্যন্ত এ অভিশপ্ত সম্প্রদায় পঙ্গপালের আযাব ভোগ করে। বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেকটি পঙ্গপালের বক্ষে লিপিবদ্ধ ছিল "আল্লাহর সৈন্য" আর একথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) শহর থেকে বের হয়ে এসে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তাঁর লাঠি দ্বারা ইঙ্গিত করেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপাল যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকেই উড়ে যায়। পঙ্গপালের বিদায়ের পর দেখা গেল কিছু পরিমাণ ফসল পঙ্গপালের হাত থেকে বেঁচে গেছে। কিবতীরা এ ফসলের সন্ধান পেয়ে খুব খুশি হল। তারা আনন্দিত হল এবং বললো যা রয়ে গেছে তা আমাদের জীবন ধারণের জন্যে যথেষ্ট হবে।

অতএব, আমরা আমাদের ধর্ম পরিবর্তন করবো না। আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মেই থাকবো। আর এভাবে তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো এবং তাদের বেঈমানী এবং পাপাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এভাবে তারা আরও একটি মাস অন্যায় অনাচারে লিপ্ত রইল। এরপর শুরু হল উকুন। য়াযীদ এবনে জুরাইন (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মূলতঃ এগুলো ছিল এক প্রকার পোকা যা তাদের গমগুলো খেয়ে ফেলতো। মুজাহেদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদা (রহঃ) এবং কালবী (রহঃ) বলেছেন, এগুলো ছিল ছোট ছোট পঙ্গপাল। এগুলোর কোন পাখা ছিলনা।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর হুকুম হল আইনুস শামস নামক স্থানে যাও। হযরত মূসা (আঃ) নিদৃষ্ট স্থানে গিয়ে একটি বালুর পাহাড় দেখলেন। তাঁর প্রতি হুকুম হল লাঠি দিয়ে আঘাত কর। তিনি তাই করলেন। তখন ঐ পাহাড়ের ভেতর থেকে অনেক পোকা বের হয়ে আসে যা কিবতীদের ফল ও ফসল খেয়ে ফেলে। ঐ পোকাগুলো তাদের পোষাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদেরকে দংশন করতো। খাবার গ্রহণের সময় খাবারে প্রবেশ করতো।

হযরত সাঈদ এবনে মোসায়্যেব (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আলোচ্য আয়াতে القُمَّل। শব্দটির অর্থ হল খাদ্য-দ্রব্যের পোকা যা তাদের জন্যে মহা বিপদের কারণ হয়। তাদের দেহে ঐ পোকা দংশন করার পর মনে হত, লোকটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে, এর ফলে তাদের মাথা এবং শরীরের চুলগুলো পড়ে যায় এবং কোন প্রকার বিশ্রাম বা নিদ্রা তাদের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিবতীরা তখন চিৎকার শুরু করে দিল এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট এই ফরিয়াদ নিয়ে হাযির হল, আমরা আমাদের অন্যায়ের জন্যে তওবা করছি। আপনি দয়া করে আপনার প্রতিপালকের নিকট এই দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

হযরত মূসা (আঃ) তাদের জন্যে দোয়া করেন। আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে তাদেরকে ঐ আযাব থেকে নাজাত দিলেন। তারা এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার পর্যন্ত এই আযাব ভোগ করলো। এরপর আল্লাহ্ পাক যখন তাদেরকে ঐ আযাব থেকে নাযাত দিলেন, তারা এক মাস কাল শান্তিতে অতিবাহিত করলো। কিন্তু ঐ শান্তিই তাদের জন্যে অশান্তির কারণ হল। কেননা, তারা বিপদমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী শুরু করে দিল। ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো। পুনরায় পাপাচারে লিপ্ত হল। হতভাগা কিবতীরা বলতে লাগলো, মূসা যে একজন যাদুকর একথার প্রমাণ ইতিপূর্বে যা পেয়েছিলাম, এবার তা সবচেয়ে বেশী পেয়েছি।

হযরত মূসা (আঃ) তখন পুনরায় বদদোয়া করলেন। এবার উকুন জাতীয় নয়; বরং এবার আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে ব্যাঙের আযাব প্রেরণ করলেন। তাদের বাড়ী-

-ঘর, পোষাক-পরিচ্ছদ, হাড়ি-পাতিল, খাবার পাত্র এক কথায় সর্বত্র শুধু ব্যাঙই ব্যাঙ দেখা গেল। কথা বলার সময় যখন তারা মুখ খুলতো তখন এক লাফে ব্যাঙ ঢুকে যেত, খাবার নষ্ট করে ফেলতো। তাদের উনুনের আগুন বন্ধ করে দিত। যখন তারা বিশ্রাম করতে যেত তখন অগণিত ব্যাঙ তাদের শরীরে লাফ দিত। যখন তারা খাবার খেতে বসতো তখন খাবারে ব্যাঙ এসে বসতো। যখন তারা আটা ছানতে বসতো তখন সেখানে অগণিত ব্যাঙ ঢুকে যেত। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, যখন তারা কোন খাবার খাওয়ার জন্যে মুখ খুলতো তখন খাবার ঢোকার পূর্বেই ব্যাঙ লাফ দিয়ে মুখে ঢুকে যেত। এভাবে হতভাগা কিবতী জাতি এক নতুন মহা বিপদের সম্মুখীন হল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ব্যাঙ পূর্বে স্থল ভাগের প্রাণী ছিল। আল্লাহ পাক তাদেরকে ফেরাউনের শাস্তির জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। তারা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশার্থে জ্বলন্ত হাড়ির অভ্যন্তরে লাফ দিয়ে পড়তো এবং জলন্ত উনুনে পড়তেও দ্বিধাবোধ করতো না। আল্লাহ পাক তাদের এ আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে পানির প্রাণীতে রূপান্তরিত করে দেন। এখন তারা আরামে পানিতে বাস করতে পারে।

ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কিবতীরা ব্যাঙের শাস্তির কারণে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে গেল। তাই হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট গিয়ে কাঁদতে লাগলো এবং পুনরায় তওবা করলো। হযরত মূসা (আঃ) তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এবং সাতদিন পর আল্লাহ পাক এ শাস্তি বন্ধ করলেন। এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার পর্যন্ত তাদের উপর এ শাস্তি অব্যাহত ছিল। এরপর এক মাস পর্যন্ত তারা শান্তিতে ছিল, কিন্তু এরপর কিবতীরা পুনরায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করল, আল্লাহ পাকের অবাধ্য হল, পাপাচারে লিপ্ত হল। তখন হযরত মূসা (আঃ) বদদোয়া করলেন, পরিণামে তাদের উপর রক্তের আযাব নাযিল হল, নীল দরিয়া রক্তের দরিয়ায় রূপান্তরিত হল, সকল নদী এবং কূপের পানি রক্তে পরিণত হল, কিবতীরা গিয়ে ফেরাউনের নিকট এ অভিযোগ করলে ফেরাউন বলল, মূসা তোমাদের প্রতি যাদু করেছে অর্থাৎ সে তোমাদেরকে নজরবন্দী করেছে, কিবতীরা বলল, যাদু কোথায়? আমরা স্বচক্ষে রক্ত দেখছি, অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কিবতীরা এবং বনী ইসরাঈলীরা একসঙ্গে পাশাপাশি বসে একই পাত্র থেকে পানি পান করত, যখন বনী ইসরাঈলরা করত তখন তা পানিই থাকত।

কিন্তু যখন কিবতীরা পানি পান করতে চাইত তখন তা রক্তে পরিণত হয়ে যেত। কিবতী স্ত্রীলোকেরা পিপাসায় কাতর হয়ে ইসরাঈলী স্ত্রীলোকদের নিকট একটু পানির জন্যে হাযির হত, ইসরাঈলী স্ত্রীলোক কিবতী স্ত্রীলোকের পাত্রে পানি ঢেলে দিত, কিন্তু কিবতী স্ত্রীলোকদের পাত্রে পানি পৌঁছা মাত্র রক্তে পরিণত হত। অবশেষে

কিবতী স্ত্রীলোকরা বলত, তুমি একটু পানি নিয়ে আমার মুখে কুলি করে দাও। কিবতী স্ত্রীলোকের অনুরোধে তাই করা হতো। কিন্তু ভাগ্যের লিখন কে করবে খন্ডন, আল্লাহ পাক যখন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তখন পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনা, তাই যখন ইসরাঈলী স্ত্রীলোক কিবতী স্ত্রীলোকের মুখে কুলি করে দিত, ঐ কুলির পানিটুকু রক্তে পরিণত হত।

ফেরাউন পিপাসায় কাতর হয়ে গাছের পাতা চিবাতে থাকত। কিন্তু পাতার রসগুলো লবণাক্ত হয়ে যেত।

অবশেষে তারা নিতান্ত অসহায় এবং নিরূপায় হয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট হাযির হল এবং আরজী পেশ করল, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট রক্তের এ আযাব দূরীভূত করার জন্যে দোয়া করুন, এ বিপদ দূরীভূত হলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনব। কিন্তু যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক ঐ বিপদ দূর করলেন, তখন তারা পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করলো, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ

তবুও তারা অহংকার করল, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলনা, আর তারা ছিল পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা আল্লাহর এবাদতের ব্যাপারে অহংকার করত এবং তারা ছিল পাপাচারে অভ্যস্ত। তিনি আরো লিখেছেনঃ ফেরাউনের সম্প্রদায়কে বিভিন্ন সময় যে শাস্তি দেয়া হয়েছে, বনী ইসরাঈল জাতি ছিল তা থেকে মুক্ত, বিভিন্ন সময়ের এ শাস্তিগুলো ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা। আর পাশাপাশি অবস্থান করা সত্ত্বেও কিবতীদের প্রতি শাস্তি আপতিত হওয়া এবং বনী ইসরাঈলীদের এ শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়া একটি স্বতন্ত্র মোজেযা।[২]

وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ

আল্লামা শওকানী (রঃ) এ বাক্যটির অর্থ সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হল তারা এত পাপিষ্ঠ যে, কোন দিন তারা হেদায়েত গ্রহণ করবেনা। কেননা, পাপাচার তাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে তাই বাতিল থেকে তথা কুফর, নাফরমানী এবং অবাধ্যতা থেকে তারা কোনদিন আত্মরক্ষা করবে না।[৩]

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭২-৩৭৯
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২১৮
৩। তফসীরে ফতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৮

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ
اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ
فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَاَوْرَثْنَا
الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ
بِمَا صَبَرُوْا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا
يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

তরজমা

(১৩৪) আর যখন তাদের উপর কোন আযাব নিপতিত হত তখন তারা বলতো, হে মূসা! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যেভাবে বলে রেখেছেন সেভাবে আমাদের জন্যে দোয়া কর, যদি আমাদের উপর থেকে এ আযাব দূরীভূত করে দাও তবে আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনবো। আর বনী ইসরাঈলকে তোমার সঙ্গে যেতে দেব।

(১৩৫) এরপর যখন আমি তাদের উপর থেকে তাদের পক্ষে এক অবশ্য পূরণীয় সময় পর্যন্ত আযাব দূরীভূত করে দিলাম তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে থাকে।

(১৩৬) পরিণামে আমি তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করি এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করি। কেননা, তারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করতো এবং আমার নিদর্শন সমূহকে উপেক্ষা করতো।

(১৩৭) আর যারা দুর্বল বিবেচিত হত আমি তাদেরকেই সেই ভূখন্ডের পূর্ব পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করে দেই, তাতে আমি বরকত দান করি। বনী ইসরাঈলের সঙ্গে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। কেননা, তারা সবর করেছিলো আর ফেরাউন এবং তার জাতি যা কিছু তৈরী করেছিলো এবং যে সব আকাশচুম্বি মহল নির্মাণ করেছিলো আমি সবই ধ্বংস করে দিই।

তফসীরুল কোরআন

আর যখন তাদের উপর আযাব আপতিত হতো তখন তারা বলতো, হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট দোয়া কর যার অঙ্গীকার সে তোমার সাথে করেছে। যদি আমাদের উপর থেকে এ বিপদ দূরীভূত হয় তবে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে যেতে দেবে।

الرجز। শব্দটির অর্থ সম্পর্কে তফসীরকারদের একাধিক অভিমত রয়েছে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হল সেই পাঁচটি আযাব যার উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে রয়েছে।

হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল শুধু প্লেগ রোগ। এ রোগ যখন ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন একদিনেই সত্তর হাজার লোক মারা যায়। তাদেরকে দাফন করাও সম্ভব হয়নি। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে বিভিন্ন সময় নতুন নতুন আযাব দিয়েছেন যাতে করে তারা সতর্ক হয় এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার দলবলকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করতেন যে, তোমাদের উপর এবার অমুক আযাব আসছে। যখন আযাব আসতো এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হতো তখন তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আযাব দূরীভূত করার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতো। হযরত মূসা (আঃ) তাদের করুণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতেন। আল্লাহ পাক তাদের থেকে আযাব দূর করে দিতেন। তখন তারা পুনরায় আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হত, ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো।[১]

এ বিষয়ের উল্লেখ করে ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন যে, কিবতীরা সাধারণত হযরত মূসা (আঃ)-কে রসূল মানতো না, তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করতো। কিন্তু যখন বিপদগ্রস্ত হত তখন তাঁর নিকট এসে কান্নাকাটি করতো এবং এ আরজী পেশ করতো যে, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের উপর থেকে এ বিপদ দূর করে দেন।

এতে একথা প্রমাণ হয় যে, তারা বিপদের সময় একথাই সত্য মনে করে নিত যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর সত্য নবী। আর তারা একথাও সত্য মনে করতো যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন কিন্তু যখন তাদের বিপদ কেটে যেত তখন তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই ফিরে যেত।

হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, رجز, শব্দটি এ আয়াতে প্লেগ রোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এ সম্পর্কে বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফে হাদীস

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩১৯

সংকলিত হয়েছে। হযরত উসামা এবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্লেগ একটি আযাব। আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি এবং তোমাদের পূর্বের অন্যান্য জাতির প্রতি এ আযাব প্রেরণ করেছেন। এজন্যে যদি কোন স্থানে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তবে তোমরা সেখানে যেয়োনা। আর যেখানে তোমরা থাক সেখানেই যদি প্লেগ রোগ দেখা দেয় তবে সেখানে থেকে পলায়ন করোনা। ইমাম আহমদ এবং ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্লেগ আল্লাহর একটি আযাব, তিনি যার সম্পর্কে ইচ্ছা, তার নিকট এ আযাব প্রেরণ করেন। যদি কোন এলাকায় প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দেয় তবে কোন মুসলমান সওয়াবের আশায় সবর করে সেখানে থেকে যায় এবং একথায় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ পাক তকদীরে যা লিখেছেন তাই হবে। এরপর যদি সে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে সে শহীদের সওয়াব পাবে।

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ

অর্থাৎ সেই ওয়াদা মোতাবেক যা আল্লাহ পাক আপনার সঙ্গে করেছেন যে, যদি আমরা ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করি তবে আল্লাহ পাক আমাদের থেকে আযাব দূরীভূত করবেন। তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য বাক্যটির অর্থ নবুওয়্যত। কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য বাক্যটি সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হল হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে যে দোয়া করবেন তা কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি, যাহোক বাক্যটির মর্মবাণী এই, আপনাকে নবুওয়্যত দানের কারণে অথবা আপনার দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করবেন– এ নিশ্চয়তা বিধানের কারণে আমরা আরজী পেশ করি যে, আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ পাক যেন আমাদের বিপদ দূর করে দেন।

অথবা আপনার নবুওয়্যতের কারণেই আমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করুন।

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ

অর্থাৎ আমরা এ ব্যাপারে শপথ করছি, যদি আপনি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করে আমাদের আযাব দূর করিয়ে দেন তবে আমরা অবশ্যই ঈমান আনব।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ

আর বনী ইসরাঈল জাতিকে আপনার সঙ্গে সিরিয়া যেতে দেব।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৩-৭৪

যখন মূসা (আঃ) -এর দোয়ার কারণে আমি তাদের বিপদ দূর করে দিলাম এক নিদৃষ্ট কালের জন্যে আর সেই নিদৃষ্ট কাল হল তাদের সলিল সমাধি হওয়ার সময়, অথবা তাদের মৃত্যুর জন্যে যে সময় নিদৃষ্ট রয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এ নির্দিষ্ট সময় হল সে সময় যা তারা ঈমান আনয়নের জন্যে ঠিক করেছিল, এরপর তারা পুনরায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করল, অবশেষে তাদের উপর নতুন করে আল্লাহর গজব দেখা দেয়, কোন রোগ ব্যতীতই গভীর রাতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের লোকদের প্রথম পুত্র হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারা মৃতদের শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এ সময় হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈল জাতিকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে পড়েন। ফেরাউন খবর পেয়ে তার সৈন্যদেরকে নিয়ে বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ

এরপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা, তারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করত এবং আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করার কারণে তাদের শাস্তি হয়েছিল।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন যে, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কোন কোন সময় পাপাচারের পরিণামে দুনিয়াতেই শাস্তি হয়। আলোচ্য আয়াতে فَانْتَقَمْنَا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধাণিক অর্থ হল আযাব দ্বারা নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া, যেমন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাই করা হয়েছে।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে সু-সংবাদ দিয়েছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ

(অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন, তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন) আর যেহেতু এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ লোকদের মূলোৎপাটনের বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কিভাবে আল্লাহ পাক মোমেনদের নেয়ামত দান করেছেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ

অর্থাৎ যারা ছিল একদিন দুর্বল তাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করেছি, সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ দেশের উত্তরাধিকারী করেছি, তাদেরকে দান করেছি দুনিয়ার সম্পদ এবং ক্ষমতা।

مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا

যে জমীনের কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে তা কোন্ জমীন? এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ), কাতাদা (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এর দ্বারা সিরিয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, সিরিয়ার বরকত এবং সম্পদ, মনোরম দৃশ্য সুপরিচিত।

আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে দুর্বল বলা হয়েছে তারা হল বনী ইসরাঈল জাতি যারা যুগ যুগ ধরে ফেরাউনের গোলামী করেছে, কিন্তু যেহেতু তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতে সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। এর দ্বারা হযরত দাউদ (আঃ) এবং সোলায়মান (আঃ)-এর যুগের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, আলোচ্য আয়াতে যে জমিনের কথা উল্লেখিত হয়েছে তা হল মিশর কেননা, এই মিশরেই তারা ফেরাউনের গোলামী করেছে, নির্যাতীত, উৎপীড়িত হয়েছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে ফেরাউন হত্যা করত এবং তাদের স্ত্রীলোকদের জীবিত রাখত তাই আল্লাহ পাক এই দুর্বল সম্প্রদায়কেই মিশরের ক্ষমতা দান করেছেন।

পবিত্র কোরআনের সূরায়ে দোখানে ফেরাউনের পতনের কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۝.........

"কত বাগ-বাগিচা, কত শষ্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ জমীন এবং কত উত্তম ও মনোরম স্থান তারা ফেলে চলে গেছে, কত নেয়ামত তারা ভোগ করত তা তারা রেখে গেছে। এভাবে আমি ঐ সমস্ত নেয়ামতের উত্তরাধিকারী করেছি অন্যদেরকে, তাদের জন্যে কাঁদেনি আসমান এবং জমীন"।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا ط

"আর বনী ইসরাঈলের সবরের কারণে তাদের ব্যাপারে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ হল", কেননা জালেম, শক্তিধর ফেরাউনকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে হীনবল বনী ইসরাঈলকে আমি রাজত্ব দান করলাম। যেমন সূরা কাসাসে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ..........

"আমি চাই যারা দুর্বল, তাদের প্রতি এহসান করি এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদের প্রদান করি এবং তাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করি"।

বনী ইসরাঈলের ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই পূর্ণ হল।

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

আর ফেরাউন এবং তার জাতি যা কিছু তৈরী করেছিল এবং যে সব আকাশচুম্বি ইমারত নির্মাণ করেছিল তা আমি ধ্বংস করে দেই। কেননা, বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং চরম নির্যাতন-উৎপীড়ন সত্ত্বেও হযরত মূসা (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক সবর অবলম্বন করেছিল এবং আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ
يَعْكُفُونَ عَلٰىٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا يٰمُوسَى اجْعَلْ لَّنَآ إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ
اٰلِهَةٌ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبٰطِلٌ
مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِيكُمْ إِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ
عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ
الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

তরজমা

(১৩৮) আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে দিলাম। এরপর তারা এমন এক জাতির নিকট উপস্থিত হয় যারা প্রতিমা পূজায় রত ছিল।

বনী-ইসরাঈলরা বলল, তাদের যেমন দেবতা রয়েছে আমাদের পূজার জন্যেও তেমনি একটি দেবতা তৈরী করে দাও। মূসা বললেন, তোমরা নিশ্চয় একটি মূর্খ সম্প্রদায়।

(১৩৯) এসব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তা বিনাশ হবে এবং তারা যা করছে তা সম্পূর্ণ বাতিল।

(১৪০) মূসা বললেন, আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য খুঁজব? অথচ তিনিই তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

(১৪১) আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের দলবল থেকে নাজাত দিলাম যারা তোমাদেরকে অত্যন্ত মর্মান্তিক শাস্তি দিত। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে তারা হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে তারা জীবিত রাখত। এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহা পরীক্ষা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ পাক যে নেয়ামত দান করেছিলেন তার উল্লেখ ছিল। যেমন বনী ইসরাঈলের দুশমন ফেরাউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করা এবং সেই ধ্বংসের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখা, ফেরাউনের গোলামী থেকে নাজাত পাওয়া, অবশেষে হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি দ্বারা লোহিত সাগরে আঘাত করলে আল্লাহ পাকের দান স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে সাগরে পথ তৈরী হওয়া এবং নিরাপদে বনী ইসরাঈলের সাগর পার হওয়া। আর এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের কিছু মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার কথা রয়েছে। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করার পর যখন তারা এক সম্প্রদায়কে প্রতিমা পূজা করতে দেখল, বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলল, এরা যেমন মূর্তিপূজা করে আমাদের জন্যেও তেমনি ব্যবস্থা করুন।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ যাদেরকে দেবতার পূজা করতে বনী ইসরাঈলরা দেখেছিল তারা ছিল লাখাম গোত্রের লোক।

আল্লামা বগভী ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ মত প্রকাশ করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল আমালেকা গোত্রের লোক।

এবনে আবি হাতেম এবং আবুশ্ শেখ এবনে এমরানের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এরা ছিল লাখাম ও যোজাম গোত্রের লোক।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ কোন কোন তফসীরকারের মতে, তারা ছিল কেনানী গোত্রের লোক।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ তারা যে মূর্তিটির পূজা করছিল তা ছিল গাভীর মূর্তি।

মূলতঃ যুগ যুগ ধরে গোলামীর গ্লানির কারণে, জীবনের সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে, পৌত্তলিক পরিবেশের প্রভাবে বনী ইসরাঈল এমন মূর্খতা প্রসূত কথা বলে।

হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ জাহেল বা মূর্খ লোকদের মন সর্বদাই বস্তু প্রবণ। যিনি নিরাকার তাঁর বন্দেগী করে তাদের মন ভরেনা, তাই তাদের মনে প্রতিমা পূজার ইচ্ছা হয় এজন্যে হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেছেনঃ তোমরা নিশ্চয় এক মূর্খ সম্প্রদায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক যখন তোমাদেরকে জালেম পৌত্তলিকদের অকথ্য জুলুম অত্যাচার থেকে নাজাত দিয়েছেন তখন তোমরা পৌত্তলিকতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছো? এর চেয়ে বড় মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে!

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের এ অন্যায় আবদারের কারণে বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা মূর্খতাবশতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য লাভের আবদার করছো, স্বহস্তে তৈরী প্রতিমার সম্মুখে মাথা নত করার ইচ্ছা করছো, অথচ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এমন নেয়ামত দান করেছেন যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করেননি। তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত অথচ তোমরা তাঁর অকৃতজ্ঞ হয়েছ। হযরত মূসা (আঃ)-এর কথায় এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহ পাক যা দান করেছেন তার তোমরা যোগ্য ছিলেনা, আল্লাহ পাক শুধু দয়া করেই তোমাদেরকে তাঁর দানে ধন্য করেছেন। অথচ তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা করতে প্রয়াসী হয়েছ, এর চেয়ে নির্জলা মূর্খতা আর কী হতে পারে!

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত ওয়াকেদ সোইলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একবার আমরা হোনায়েনের দিকে সফরকালে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম, পথে 'সাদরাহ' দেখতে গেলাম, এটি ছিল একটি কুলবৃক্ষ, জাহেলিয়াতের যুগে কাফেররা ঐ বৃক্ষে তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করত। আমরা আরজ করলাম, বর্তমানেও আমাদেরকে এমন কাজ করার অনুমতি দিন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহু আকবার। কথাটি এমনই যেমন বনী ইসরাঈলরা মূসা (আঃ)-কে বলেছিল যে, "তাদের যেমন দেবতা রয়েছে, আমাদের জন্যও তেমনি একটি দেবতা তৈরী করে দাও"।

ইমাম রাজী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ বনী ইসরাঈলরা যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট এমন অন্যায় আবদার করল তখন তিনি তাদের কথার জবাবে কয়েকটি কথা বললেন ঃ

(১) তিনি বললেন ঃ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ

(নিশ্চয় তোমরা মূর্খ সম্প্রদায়)

(২) اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ

(নিশ্চয় এটি হল তোমাদের ধ্বংসের কারণ)

(৩) وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(অর্থাৎ) তোমরা যা করছো তা বাতিল, এই কাজ দুনিয়া আখেরাত কোথাও তোমাদের জন্যে উপকারী হবে না।)

(৪) যা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে ঃ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا

এতে একদিকে হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে তাদের উদ্দেশ্যে এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, তোমরা যা চেয়েছ তা আদৌ চাওয়া পাওয়ার বস্তু নয়। উপাস্য তৈরী করার বিষয় নয়; উপাস্য বা মা'বুদ এক আল্লাহ পাকই যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, মানুষের জীবন, জীবনের যথাসর্বস্ব, এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই দান।

وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

'তিনিই তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন'।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এ বাক্যটির দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(১) আল্লাহ পাক সে যুগের বিশ্ববাসীর উপর তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

(২) অথবা এর অর্থ হল তাদেরকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে দান করা হয়নি। যদিও অন্যদেরকে তাদের চেয়ে অনেক বেশী গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং তাতে দক্ষতা অর্জন করেছে আর অন্যরা ঐ বিষয়টি ব্যতীত অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে, যেহেতু ঐ একটি বিষয়ে সে পারদর্শী, তাই তার ফজিলত বিবেচিত হয় কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, যে অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে তার ফজিলতই সর্বাধিক।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ.........

আর স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন আল্লাহ্ পাক তোমাদের ফেরাউন ও তার দলবলের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন, তারা তোমাদের প্রতি চরম নির্যাতন করতো, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো, আর (বেগার খাটাবার জন্যে) তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখতো। এতে তোমাদের জন্যে ছিল এক বিরাট পরীক্ষা।

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا
بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ
هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾
وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ
اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ
مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

তরজমা

(১৪২) আর আমি মূসার জন্য ত্রিশ রাত নির্ধারিত করি এবং আরও দশ রাত দ্বারা তা পূর্ণ করি, ফলে তোমার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে পূর্ণ হয়। আর সে তার ভ্রাতা হারুনকে বললো, আমার অনুপস্থিতকালে আমার জাতির মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসেবে থাকবে আর তাদের সংশোধন করতে থাকবে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অনুসারী হবে না।

(১৪৩) এবং মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বললো, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার দীদার নসীব কর, আমি তোমার দীদার লাভে ধন্য হতে চাই"।

তিনি এরশাদ করলেনঃ "তুমি আমাকে কখনও দেখতে পাবেনা"। তবে ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা স্বস্থানে টিকে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে, যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের উপর তাজাল্লী ফেললেন (জ্যোতিঃ বিকীরণ করলেন) তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করলো এবং মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন, পরে যখন হুঁশ ফিরে পান তখন তিনি বললেনঃ পবিত্র তুমি! তোমার নিকট তওবা করছি এবং মোমেনদের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। এদেশের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব তোমাদের হাতেই আসবে, তখন আমি তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একখানি আসমানী কিতাব এনে দেব। যাতে তোমাদের জন্যে জীবন বিধান থাকবে। যখন আল্লাহ পাক ফেরাউনকে ধ্বংস করে দিলেন, বনী ইসরাঈলীরা সর্ব প্রকার দুর্গতি ও জুলুম অত্যাচার থেকে নাজাত পেল তখন বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-কে বললো, এখন আমাদের জন্যে কোন আসমানী কিতাব নিয়ে আসুন, যাতে করে আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে ঐ কিতাবের উপর আমল করতে পারি।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে এ সম্পর্কে আরজী পেশ করলেন। আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-কে এ নির্দেশ দিলেন কমপক্ষে ত্রিশ রাত, ঊর্দ্ধে চল্লিশ রাত পর্যন্ত তূর পাহাড়ে এ'তেকাফ কর, রোজা রাখ, আমি তোমাকে তৌরাত দান করবো।

এবনে আবি হাতেম আবুল আলীয়ার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এভাবে হযরত মূসা (আঃ)-কে চল্লিশ দিন রোজা রাখতে হয়। জিলক্বিদ মাস এবং জিলহজ্জের ১০ দিন।

আল্লামা সয়ুতি (রহঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন তূর পাহাড়ে এক মাস যাবত এ'তেকাফ ও রোজা রাখার পর তোমার সাথে কথা বলবো।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, বনী ইসরাঈল যখন মিশরে ছিল তখন মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, আল্লাহ পাক যখন দুশমনকে পরাজিত করে দেবেন তখন তিনি তোমাদেরকে একটি কিতাব দান করবেন। যাতে সকল বিধি-নিষেধের বিবরণ থাকবে। ফেরাউনকে ধ্বংস করার পর আসমানী কিতাব প্রদানের আবেদন করলে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে কুহ-ই-তূরে হাযির হয়ে ত্রিশ রাত এ'তেকাফ করার এবং রোজা পালনের আদেশ দিলেন। একাধারে

ত্রিশ দিন রোজা রাখার পর হযরত মূসা (আঃ) উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর মুখে এক প্রকার গন্ধ হয়েছে। তাই তিনি মেসওয়াক করলেন। তখন ফেরেশতারা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন, আপনার মুখ থেকে কস্তুরীর সুগন্ধ আসছিলো কিন্তু আপনি মেসওয়াক ব্যবহার করে তা নষ্ট করে দিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ পাক জিলহজ্জ্ব মাসের দশদিন রোজা রাখার আদেশ দিলেন এবং এরশাদ করলেন, তোমার জানা নেই যে, রোজাদারের মুখের গন্ধ আমার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়েও অধিক প্রিয়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রথমে ত্রিশ দিন এবং পরে আরো দশ দিন বৃদ্ধি করে চল্লিশ দিন পূর্ণ করার হেকমত কি? এর একটা জবাব একটু আগেই বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ পর্যায়ে দু'টি সংখ্যা উল্লেখ করার কারণ হল, এ'তেকাফ যদি নিখুঁত এবং ক্রটি-বিচ্যুতিহীন হয় তবে ত্রিশ দিনই যথেষ্ট। কিন্তু যদি এমন না হয় তবে আরো দশদিন এ'তেকাফ করে সেই ক্রটি সংশোধন করতে হবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ত্রিশ রজনী ছিল অবশ্য কর্তব্য এবং অবশিষ্ট দশ দিন ছিল ইচ্ছাধীন। অথবা প্রকৃত মেয়াদ ত্রিশ দিনই এরপর যে দশদিনের কথা বলা হয়েছে তা পরিশিষ্ট বা উপসংহার স্বরূপ। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ত্রিশ রোজা রাখার পর যেহেতু মূসা (আঃ) মেসওয়াক করেছিলেন আর এ কাজটি ফেরেশতাদের অপ্রিয় হয়েছিল। এ ক্রটির প্রতিকার স্বরূপই আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ ক্রমে হযরত মূসা (আঃ)-কে আরও দশদিন রোজা রাখতে হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়।

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۞

হযরত মূসা (আঃ) তূর পর্বতে যাওয়ার সময় তাঁর ভাই হারুন (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং তাঁকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন কেননা, বনী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা কম ছিলনা। তাদের বক্র স্বভাব, পথভ্রষ্টতা, অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন-প্রবণতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অবগত। তাই হযরত মূসা (আঃ) তাঁর ভ্রাতা হারুন (আঃ)-কে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করলাম। তুমি তাদের সংশোধন করতে থাকবে, কখনো দুষ্টলোকদের অনুসারী হবে না, তাদের মত ও পথ গ্রহণ করবেনা, তাদেরকে সঠিক পথে রাখার চেষ্টা করে যাবে, যদি তারা আমার পরে কোন অশান্তি সৃষ্টি করে তবে কোন অবস্থাতেই তাদের কথা

মানবেনা; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবে।

হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে তূর পাহাড়ে এ'তেকাফ করতে যান তখন হযরত হারুন (আঃ)-কে এসব কথা বলেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের اَصْلِحْ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল বনী ইসরাঈলের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করবে।

وَلَا تَتَّبِعْ

অর্থাৎ যারা অশান্তি সৃষ্টিকারী, যারা পাপীষ্ঠ তাদের অনুসারী হয়োনা, তাদের সাহায্য করোনা।[১]

প্রয়োজনে প্রতিনিধি নির্বাচন করা

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেনঃ পবিত্র কোরআনের এ আয়াত দ্বারা একথার শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন দায়িত্ববান ব্যক্তি যখন কোন প্রয়োজনে কোথাও গমন করে তবে তার কর্তব্য হল তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা। কেননা, হযরত মূসা (আঃ) হযরত হারুন (আঃ)-কে তাঁর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈল জাতির দেখা-শোনা ও সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যখন দেশের বাইরে সফর করেন তখন তাদেরও কর্তব্য হল কোন ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করে যাওয়া। আর এ নিয়মই ছিল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। তিনি যখনই মদীনা মোনাওয়্যারা থেকে বাইরে তশরীফ নিয়ে যেতেন তখনই কাউকে তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচন করে যেতেন যার উপর যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হত।

একবার তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে এবং অন্য একবার হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাকতুম (রাঃ)-কে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, এছাড়া বিভিন্ন সময় অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকেও এ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

হযরত হারুন (আঃ)-কে হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণের পর যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার বিবরণও আলোচ্য আয়াতে রয়েছে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাকে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তার কাজকে সহজ করার লক্ষ্যে তাকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দেয়াও জরুরী।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৮

হযরত মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারুন (আঃ)-কে দায়িত্ব অর্পণের পর যে পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন তন্মধ্যে প্রথম কথা হল أَصْلِحْ অর্থাৎ সংশোধন কর কিন্তু কাকে সংশোধন করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজেকেও সংশোধন কর এবং বনী ইসরাঈলেরও সংশোধন কর। যখন তারা কোন প্রকার অন্যায় আচরণে লিপ্ত হয় তখন তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা কর এবং কোন অবস্থাতেই অন্যায় কাজে তাদের সহায়ক হয়োনা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত হারুন (আঃ) স্বয়ং নবী ছিলেন তাই কোন অন্যায় কাজে তিনি সাহায্য করবেন একথা অচিন্তনীয়। তাই তফসীরকারগণ আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর অর্থ হল এমন কোন কাজ করোনা যার দ্বারা অন্যায় আচরণকারীদের কোন প্রকার সাহায্য হয়।

বণী ইসরাঈলের পথভ্রষ্টতা

এসব দিক-নির্দেশনা দিয়ে হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে গমন করলেন, কিন্তু বনী ইসরাঈল এরই মধ্যে পথভ্রষ্ট হল, তারা স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎসের পূজা শুরু করে দিল, বনী ইসরাঈলের মধ্যে সামেরী নামক এক ব্যক্তি ছিল, সে এ প্রতিমাটি তৈরী করে। যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল জাতি মিশর থেকে বের হয়ে লোহিত সাগরের দিকে অগ্রসর হয় তখন পথ-প্রদর্শক হিসেবে ছিলেন হযরত জীব্রাঈল (আঃ)। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) যে অশ্বে আরোহণ করেছিলেন, তার পা যেখানে পড়ত সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ঘাস উঠে যেত। সামেরী নামক এ দুবৃত্ত সেখান থেকে একটু মাটি নিয়ে এসেছিল, ঐ মৃত্তিকা খন্ডটি সে স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎসের মূর্তির মুখে যখন দেয় তখন তা জীবন্ত বাছুরের ন্যায় চিৎকার দিতে থাকে, পথভ্রষ্ট বনী ইসরাঈলরা এ বাছুরটিরই পূজা আরম্ভ করে।

হযরত হারুন (আঃ) বনী ইসরাঈলকে এ জঘন্য অন্যায় থেকে বিরত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা বিপথে চলেছ, পথভ্রষ্ট হয়েছে, তোমাদের ভ্রান্ত পথ পরিহার কর, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই তোমাদের একমাত্র প্রতিপালক। অতএব, শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, তাঁর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ কর, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِیْ وَاَطِیْعُوْٓا اَمْرِیْ

হে আমার জাতি! তোমরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছ, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক দয়াময় আল্লাহ পাকই, অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমার কথা মেনে চল তথা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِیْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ

মধুর আলাপের পরিবেশ

হযরত মূসা (আঃ) যখন তূর পাহাড়ে আসলেন এবং চল্লিশ দিন যাবত রোজাব্রত অবস্থায় এ'তেকাফ করলেন তখন আল্লাহ্ পাক দয়া করে মূসা (আঃ)-কে তাঁর মধুর আলাপে ধন্য করেন। এটি ছিল দ্বিতীয় বার আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে মূসা (আঃ)-এর কথা।

প্রথমবার নবুওয়্যত প্রদানের সময় কথা হয়েছিল। আর এবার তৌরাত প্রদানের সময় পুনরায় কথা হল। তবে কথা পর্দার অন্তরাল থেকে হল। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) পবিত্রতা অর্জন করে পবিত্র পোশাক পরিধান করে আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা মোতাবেক প্রস্তুত হলেন। আল্লাহ্ পাক সাত মাইল জায়গা অন্ধকার করে দিলেন। শয়তানদেরকে এ এলাকা থেকে বের করে দিলেন। এমনকি মাটিতে যে পোকা মাকড় থাকে তাও দূর করে দিলেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে কেরামুন কাতিবীন নামে যে দু'জন ফেরেশতা ছিল, তাদেরকেও সরিয়ে দিলেন। আসমান পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকাকে পরিচ্ছন্ন করলেন। হযরত মূসা (আঃ) তখন ফেরেশতাদেরকে দন্ডায়মান অবস্থায় এবং মহান আরশকে দেখার সুযোগ পেলেন। তখন আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর মধুর আলাপে ধন্য হওয়ার সুযোগ দিলেন। যাহোক হযরত মূসা (আঃ) শ্রবণ করলেন অথচ হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে জীব্রাঈল (আঃ) ছিলেন, তিনি শ্রবণ করলেন না। এমনকি হযরত মূসা (আঃ) কলম ব্যবহৃত হওয়ার শব্দও শ্রবণ করলেন।[১]

মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের মধুর কালাম কিভাবে শ্রবণ করলেন–

ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) সবদিক থেকে আল্লাহ পাকের বাণী শ্রবণ করছিলেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল তিনি কোন বিশেষ দিক থেকে কথা শ্রবণ করছিলেন না।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বাণী কোন বিশেষ দিকের মুখাপেক্ষী নয়, বরং সকল দিকের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। হযরত মূসা (আঃ) যেদিকে মুখ করতেন সেদিক থেকেই কালামে এলাহী শ্রবণ করতেন। এভাবে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী শ্রবণ করে ধন্য হন।

قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ط

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৮

আল্লাহ পাকের দীদার লাভের আরজী

এরপর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের পবিত্র দীদার লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর প্রেম তীব্রতর হয়ে উঠলো। তাই তিনি বিনীত ভাবে এ আরজী পেশ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে তোমার দীদার নসীব কর, আমাকে তোমার দর্শন দাও, আমি তোমার দীদার লাভ করে ধন্য হতে চাই।

قَالَ لَنْ تَرٰنِىْ

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আমার অপরূপ রূপ দেখার যোগ্যতা তোমার মধ্যে নেই। তাই তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। আমার জ্যোতি তোমার জন্যে সহনীয় হবে না। তাই তোমার পক্ষে আমাকে দেখা সম্ভব হবে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিলো, আখেরাতে আল্লাহর দীদার হবে একথার ভিত্তিতেই তিনি দুনিয়াতে দীদার লাভের জন্যে ব্যাকুল হলেন। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলো لن ترٰنى অর্থাৎ আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, তুমি কোন অবস্থাতেই আমাকে দেখতে পারবে না, শুধু তুমি কেন, দুনিয়ার কোন মানুষই আমাকে দেখতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার দিকে তাকাবে সে মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার মধুর কালাম শ্রবণ করার কারণেই তোমার দীদার লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়েছি। যদি একবার অন্ততঃ তোমাকে দেখতে পাই এবং পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হই তবে তা তোমার দীদার লাভ না করে জীবিত থাকার চেয়ে আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।

আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক বলেছেন لن ترٰنى (অর্থাৎ তুমি আমাকে দেখতে পারবেনা।) لا اُرٰى (অর্থাৎ আমাকে দেখা যায় না) বলেন নাই। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের দীদার হাসিল করা অসম্ভব নয়। যদিও পৃথিবীতে কেউ তাঁকে দেখতে পারবে না।

وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰنِىْ ج

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন যে, হে মূসা! তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু যদি তোমার মন না মানে তবে ঐ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখ, তার উপর আমার তাজাল্লী ফেলবো তথা জ্যোতি বিকীরণ করবো। যদি ঐ পাহাড়টি আমার জ্যোতি সহ্য করতে পারে, আমার তাজাল্লী সত্ত্বেও পাহাড়টি টিকে থাকতে পারে তবে

তোমার পক্ষেও আমাকে দেখা সম্ভব হবে। কিন্তু যদি পাহাড়ের ন্যায় সুদৃঢ় সৃষ্টি তা সইতে না পারে, তবে দুর্বল মানুষের পক্ষে কোনদিনও তা সহ্য করা সম্ভব হবে না। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের দীদার যুক্তির দিক থেকে অসম্ভব না হলেও কার্যত তা অবাস্তব। কেননা যদি তা সম্পূর্ণ অসম্ভব হতো, তবে আল্লাহর নবী তার জন্যে দরখাস্ত করতেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন হতে পারে যে, মূসা (আঃ) কি এ বিষয়ে ওয়াকেফহাল ছিলেন না যে, আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভব হবে কি-না যে কারণে তিনি এমন আরজী পেশ করেছেন।

এর জবাব হল এই, لَنْ تَرٰنِىْ শব্দ দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, হযরত মূসা (আঃ) এ বিষয়ে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। আর এতে কোন ক্ষতিও নেই। কেননা, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রের নাজাতের জন্যে দোয়া করেছিলেন। অথচ তিনি জানতেন না তাঁর পুত্রকে রক্ষা করা হবে কি-না। এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার মাগফেরাতের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে মুশরেককে মাফ করা হবে না। এমনকি স্বয়ং আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের মাগফেরাতের জন্যে আরজী পেশ করেছিলেন, যে জন্যে এ আয়াত নাযিল হয়েছেঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

অর্থাৎ এটি নবীর শান নয় এবং মোমেনদের জন্যেও উচিত নয় যে, তারা মুশরেকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থী হবে। যদিও তারা অতি নিকটাত্মীয় হয়। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কোন মুনাফেকের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করেছেন তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ

(হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে এস্তেগফার করুন বা নাই করুন, তাতে কোন ফায়দা হবে না কেননা, আপনি যদি ৭০ বারও তাদের জন্যে এস্তেগফার করেন তবুও তাদেরকে আল্লাহ পাক মাফ করবেন না। আর তাদের ব্যাপারে এ আয়াতও নাযিল হয়েছে ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

(আর তাদের কারো মৃত্যু হলে কখনো তাদের প্রতি নামাযে জানাজা আদায় করবেন না আর তাদের কবরের পাশেও দাড়াবেন না) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসব দোয়া তখন করেছিলেন যখন একথা তাঁর জানা ছিলনা যে, কাফেরদের পক্ষে দোয়া কবুল হয়না।[১]

আল্লাহ পাকের দীদার

হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তাঁর দীদারের আরজী সম্পর্কে যে জবাব দিয়েছেন তাতে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভব নয়। এ কারণেই বাতিল ফেরকা মুতাজেলা এ মত পোষণ করে যে, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভব নয়। দুনিয়াতেও নয় আখেরাতেও নয়, তারা দলিল হিসেবে আলোচ্য বাক্যটি পেশ করে। আলোচ্য বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

"লান" ব্যবহৃত হয় তাগিদের জন্যে। অর্থাৎ তুমি কখনও আমাকে দেখতে সক্ষম হবেনা। অতএব, এতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভব হবে না।

কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সর্ব সম্মত অভিমত হল, যুক্তির নিরীখে আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভব হলেও পৃথিবীর এ জীবনে মানুষের দুর্বলতার কারণেই আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভব হয় না। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ পাক মোমেন বন্দাগণকে আল্লাহ পাকের দীদার লাভের যোগ্যতা দান করবেন এবং মোমেন বন্দাগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

(সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে) আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেনঃ

انكم سترون ربكم يوم القيامة

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে।

অতএব, আখেরাতে আল্লাহ পাকের দীদার হবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শবে মে'রাজে আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেছিলেন কি-না?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮০

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহের বর্ণনায় কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, শবে মে'রাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু তা পৃথিবীতে নয়; বরং উর্দ্ধলোকে, আরশে মোয়াল্লায়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আনাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম এ অভিমতই পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ (রহঃ)-কে এ সম্পর্কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন– قَدْ رَاٰهُ তিনি অবশ্যই আল্লাহ পাককে দেখেছেন। আর একথাটিকে তিনি বারে বারে বলেছিলেন, এমনকি তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ নশরুত্তীব ফি-জিকরিন নবীয়্যিল হাবীবে, যার বঙ্গানুবাদ হয়েছে 'যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা' নামে।[১]

আলোচ্য আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহর দীদার সম্পর্কে যে জবাব দেয়া হয়েছে এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে শবে মে'রাজে আল্লাহর দীদার লাভ হয়েছে– এর মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অবশ্যই আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেছেন তা দুনিয়াতে নয়; বরং উর্দ্ধলোকে। আর তা স্বাভাবিক অবস্থায় নয়, বরং শবে মে'রাজের বরকতময় রাতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষ দানে ধন্য করেছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

মূলতঃ দর্শকের যোগ্যতা এবং আল্লাহ পাকের দানের উপরই তা নির্ভর করে। এজন্যেই আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে একথা বলেননি যে, আমার দীদার কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়, আমি কখনও কাউকে দেখা দেইনি; বরং তিনি বলেছেনঃ বর্তমান অবস্থায় কখনও তুমি আমাকে দেখতে সক্ষম হবে না। তূর পাহাড়ের তাজাল্লীর দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন।[২]

হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহর দীদারের আরজী পেশ করলেন

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ এবং এবনে এসহাক বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ আরজী পেশ করলেন, "হে পরওয়ারদেগার! তোমার দীদার নসীব কর" তখন কোহে তূরে এক বিস্ময়কর অবস্থা পরিলক্ষিত হল।

১। আল্লাহ পাকের দীদার সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন এই লেখকের অনূদিত গ্রন্থ যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, পৃষ্ঠা-৬৮-৭১

২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২১৬-১৭

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল সমগ্র এলাকা। চতুর্দিকে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, আকাশে মেঘমালা দেখা গেল এবং আসমানের গর্জন শ্রুত হল। আল্লাহ্ পাক আসমানের ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন সম্মুখে হাযির হতে। নির্দেশ মোতাবেক দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণ গরুর আকৃতি ধারণ করে মেঘমালার গর্জনের ন্যায় উচ্চস্বরে আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ্ পাঠরত অবস্থায় বের হচ্ছিল।

এরপর দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশতাগণ বাঘের আকৃতি ধারণ করে উচ্চস্বরে তসবীহ্ পাঠরত অবস্থায় বের হলো। মূসা এবনে এমরান এ দৃশ্য দেখে ভীত হলেন এবং অতি উচ্চস্বরে তসবীহর শব্দ শ্রবণ করে শঙ্কিত হলেন, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপতে লাগলো এবং তিনি বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভের যে আরজী পেশ করেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত হচ্ছি। যদি কেউ আমাকে এ স্থান থেকে সরিয়ে নিত তবে আমি এ দৃশ্য দেখতাম না।

তখন ফেরেশতাদের সর্দার বললেন, হে মূসা! তুমি আরজীর উপর কায়েম থাক, এখনও তুমি খুব কমই দেখেছ, অনেক কিছু তোমাকে দেখতে হবে। এরপর তৃতীয় আসমানের ফেরেশতাগণ মূসা (আঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তারাও বাঘের আকৃতি ধারণ করেছিলো এবং উচ্চস্বরে তসবীহ্ পাঠ করছিলো, অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ছিল তাদের বর্ণ। মূসা (আঃ) আরো ভীত হলেন। তখন তিনি তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। ফেরেশতাগণ বললেন, তুমি তোমার অবস্থানে থাক। তোমার সম্মুখে এমন দৃশ্য আসবে যা তুমি বরদাশত করতে পারবেনা।

এরপর চতুর্থ আসমানের ফেরেশতাগণ মূসা (আঃ)-এর সম্মুখে আসলো। পূর্বে যে সব ফেরেশতারা এসেছিল তাদের থেকে এদের আকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তবে তাদের বর্ণ ছিল অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায়। তাদের দেহ ছিল বরফের মত ধবধবে সাদা। তাদের তসবীহ্ পাঠের আওয়াজও ভিন্নধর্মী ছিল, হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তর এত ভীত-সন্ত্রস্ত হল যে, তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন ফেরেশতাদের সরদার তাঁকে বললেন, হে এবনে এমরান! তুমি তোমার আরজীর উপর কায়েম থাক। তুমি কমই দেখেছ আরো অনেক কিছু দেখতে হবে।

এরপর পঞ্চম আসমানের ফেরেশতাগণ মূসা (আঃ)-এর সম্মুখে আসলো। যাদের সাতটি বর্ণ ছিল। মূসা (আঃ) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হলেন না। কেননা, এমন আকৃতি তিনি ইতিপূর্বে কোনদিন দেখেননি আর এমন আওয়াজও কখনও শ্রবণ করেননি এবং তিনি অত্যন্ত বেশী ক্রন্দন করতে লাগলেন। ফেরেশতাদের সরদার বললেন, এবনে এমরান! তুমি তোমার অবস্থায় থাক এবং সবর অবলম্বন কর। এমন সব জিনিস তোমার সম্মুখে আসবে যা তুমি সইতে পারবে না। এরপর আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক ষষ্ঠ আসমান থেকে ফেরেশতাগণ হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলো।

প্রত্যেক ফেরেশতার হাতে সূর্যের চেয়ে উজ্জলতর খেজুর বৃক্ষের ন্যায় আগুনের লাঠি ছিল। তাদের পোষাক ছিল অগ্নি স্ফুলিংগের ন্যায়। প্রত্যেক ফেরেশতার একটি মাথায় চারটি মুখ ছিল, এর পূর্বে যে সব ফেরেশতাদের কথা উল্লেখিত হয়েছে তাদের সবার চেয়ে অধিকতর এবং উচ্চতর স্বরে এরা তসবীহ পাঠ করছিলো। তারা এ তসবীহ পাঠ করছিলোঃ

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ رَبُّ الْعِزَّةِ

মূসা (আঃ) তাদের তসবীহের আওয়াজ শ্রবণ করে নিজেও তসবীহ পাঠ করছিলেন এবং বলছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ভুলে যেওনা, আমাকে বাদ দিয়োনা। আমি জানিনা এ অবস্থা থেকে আমি উদ্ধার পাব কি-না। যদি আমি এখান থেকে বের হতে চাই তবে জ্বলে যাব। আর যদি আমি এখানে থাকি তবে মৃত্যু মুখে পতিত হব।

ফেরেশতাদের সরদার বললেনঃ হে এবনে এমরান! তোমার ভয় সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং তোমার অন্তর বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে, অথচ তুমি যে বিষয়ের জন্যে আরজী পেশ করেছ তার জন্যে তোমাকে আরো সবর করতে হবে। এরপর সপ্তম আসমানের ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হয়েছে আল্লাহ পাকের মহান আরশ উত্তোলন করার, আর যখনই আরশের নূর প্রকাশিত হয়েছে, তখনই ফেরেশতাগণ তসবীহ পড়তে লাগলেন ঃ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسُ رَبُّ الْعِزَّةِ اَبَدًا لَا يَمُوْتُ

এদিকে পাহাড় প্রকম্পিত হল এবং ধ্বসে গেল, পাহাড়ের বৃক্ষগুলো ভেঙে গেল আর দুর্বল বন্দা মূসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে মূসা (আঃ)-এর নিকট রুহ প্রেরণ করলেন, যে পাথরের উপর মূসা (আঃ) দন্ডায়মান ছিলেন তাকে উল্টিয়ে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে করে মূসা (আঃ) নূরের তাজাল্লীতে দগ্ধ না হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর রুহ যখন তাঁর ভেতরে প্রবেশ করল তখন তিনি তসবীহ পাঠরত অবস্থায় দন্ডায়মান হলেন, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এই বলে মোনাজাত করতে লাগলেন, হে আমার মালিক! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, আমি এ সত্য উপলব্ধি করেছি, যে ব্যক্তি তোমাকে দেখবে সে জীবিত থাকবেনা এমনকি, যে তোমার ফেরেশতাদেরকে দেখবে তার অন্তরও ভয়ের কারণে বের হয়ে যাবার উপক্রম হবে। তোমার মাহাত্ম, শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র স্বীকৃত, তুমি সকলের প্রতিপালক, তুমি সকলের উপাস্য, তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তোমার সমান কেউ নেই, তোমার মোকাবেলায় কিছুই নেই, হে আমার

প্রতিপালক। আমি তোমার প্রতি মনোনিবেশ করি, সকল প্রশংসা শুধু তোমারই জন্যে, তোমার কোন শরীক নেই, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী শুধু তুমি। তুমি বিশ্ব প্রতিপালক।[১]

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًاۚ

এরপর আল্লাহ পাক যখন সত্য সত্যই তূর পাহাড়ের উপর তাজাল্লী ফেললেন তথা নূর বিকীরণ করলেন, তখন পাহাড়টি সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধ্বসে গেল এবং সমতল ভূমিতে পরিণত হল, আল্লাহ পাকের নূরের ঝলক দেখা মাত্র হযরত মূসা (আঃ) চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, নূর বিকীরণের তথা তাজাল্লী ফেলার তাৎপর্য হল যেমন আয়নার মধ্যে কারো আকৃতির প্রকাশ ঘটা, নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের দীদার নয়; বরং নূরের ঝলক মাত্র।

এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ তূর পাহাড়ের উপরে আল্লাহ পাকের নূর প্রকাশিত হয়েছিলো, আর যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক তাঁর নূর থেকে ক্ষণিকের জন্যে আবরণ সরিয়ে নিয়েছিলেন আর গরুর নাকের ছিদ্রের সমান নূর প্রকাশ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং কা'ব আহবার (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের নূর সুইয়ের ছিদ্রের সমান মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই পাহাড় ধ্বসে গেল।

হযরত সাহাল এবনে সা'দ (রঃ) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর নূরের ৭০,০০০ পর্দা থেকে মাত্র এক দেরহামের সমান সরিয়ে দিয়েছিলেন; ফলে পাহাড় ধ্বসে গেল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ পাহাড়কে মাটি করে ফেলা হল। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ পাহাড় ধীরে ধীরে সরে গেল এমনকি, শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হল। আতীয়্যা (রঃ) বলেছেনঃ পাহাড়টি ধ্বংস হয়ে মরুভূমিতে পরিণত হল।

কালবী (রহঃ) লিখেছেন, دَكًّا শব্দের অর্থ হল খন্ড খন্ড হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লীর কারণে তূর পাহাড় ছোট ছোট খন্ড হয়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে বিভক্ত হল।

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের নূরের মাহাত্মের কারণে তূর পাহাড়টি ছয়টি পাহাড়ে বিভক্ত হয়েছে তন্মধ্যে তিনটি মদীনা শরীফে। ওহোদ, বে'কান, রাজবী, তিনটি মক্কা শরীফে। সওর, সাবীর, হেরা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এর তরজমা করেছেন, বেহুশ হওয়া। আর কাতাদা বলেছেন, মৃত্যু হওয়া।

কালবী (রহঃ) বলেছেন, আরাফার দিন বৃহস্পতিবার মূসা (আঃ) বেহুশ হয়েছিলেন। আর জুমআর দিন তথা কোরবানীর দিন আল্লাহ পাক তাঁকে তৌরাত

১। খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০০-০১

দান করেছিলেন। ওয়াকেদী (রহঃ) বলেছেন, মূসা (আঃ) যখন সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন তখন ফেরেশতাগণ বললেন, এবনে এমরানের দীদার লাভের দরখাস্তের কি হল?

فَلَمَّآ اَفَاقَ

অর্থাৎ মূসা (আঃ) যখন চেতনা ফিরে পান তখন তিনি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করলেন, আল্লাহ পাকের দীদারের মাহাত্ম এবং তাৎপর্য কি? তাই তিনি বললেনঃ

سُبْحٰنَكَ

পবিত্র তুমি হে প্রতিপালক, তুমি মহান, তুমি মহিমান্বিত, সব কিছুর উর্দ্ধে তোমার শান, আমি তোমার কথা শ্রবণ করে তোমার দীদারের পাগল হয়েছি যা হল আমার সাধ্যাতীত, তোমার দীদারের আবেদন করার মাধ্যমে আমি অপরাধ করেছি, এ অপরাধের জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।

تُبْتُ اِلَيْكَ

'নিশ্চয় আমি এজন্যে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী, আমি তোমার নিকটই আশ্রয় চাই'।

লক্ষ্যণীয়, আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য হল এই, যদি তাঁদের দ্বারা কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি বা আদবের খেলাফ কিছু হয়ে যায় তবে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করেন। তাই হযরত মূসা (আঃ)-ও আল্লাহর দীদারের যে আবেদন করেছিলেন তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন।

وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

আমিই প্রথম মোমেন। অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম ঈমান এনেছি। কেননা, প্রত্যেক নবীর ঈমান তাঁর উম্মতের পূর্বেই হয়ে থাকে। এ বাক্যটির আরও একটি ব্যাখ্যা এই, হে পরওয়ারদেগার! আমার সম সাময়িকদের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের উপর ঈমান এনেছি। এ পৃথিবীতে এ চর্ম চক্ষে তোমার দীদার লাভ করা যে সম্ভব নয় এ সত্য আমিই সর্বাগ্রে উপলব্ধি করলাম।

আয়াত সম্পর্কে আরও কিছু কথা

আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিষয় রয়েছেঃ

১. আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলা।

২. আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করা।

৩. কি অবস্থায় আল্লাহ পাকের সঙ্গে সঙ্গে কথা হয়েছে,

৪. কি কথা হয়েছে,

৫. সন্দেহ দূর করা,

৬. নূর বিকীরণ।

১. আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলার সুযোগ লাভ করেছেন হযরত মূসা (আঃ); وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ বাক্য দ্বারা একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। দুররে মনসুরে হযরত কা'ব (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে যে, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সব ভাষায় কথা বলেছেন। যখন তিনি আরজ করেছেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি বুঝতে পারিনি। তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাষায় কথা হয়েছে যা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ভাষায় কথা বলেছেন।

আবু সোলায়মান বলেছেন, আল্লাহ পাক মানব জাতির অন্তরে দৃষ্টিপাত করলেন। তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর দিলের মধ্যে সর্বাধিক বিনয় দেখতে পেলেন, তাই হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর মধুর কালামে ধন্য করলেন।

আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করা

২. এ সম্পর্কেও আলোচ্য আয়াতে রয়েছে ঘোষণা। لَنْ تَرٰنِىْ হে মূসা! তুমি অবশ্যই আমাকে দেখতে পারবেনা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ পর্যায়ে একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

خص موسى بالتكلم وخص ابراهيم بالخلة وخصنى بالروية

অর্থাৎ মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, তাঁর সাথে কথা বলেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কেও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাঁকে স্বীয় বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন। আর আমাকে তাঁর দীদার লাভে ধন্য করেছেন।

আল্লাহ পাক মহান দাতা, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন।

৩. কি অবস্থায় কথা হয়েছে এ সম্পর্কেও ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৪. কি কথা হয়েছে, দুররে মনসুরে এ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পেশ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে মূসা! দুনিয়াত্যাগী হওয়ার চেয়ে উত্তম গুণ নেই। তাকওয়া পরহেযগারী আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উত্তম মাধ্যম এবং ক্রন্দনের চেয়ে উত্তম কোন এবাদত নেই। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন,

তাদের জন্য কি পুরস্কার রেখেছ? এরশাদ হয়েছেঃ দুনিয়াত্যাগীদের জন্যে জান্নাত এবং মুত্তাকী পরহেযগারদের জন্যে হিসাব সহজ হওয়া। ক্রন্দনকারীদের জন্যে প্রকৃত বন্ধু আল্লাহর নৈকট্য। আরজঃ হে পরওয়ারদেগার! জিকরের কোন তরীকা শিক্ষা দিন। এরশাদ হয়েছেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মূসা (আঃ) আরজ করলেন এই কলেমাতো সবাই পাঠ করে, আমি চেয়েছিলাম কোন বিশেষ জিকর।

তখন এরশাদ হল, হে মূসা! যদি সাত আসমান এবং সাত জমিন এবং তার অধিবাসীকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর এই কলেমা অন্য পাল্লায় রাখা হয় তবে এ পাল্লাই ভারি হবে। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তোমার বিশেষ ব্যক্তি কারা যাদেরকে তুমি আরশের ছায়াতলে স্থান দেবে? এরশাদ হয়েছেঃ যাদের হাত পবিত্র (অর্থাৎ যারা নিষিদ্ধ কাজ করেনা) যাদের অন্তর পবিত্র হয় (অর্থাৎ রিয়া এবং শেরক থেকে) যারা আমার মাহাত্মের আশেক, যখন আমার জিকর হয় তখন তাদেরও আলোচনা হয়, অর্থাৎ সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

একের জিকরে অন্যের আলোচনা হয়, যারা অত্যন্ত কষ্ট সত্ত্বেও অজু পুরো করে এবং যারা আমার জিকরে রাত অতিবাহিত করে এবং আমার মহব্বতের কারণেই তারা একে অন্যের সাথে মহব্বত করে। যখন কেউ আমার হারাম কাজকে হালাল মনে করে তখন তারা এমন রাগান্বিত হয় যেমন বাঘ হামলায় উদ্যত হওয়ার সময় রাগান্বিত হয়। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনাকে কোথায় খুজবো! এরশাদ হয়েছেঃ হে মূসা! ভগ্ন অন্তরের নিকট। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি কাকে বেশি মায়া করেন?

এরশাদ হয়েছেঃ যে আমার খাতিরে অন্যদেরকে নিজের প্রাণের ন্যায় প্রিয় জানে। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেনঃ হে দয়াময়! তুমিইতো সকলকে সৃষ্টি করেছ আর তোমার সৃষ্টিকে পুনরায় আবার আযাব দেবে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হে মূসা! তুমি কৃষি কাজ কর, আদেশের সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা (আঃ) জমিনে বীজ বপন করলেন, গাছ উঠলো, ফসল কেটে আনলেন। এরপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করলেন, হে মূসা! কি রেখে এসেছো আর কি উঠিয়ে এনেছ? আরজ করলেন, যা উপকারী তথা খাদ্যদ্রব্য তা উঠিয়ে এনেছি আর যা উপকারী নয় তথা খড়কুটা তা ফেলে দিয়ে এসেছি। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হে মূসা! ঠিক এভাবেই যারা বেখবর, যাদের মধ্যে কোন বরকত নেই তাদেরকে দোযখের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

হযরত মূসা আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! সবচেয়ে বড় আলেম কে? এরশাদ হয়েছে যে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, কার আদেশ ভাল? এরশাদ হলোঃ যে অন্যদের প্রতি এমন আদেশ করে যেমন

নিজের প্রতি আদেশ করে। পুনরায় তিনি আরজ করলেন, সবচেয়ে বড় ধনী কে? এরশাদ হলঃ যে অল্পে সন্তুষ্ট।

আবু লাইস এবং আবু বকর এবনে আসেম বলেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ একদিন হযরত মূসা (আঃ) শ্রবণ করলেন, হে মূসা! তিনি এদিক সেদিক কাউকে দেখলন না। পুনরায় ডাক শুনলেন, হে মূসা! এবনে এমরান! ডানে বামে দৃষ্টিপাত করলেন কিন্তু কাউকে দেখলেন না। তখন ভয়ে তাঁর অন্তর কাঁপতে লাগলো। এরশাদ হলঃ হে এমরানের পুত্র! আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। মূসা (আঃ) আরজ করলেন, লাব্বাইক, লাব্বাইক, গোলাম হাযির গোলাম হাযির। এরপর তিনি সেজদায় পড়ে গেলেন। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হে মূসা! মাথা উঠাও। যদি তুমি চাও যে, কেয়ামতের দিন তুমি আরশের ছায়ায় থাকবে তবে এতীমের প্রতি দয়া কর ঠিক তার পিতার ন্যায়, বিধবার প্রতি সাহায্য কর তার স্বামীর ন্যায়। তুমি দয়া কর তবে তোমার প্রতিও দয়া করা হবে। হে মূসা! যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবা

হে মূসা! বনী ইসরাঈল আমার মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে) অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! আমি তাঁর চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন আর কাউকে সৃষ্টি করিনি। আসমান এবং জমিন সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে আমি আমার নামের সাথে তাঁর নাম আরশে লিপিবদ্ধ করেছি। আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! যতক্ষণ মোহাম্মদ এবং উম্মতে মোহাম্মদীয়া জান্নাতে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ আমার অন্য বন্দাদের উপর জান্নাত হারাম। মূসা (আঃ) আরজ করলেন, তাঁর উম্মত কে?

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ তাঁর উম্মত ওঠা-বসায় (তথা সর্বক্ষণ) আল্লাহর হামদ করবে এবং সর্বদা আল্লাহর বন্দেগীতে প্রস্তুত থাকবে। দিনে রোজা রাখবে এবং রাতে জাগ্রত থাকবে আর তাদের অল্প খেদমত কবুল করবো এবং কলেমায়ে শাহাদাতের কারণে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে সেই উম্মতের পয়গম্বর বানিয়ে দিন। এরশাদ হল সেই উম্মতের মধ্য থেকেই তাদের নবী হবে। তিনি আরজ করলেন, আমাকে সেই উম্মতের মধ্যে শামীল করুন। এরশাদ হয়েছেঃ তুমি আগে এসেছ, তারা পরে আসবে। তবে আমি তোমাকে এবং প্রিয়নবীকে দ্বারে জালালে একত্রিত করবো।[১]

১। খোলাফাতুতাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০১-০২

৫. সন্দেহ ভঙ্গ করা। বাতিল ফেরকা মুতাজেলার ভ্রান্ত ধারণা হল আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার বাতুলতা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের তরফ থেকে প্রমাণ করা হয় আলোচ্য আয়াত দ্বারা। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর আরজীর বিবরণ এভাবে পেশ করেছেনঃ

رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ

হে পরওয়ারদেগার! আমাকে আপনার দীদার নসীব করুন, আমি আপনার দিকে এক নজর দেখতে চাই। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের দীদার অসম্ভব নয় কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরাম কোন অসম্ভব বিষয়ের জন্যে আরজী পেশ করেন না।

দ্বিতীয়তঃ এখানে আরও একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য তা হল হযরত নূহ (আঃ) যখন তাঁর কাফের পুত্রের নাজাতের জন্যে দোয়া করেছিলেন তখন আল্লাহ পাক তাঁর সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

(হে নূহ! আমি তোমাকে উপদেশ দান করি, তুমি মূর্খ লোকদের ন্যায় কথা বলোনা) পক্ষান্তরে যখন হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর দর্শন লাভের আরজী পেশ করেন তখন আল্লাহ পাক কোন ক্রোধের ভাষা ব্যবহার করেননি; বরং তাঁকে সান্তনা দিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেনঃ "তুমি দুনিয়াতে অবস্থানকালে আমাকে দেখতে পারবেনা। নূরের তাজাল্লী সহ্য করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না"।

এরপরও হযরত মূসা (আঃ)-এর সান্ত্বনার জন্যে আল্লাহ পাক একথাও এরশাদ করেছেনঃ হে মূসা! তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি আমার নূর বিকীরণের পরও পাহাড় স্বস্থানে টিকে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পারবে। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই, পাহাড়ের টিকে থাকা অসম্ভব নয় তাই আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু দুনিয়াতে অবস্থান কালে কোন মানুষ আল্লাহ পাককে দেখতে পারেনা। কোন নশ্বর বস্তু অবিনশ্বরকে কিভাবে দেখতে পারবে। কিন্তু আখেরাতের জিন্দেগী চিরস্থায়ী হবে, চিরস্থায়ী হবে জীবনের যাবতীয় উপকরণ। আর এ কারণে মানুষ তখন আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে।[১]

৬. তাজাল্লীর বিকাশঃ তথা আল্লাহ পাক যখন তাঁর নূর বিকীরণ করলেন তখন কি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, এর জন্যে যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন তার উল্লেখ ইতিপূর্বে হয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৫

قَالَ يٰمُوْسٰىٓ اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ
وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهٗ
فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۚ سَاُورِيْكُمْ دَارَ
الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾ سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ
الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ
سَبِيْلًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا
غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۗ
هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾

তরজমা

(১৪৪) আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রেসালত ও আমার আলাপের দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। অতএব, আমি তোমাকে যা কিছু দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক।

(১৪৫) আর তাকে আমি সব বিষয়ে উপদেশ এবং সব কিছুর বিশদ বিবরণ ফলক পৃষ্ঠে লিপিবদ্ধ করে দেই। অতএব, এগুলো শক্ত করে আঁকড়ে ধর এবং তোমার জাতিকে এর উত্তম বিষয় সমূহ গ্রহণ করার নির্দেশ দাও। আমি অচিরেই তোমাদেরকে নাফরমানদের বাসস্থান দেখাব।

(১৪৬) যারা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দেব। তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখেও ঈমান আনবেনা, তারা হেদায়েতের পথ দেখেও তা গ্রহণ করবে না। পক্ষান্তরে, তারা যদি ভ্রান্ত পথ দেখে তবে তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। কেননা তারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং সে সম্পর্কে উদাসীন রয়েছে।

(১৪৭) আর যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং আখেরাতের মোলাকাতকে অস্বীকার করেছে তাদের সকল সাধনা পন্ড হয়েছে। তারা তাদের কৃত কর্মেরই ফল ভোগ করবে।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর দীদার লাভে ধন্য হওয়ার আবেদন পেশ করেছেন। আল্লাহ পাক তার জবাবে বলেছেনঃ "তুমি আমাকে দেখতে পারবে না"। দীদার থেকে মাহরুম হওয়ার কারণে হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন, হে মূসা! তুমি যদিও আমার দীদার লাভ করোনি তবুও এটি কম গৌরবের কথা নয় যে, আমি তোমাকে আমার রসূল মনোনীত করেছি, আমি তোমাকে আমার মধুর কালাম দ্বারা ধন্য করেছি। এভাবে আমি তোমাকে বিশেষ ফজিলত ও উচ্চ মর্তবা দান করেছি। অতএব, যা তোমাকে দান করেছি তা সযত্নে রক্ষা কর। আর আমার শোকর গুজার বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও অর্থাৎ আল্লাহ পাক যা তোমাকে দান করেছেন তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আর যা দান করেননি তা নিয়ে ব্যথিত হয়োনা, আর যা তোমার সাধ্যের উর্দ্ধে তার জন্যে আবেদন করোনা। তাই দীদারে এলাহী অর্জিত না হওয়ার কারণে আক্ষেপ করোনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ যখন মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ পাক কথা বলেছেন তখন তাঁর চেহারায় এক বিস্ময়কর চমক দেখা দেয়। তাঁর চেহারা এত উজ্জল হয়ে যায় যে, কেউ তাঁর দিকে তাকাতে পারতো না। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর চেহারার এই অবস্থা অব্যাহত ছিল।

একবার তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, যখন থেকে আল্লাহ পাক আপনাকে তাঁর পবিত্র মধুর কালাম দ্বারা ধন্য করেছেন তখন থেকে আমি আপনার থেকে দূরে সরে পড়েছি। হযরত মূসা (আঃ) চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর স্ত্রীর চেহারার উপর সূর্যের কিরণের ন্যায় কিরণ বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দু' হাত দিয়ে চেহারাকে আবৃত করলেন এবং সেজদায় পড়ে গেলেন এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট এ আবেদন করলেনঃ আপনি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাতে আপনার স্ত্রী হিসেবে রাখেন। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এ শর্তে যে, তুমি আমার পরে আর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে না হও। কেননা, স্ত্রীলোক আখেরাতে তার সর্বশেষ স্বামীরই স্ত্রী হবে।

উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ফজিলত

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত কা'ব আহবার (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) তৌরাত পাঠ করলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে এ

আরজী পেশ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তৌরাতে একটি উম্মতের আলোচনা দেখেছি যা সকল উম্মতের মধ্যে উত্তম হবে। তারা মানুষকে কল্যাণকর কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তাদের ঈমান হবে আল্লাহ্ পাকের প্রতি। তারা পূর্বের ও পরের সকল আসমানী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং পথভ্রষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে এমনকি, কানা দাজ্জালের বিরুদ্ধেও তারা জেহাদ করবে। হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, তারা হবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত।

হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তৌরাতে আমি একটি উম্মতের অবস্থা দেখতে পাই, তারা অনেক বেশী হামদ পাঠ করবে এবং যারা সূর্যের পরিভ্রমণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে (অর্থাৎ সূর্যের উদয় অস্তের মাধ্যমে তারা নামাযের সময় নির্ধারণ করবে এবং নামাযের অপেক্ষা করবে)। যখন তারা কোন কাজের ইচ্ছা করবে তখন তারা বলবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা আমরা এ কাজ করবো, তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, তারা হবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত।

হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেনঃ তৌরাতে একটি উম্মতের আলোচনা পাই, তারা নিজেদের সদকা এবং কাফ্ফারা সমূহ নিজেরাই ভোগ করবে (অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ করবেনা। পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা নিজেদের মান্নত এবং সদকাহকে অগ্নিদগ্ধ করতো)। এ উম্মতের লোকেরা দোয়া করবে, তাদের দোয়া কবুল হবে, তারা সুপারিশ করবে তাদের সুপারিশ কবুল হবে। পরওয়ারদেগার! তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ এই উম্মত হবে মোহাম্মদ এর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)।

হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেনঃ আমি এমন উম্মতের আলোচনা দেখতে পাই, তারা যখন কোন পাহাড়ের টিলার উপর আরোহন করবে, তারা বলবে, "আল্লাহু আকবর"। যখন তারা নিম্নদেশে অবতরণ করবে তখন তারা আল্লাহর হামদ পাঠ করবে অর্থাৎ তারা হাজী হবে। তাদের জন্যে সারা পৃথিবীর মাটি পবিত্র হবে এবং সব মাটি তাদের জন্যে পবিত্রতাকারীও হবে (অর্থাৎ তারা তয়ম্মুম করবে)। সারা পৃথিবী তাদের জন্যে মসজিদ হবে। (অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে তারা নামায আদায় করতে পারবে)। তারা যেখানেই থাকুক, সেখানেই গোসল ফরজ হলে পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে। যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে মাটি দ্বারা এভাবে তারা পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে যেভাবে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। অজুর কারণে তাদের হাত-পা অতি সুন্দর এবং উজ্জ্বল হবে (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) হে পরওয়ারদেগার! তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ তারা হবে মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উম্মত।

হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমি এমন লোকদের আলোচনা দেখতে পাই, যারা শুধু নেক আমলের ইচ্ছা করবে, আমলের সুযোগ হবেনা। তবুও তাদের জন্যে একটি নেকী লিপিবদ্ধ হবে, যদি তারা নেক আমল করে, তবে দশ থেকে ৭০০শ' গুণ পর্যন্ত তারা সওয়াব পাবে।

পক্ষান্তরে, তারা যদি পাপকার্যের শুধু ইচ্ছা করে, তবে পাপ লিপিবদ্ধ হবেনা। যদি তারা পাপকার্যে লিপ্ত হয় তবে তা এতখানি পাপই লেখা হবে যতখানি তারা করেছে। হে পরওয়ারদেগার! তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ তারা হবে আহমদ এর উম্মত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)।

হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেনঃ আমি একটি উম্মতের আলোচনা দেখতে পাই যারা খুব দুর্বল হবে, যাদেরকে তুমি আসমানী কিতাব দান করবে তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজেদের প্রতি জুলুম করবে (অর্থাৎ গুনাহগার হবে) আর কিছু লোক মধ্যম অবস্থায় থাকবে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে ভাল মন্দ একত্রিত হবে)। আর কিছু লোক নেক কাজের দিকে অগ্রগামী হবে, তারা সকলেই রহমত লাভ করবে, তাদের মধ্যে এমন কেউ হবে না যে, রহমত লাভ করবে না। হে পরওয়ারদেগার! তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, তারা উম্মত হবে আহমদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)।

হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ আমি (তৌরাতে) এমন লোকদের কথা দেখতে পাই যাদের বক্ষে থাকবে আসমানী গ্রন্থ (অর্থাৎ তারা হাফেজে কোরআন হবে)। তারা জান্নাতবাসীদের পোষাকের বর্ণের পোষাক পরিধান করবে, তাদের নামাযের কাতার ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় হবে। মসজিদ সমূহে তাদের পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের শব্দ মধুমক্ষিকার শব্দের ন্যায় হবে, তাদের মধ্যে কেউ কখনও দোযখে প্রবেশ করবে না, সে ব্যক্তি ব্যতীত যে নেক কাজ থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যেমন পাথর বৃক্ষের পত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। হে পরওয়ারদেগার! তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, তারা হবে উম্মতে আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)।

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতকে আল্লাহ পাক এত গুণাবলী, এত কল্যাণ দান করবেন জানতে পেরে হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হায় আক্ষেপ! যদি আমি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! হযরত মূসা (আঃ)-এর এ আক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক তাঁকে তিনটি খোশ খবরী দিলেন যা আলোচ্য আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ يٰمُوْسٰىٓ اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ۝

তখন হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

'আর আমি তাকে সব বিষয়ে নসিহত এবং সব কিছুর বিষদ বিবরণ ফলক পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি'।

আল্লাহ পাকের দীদার লাভে বঞ্চিত হওয়ার কারণে হযরত মূসা (আঃ)-এর মনে যে আক্ষেপ ছিল তা দূরীভূত করার নিমিত্তে যেভাবে পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রসূল মনোনীত করেছি এবং আমার মধুর কালাম দ্বারা ধন্য করেছি, ঠিক এমনিভাবে এ আয়াতেও হযরত মূসা (আঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছেঃ আমি সব বিষয়ে নসিহত ফলক পৃষ্ঠে তার জন্যে লিখে দিয়েছি। তফসীরকারগণ ফলক সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেন। কারো মতে, এ সমস্ত ফলকের মধ্যে তৌরাত লিপিবদ্ধ ছিল। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তৌরাত নয়; বরং অন্য মূল্যবান উপদেশ ছিল। ফলক সাত বা দশটি ছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ "তখতি" বা ফলকগুলোতে তৌরাত লিপিবদ্ধ ছিল। হাদীস শরীফে এসেছে, এ ফলকগুলো ছিল জান্নাতের বৃক্ষের পাতা, দৈর্ঘে বার হাত ছিল।

আল্লাহ পাকের মোবারক কুদরতী হস্তে যা তৈরী হয়েছে–

হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে আল্লাহ পাক তিনটি জিনিস আপন কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেনঃ

১. আদম (আঃ) ২. জান্নাত ৩. তৌরাতও স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, জীব্রাঈল, আরশ এবং লওহে মাহফুজ এ তিনটি বস্তু আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী হাতে তৈরী করেছেন।[১]

হাসান বসরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, এ ফলকগুলো কাষ্ঠ খন্ড দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। কালবী (রহঃ) বলেছেন, ফলকগুলো সবুজ বর্ণের জবরযদ পাথরের ছিল। সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, ফলকগুলো লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথরের ছিল। রবী এবনে আনাস বলেছেন, জবরযদ পাথরের ছিল।

১। খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৬

এবনে জোরায়েয বলেছেন, এ ফলকগুলো জমরুত পাথরের ছিল যা আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে জীব্রাঈল (আঃ) জান্নাতে আদন থেকে এনেছেন। এ ফলকগুলো সেই কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে যে কলম দ্বারা জিকর লেখা হয়েছে এবং নূরের নহরের কালি দ্বারা লেখা হয়েছে। বর্ণিত আছে, এ ফলকগুলোতে দশটি নসিহত লেখা ছিল। হযরত মূসা (আঃ) যখন কুহ-ই তোরে আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণের জন্যে গিয়েছিলেন তখন কলম পরিচালিত হওয়ার শব্দও শ্রবণ করেছিলেন। এ ফলকগুলোর দৈর্ঘ হযরত মূসা (আঃ)-এর দৈর্ঘের সমান দশ হাত ছিল। মোকাতেল এবং ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রহঃ) লিখেছেন, আংটিতে যেভাবে লেখা হয় ঠিক সেভাবে ঐ ফলকগুলোতে নসীহত লিখিত ছিল। রবী এবনে আনাস বলেছেন, তৌরাত যখন নাযিল হল তখন তা সত্তরটি উষ্ট্রের বোঝা ছিল। তার একটি অংশ পাঠ করতে এক বছর লাগতো। হযরত মূসা (আঃ), হযরত ইউশা (আঃ), হযরত ওজায়ের (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) ব্যতীত আর কেউ পূর্ণ তৌরাত পাঠ করেননি।[১]

বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক তাঁর মোবারক কুদরতী হস্তে ফলক সমূহে তৌরাত লিপিবদ্ধ করার পর আসমানের উপর রাখতেন। কিন্তু আসমান এ বোঝা বহনে অক্ষম হল। তখন আল্লাহ পাক হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে আদেশ দিলেন তুমি এ ফলকগুলো নিয়ে মূসার নিকট পৌঁছে দাও। কিন্তু জীব্রাঈল (আঃ) ফলকগুলোর বোঝা বহনে অক্ষম হলেন। তখন তৌরাতের প্রত্যেক অক্ষরের জন্যে একজন সাহায্যকারী ফেরেশতাকে জীব্রাঈল (আঃ)-এর সাথে দেয়া হল। এভাবে জীব্রাঈল (আঃ) ঐ ফলকগুলোকে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছে দিলেন। যে বোঝা বহনে পাহাড় ভীত হল এবং আরজ করলো, হে পরওয়ারদেগার! এটি তোমার আমানত, কে তোমার আমানত উঠাতে পারে? যেমন পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ

যদি এই কোরআন আমি পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তবে (হে রসূল!) আপনি দেখতেন যে, পাহাড় আল্লাহর ভয়ে ফেটে যেত। মূসা (আঃ)-কে যখন তৌরাত প্রদান করা হল তিনিও তা বহন করতে অক্ষম হন এবং আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করতে থাকেন। তখন আল্লাহ পাক তাকে সহজ এবং হালকা করেছেন। তাই হাফেজ সিরাজী বলেছেন ঃ

آسمان بار امانت نتوا نست کشید
قرعه فال بنام من دیوانه ز دند

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৬

অর্থাৎ এ ফলক সমূহে মানব জাতির যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষতঃ দ্বীনি জরুরী বিষয় বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে। আদেশ নিষেধ, হালাল হারাম এবং সকল বিধি-নিষেধ উপস্থাপন করা হয়েছে।

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ

অতএব, হে মূসা! যা কিছু তোমাকে দান করলাম তা শক্ত হাতে ধর অথবা সতর্ক ভাবে ধর, কোন অবস্থাতেই এ ফলকগুলোকে হাত ছাড়া করোনা। অথবা এর অর্থ হল সুদৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে এ ফলক সমূহকে আঁকড়ে ধর, শুধু তাই নয়; বরং তোমার জাতিকেও এর বিধান সমূহের উপর আমল করার নির্দেশ দাও। ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের জন্যে যা কিছু প্রয়োজনীয় ছিল তার বিধান তৌরাতে পেশ করা হয়েছে। অতএব, তাদের কর্তব্য হল এ বিধান সমূহের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা। আলোচ্য আয়াতে একটি বাক্য রয়েছে–

يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ط

অর্থাৎ বনী ইসরাঈল জাতি যেন তার উত্তম বিধান সমূহ সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে। এখানে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ঐ ফলক সমূহে সে সমস্ত বিধান ছিল সবইতো উত্তম তাহলে উত্তম বিধান সমূহ আঁকড়ে ধরার তাৎপর্য কি? এর জবাবে তফসীরকারগণ বলেছেন, উত্তমের মধ্যে স্তরভেদ আছে, কোনটি অতি উত্তম বা উত্তমতম যেমন, কোন লোকের প্রতি কেউ যদি জুলুম করে তবে জালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণর অনুমতি রয়েছে তবে সবর করা তার চেয়ে উত্তম আর অত্যাচারীকে ক্ষমা করা অধিকতর উত্তম।

এজন্যেই এরশাদ হয়েছে, অধিকতর উত্তম বিধান সমূহকে একাগ্রচিত্তে আঁকড়ে ধর। তফসীরকারগণ এ বাক্যের তফসীর সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতে এর অর্থ হল হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করা এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে চিন্তা চর্চা করা, দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা এবং আল্লাহ পাকের বিধান সমূহের উপর আমল করা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন باحسنها শব্দ দ্বারা ফরজ সমূহ এবং মুস্তাহাব সমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহর কিতাবকে বর্জন করোনা অন্যথায় তোমাদের অবস্থা পাপিষ্ঠদের মত হয়ে যাবে। دَارَ الْفٰسِقِيْنَ শব্দটি দ্বারা মিশরে ফেরাউন ও তার

সম্প্রদায়ের স্মৃতি বিজড়িত ভাঙা বাড়ি-ঘর উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আতীয়্যা (রহঃ) এ মতই প্রকাশ করেছেন। আর সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, এর দ্বারা কাফেরদের ধ্বংস স্থলগুলোকে বোঝানো হয়েছে। কালবী এবং কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, এর দ্বারা আদ, সামুদ এবং অন্যান্য কোপগ্রস্ত সম্প্রদায়ের বিরাট বস্তিগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ভ্রমণ কালে বনী ইসরাইল এ বস্তিগুলোকে অতিক্রম করতো।

তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ) এবং আতা (রহঃ) বলেছেন, دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ দোযখ অবশেষে যেখানে তাদের স্থান হবে। আর কোন কোন তফসীরকার বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ হল হে বনী ইসরাঈল! যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন তবে অবাধ্য লোকদের দেশ সিরিয়া এবং মিশর তোমাদের করতলগত করে দেব।[১]

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِیَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط

যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন সমূহ থেকে ফিরিয়ে দেব। অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের তৌফিক দেয়া হবে না। তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "তাকাব্বর" বা অহংকারী হওয়া অর্থ আল্লাহ পাকের বিদ্রোহী হওয়া এবং তাঁর বিধান অমান্য করা। তাদের অবস্থা এই, যদি তাদেরকে সমস্ত মোজেযা এবং জীবন্ত নিদর্শন সমূহ দেখানো হয় তবুও তারা ঈমান আনবেনা। যদি তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখানো হয়, তা তারা গ্রহণ করবে না। পক্ষান্তরে, যদি তাদেরকে গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার পথ দেখানো হয় তবে তারা তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করবে। এর কারণ এই, তারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মানুষের জন্যে সবচেয়ে নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় কাজ হল অহংকার। একথা সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত যে, অহংকারের চেয়ে বড় কোন অন্যায় কাজ আর নেই। এটি সৃষ্টি মাত্রের জন্যেই অভিশাপ। এ অহংকারের কারণেই ইবলিস শয়তান আল্লাহ পাকের রহমত থেকে চির বঞ্চিত হয়েছে, হয়েছে চির অভিশপ্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যারা আল্লাহ পাকের এবং তাঁর নবীর বিরুদ্ধে অহংকার করে এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে গাফলত করে, আল্লাহ পাক তাদের মন ফিরিয়ে দেন। এমন অবস্থায় তারা আল্লাহ পাকের যত নিদর্শনই দেখুক না কেন, হেদায়েতের যত উজ্জ্বল পথই তাদের সামনে আসুক না কেন তারা তা গ্রহণ করে না। আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করা এবং দম্ভ ভরে তা উপেক্ষা করার অভ্যাসের কারণে মানুষ তার সর্বনাশ করে, সে তার নাজাতের পথ হারিয়ে ফেলে।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২১৭

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে দম্ভভরে অস্বীকার করে এবং সেই নির্দশন সমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণে বিরত থাকে, হেদায়েত গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অনবরত অস্বীকৃতি তাদের ধ্বংস ডেকে আনে। এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, আমি এমন অহংকারী বিদ্রোহীদের মন ফিরিয়ে দেব, ফলে তারা হেদায়েত গ্রহণ থেকে চির বঞ্চিত হবে। যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে আমি তাদেরকে ধ্বংস করবো যেমন ফেরাউন এবং তার দলবলকে করা হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর নূরকে বিচ্ছুরিত করবেন যদিও তা কাফেররা অপছন্দ করে। অথবা এর অর্থ হল যেহেতু তারা সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়না, সত্যের সঙ্গেই যেন তাদের লড়াই, তাই তাদেরকে হেদায়েত থেকে মাহরুম করবো। পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনয়ন থেকে তারা বঞ্চিত হবে। যেমন আবু জেহেল, আকাবা এবনে আবি মুয়ীত, উমাইয়া এবনে খালফ গয়রহকে চির বঞ্চিত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে অহংকার করে তাদেরকে এ অহংকারের শাস্তি স্বরূপ পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী থেকে এবং তার বিস্ময়কর তত্ত্বজ্ঞান থেকে বঞ্চিত করবো।

الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِى الْأَرْضِ

এ আয়াত সম্পর্কে তফসীরকারগণ আরও বলেছেনঃ যারা পৃথিবীতে অহংকার করে আমার বন্দাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে এবং আমার আপন বন্দাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং বাতিল ধর্মে বিশ্বাসী হয়, তাদের এ আচরণের কারণে হেদায়েত থেকে তারা মাহরুম হবে। তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ আদেশ সকল কাফেরদের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ج

যদি এ অহংকারীরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যেকটি আয়াত দেখে এবং আল্লাহর নবীকে প্রদত্ত প্রতিটি মোজেযাও দেখে তবুও তারা ঈমান আনবে না।

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ

অর্থাৎ যদি আম্বিয়ায়ে কেরামের সত্য পথ প্রদর্শনের কারণে বা ওলামায়ে কেরামের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সঠিক পথ তাদের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয় তবুও তারা সে পথ অবলম্বন করবে না।

পক্ষান্তরে, যদি তাদের কু-প্রবৃত্তি অথবা ইবলিস শয়তান তাদেরকে মন্দ পথ দেখায় তবে তারা সে পথ গ্রহণ করবে এবং পথভ্রষ্ট হবে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে আর আসমান জমিনে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের যে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে তার প্রতিও দৃষ্টিপাত করেনি এবং আখেরাতে যে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে একথাও তারা অস্বীকার করেছে, তাই তাদের সকল নেক আমল হবে বাতিল।[১]

هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ তারা তাদের কৃতকর্মের ফলই ভোগ করবে তথা যেমন কর্ম তেমন ফল তারা পাবে। আলোচ্য আয়াতে যে আমল বাতিল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা হল সৎ কাজ। কেননা, ঈমান ব্যতীত আখেরাতে কোন সৎ কাজ গ্রহণযোগ্য হবেনা।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, এ শাস্তি তারা কেয়ামতের দিন দেখতে পাবে। তারা যে সব কাজকে সৎ কাজ মনে করে গর্ব করতে, কেয়ামতের দিন দেখবে যে এসব কাজ নিষ্ফল, মূল্যহীন। কেননা, যে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে সে সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হবে। আখেরাতে ঈমানেরই গুরুত্ব হবে সর্বাধিক। ঈমান ব্যতীত আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কোন সৎ কাজই গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৮
২। খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৬
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫৭

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ
بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا
يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا
سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۙ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا
رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ
قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ
أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ
إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي
فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

তরজমা

(১৪৮) আর মূসার জাতি তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা একটি গো-বৎসের মূর্তি গড়ে তুললো যা ছিল গাভীর স্বর বিশিষ্ট, তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, ঐ গো-বৎসের মূর্তিটি তাদের সাথে কথা বলেনা, তাদেরকে পথও দেখায় না এতদসত্ত্বেও তারা তাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করলো। মূলতঃ তারা ছিল পাপিষ্ঠ।

(১৪৯) এবং তারা যখন অনুতপ্ত হলো এবং উপলব্ধি করলো যে, তারা ভুল করেছে তখন তারা বলতে আরম্ভ করে, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমাদেরকে দয়া এবং ক্ষমা না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব।

(১৫০) আর মূসা যখন রাগান্বিত অবস্থায় আক্ষেপ করতঃ তাঁর জাতির নিকট ফিরে আসেন তখন বলেন, আমার অনুপস্থিতকালে তোমরা কত জঘন্য কাজ করেছ, তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশের পূর্বেই কেন তোমরা তাড়াহুড়া করতে গেলে, তিনি ফলকগুলো একদিকে রেখে দেন এবং স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরে নিজের দিকে টেনে আনেন। ভাই বললেন, হে আমার সহদোর! আমাদের স্বজাতির লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে হত্যা করার উপক্রম করেছিল অতএব, আমাকে শত্রুদের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করোনা আর আমাকে পাপিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত করোনা।

(১৫১) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে আশ্রয় দিও, আর তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী রুকুতে বর্ণিত হয়েছে, বনী ইসরাঈল যখন ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত লাভের পর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন একদল লোককে মূর্তি পূজা করতে দেখে তারা বলেছিলো–

اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ

"আমাদের জন্যেও একটি দেবতা তৈরী করুন যেমন তাদের জন্যে রয়েছে দেবতা"। এটি ছিল তাদের মূর্খতাপ্রসূত অন্যায় আবদার। আলোচ্য আয়াতেও বনী ইসরাঈলের এমনি একটি অন্যায় আচরণের উল্লেখ রয়েছে।

হযরত মূসা (আঃ) যখন তৌরাত আনয়নের জন্যে কোহেতূরে গমন করলেন, তখন বনী ইসরাঈলের পৌত্তলিকতা প্রীতি চাঙ্গা হয়ে উঠলো, তারা পথভ্রষ্টতার এক জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। বনী ইসরাঈলের মধ্যে সামেরী নামক এক দুর্বৃত্ত ছিল, সে কিবতীদের থেকে আনা স্বর্ণ দ্বারা একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরী করলো। হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর পদতল থেকে সংরক্ষিত মাটি যখন তার মুখে পুরে দিল তখন এটি জীবন্ত গো-বৎসের ন্যায় চিৎকার শুরু করলো। কান্ডজ্ঞাহীন বনী ইসরাঈল তাকেই তাদের উপাস্য মনে করলো।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরের লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলের এ পথভ্রষ্টতার কথা কোহেতূরে অবস্থান কালেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ হয়ঃ "হে মূসা! তোমার জাতিকে তোমার অনুপস্থিতিতে আমি পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি"। তথা সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।

তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন যে, স্বর্ণ নির্মিত এ গো-বৎসটি কি গোশ্ত ও রক্তের দেহে রূপান্তরিত হয়েছে? অথবা স্বর্ণ নির্মিতই ছিল এবং ঐ অবস্থায় গো-বৎসের মত চিৎকার দিচ্ছিল। যা হোক, যখন গো-বৎসটি চিৎকার দিতে লাগলো তখনই লোকেরা তার চার পাশে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো এবং পরস্পর বলতে লাগলো, এই তো খোদা যে তোমাদেরকে ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছে (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।[১]

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু)-খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৪

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের "কওমে মূসা" বাক্য দ্বারা বনী ইসরাঈলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে مِنْ حُلِيِّهِمْ অর্থাৎ কিবতী সম্প্রদায়ের স্বর্ণালংকার যা বনী ইসরাঈলরা তাদের থেকে বিয়ে-শাদীর উদ্দেশ্যে নিয়েছিল। কিবতীদের নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার পর বনী ইসরাঈল এ স্বর্ণালংকারের মালিক হয়েছিল। এ বাক্য দ্বারা তফসীরকারগণ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কাফেরের সম্পদ যদি মুসলমানের মালিকানায় আসে তবে তার দ্বারা কাফেরের মালিকানা শেষ হয়ে যায়।

তফসীরে মাদারেকের ভাষায়ঃ

فيه دليل على ان الاستيلاء على اموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا

তারা কি দেখেনা? যদি ঐ গো-বৎসটি তাদের সাথে কথা বলতে পারে না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখায় না। এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা আর কি হতে পারে যে, এমন এক প্রাণহীন বস্তুকে তারা তাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে যা তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, বর্ণিত আছে ঐ গো-বৎসটি একবার মাত্র চিৎকার দিয়েছিলে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, সে অনবরত চিৎকার দিচ্ছিল। যখন গো-বৎসটি আওয়াজ দিত তখন হতভাগ্য বনী ইসরাঈল তার সামনে সেজদারত হত, আর যখন সে নীরব হত তখন তারা সেজদা থেকে উঠে দাড়াত। ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ বলেছেন, গো-বৎসটির আওয়াজ ছিল কিন্তু সে নড়াচড়া করতে পারত না। আর সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, তা ছিল স্বর্ণ নির্মিত একটি মূর্তি, তাতে কোন প্রাণ ছিলনা। যখন তার পেটে বাতাস প্রবেশ করতো তখন সে আওয়াজ দিত, তাকে এভাবেই বানানো হয়েছিল।[১]

اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ তারা এমন একটি বস্তুকে উপাস্য মনে করে নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৯

যখন তারা লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হলো এবং উপলব্ধি করলো যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি তুমি আমাদের প্রতি দয়া না কর এবং মাফ না কর তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

অর্থাৎ মূসা (আঃ) যখন কোহেতুর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাদেরকে এ অন্যায় আচরণের জন্যে ভর্ৎসনা করলেন তখন তারা কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত হল এবং এ সত্য উপলব্ধি করল যে, স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, এরপর তারা বলেছে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা কৃত অন্যায় থেকে তওবা করি, আমাদের তওবা কবুল কর, হে পরওয়ারদেগার! যদি আমাদের প্রতি দয়া না কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা না কর তবে আমরা চিরদিনের জন্যে ধ্বংস হয়ে যাব।

পরবর্তী বাক্যে হযরত মূসা (আঃ) তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে যেভাবে তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছেন তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا

এবং যখন মূসা (আঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় তাঁর জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কত জঘন্য অন্যায় কাজ করেছ! স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ আসার পূর্বেই তোমরা তাড়াহুড়া করেছ এবং গো-বৎসের পূজা করে অমার্জনীয় অপরাধ করেছ।

আলোচ্য আয়াতের اسفا শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবু দারদা (রাঃ) "অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায়" আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল "অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ও মর্মাহত হয়ে"। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ 'কামুসে'ও আলোচ্য শব্দটির এ অর্থই পাওয়া যায়।

قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ

এর অর্থ হল তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজ করেছ তথা গো-বৎসের পূজা করেছ। এ বাক্য দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে তাদেরকে যারা গো-বৎসর পূজা করেছিল। অথবা এর অর্থ হল তোমরা আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছ। কেননা, যারা গো-বৎসের পূজা করতে প্রয়াসী হয়েছে তোমরা তাদেরকে বিরত রাখ নাই। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আলোচ্য বাক্যটির দ্বারা সম্বোধন করা হবে হযরত হারুন (আঃ) ও প্রকৃত মোমেনদেরকে। مِنْ بَعْدِىْ অর্থাৎ নিদৃষ্ট সময় আমার কুহ-ই-তুরে গমন করার পর অথবা এর অর্থ হল, তোমরা আমার নিকট থেকে তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের

শিক্ষা পেয়েছ এবং স্বচক্ষে দেখেছ যে আমি মানুষকে শেরক থেকে বিরত রাখি, এরপরও তোমরা এমন কাজে লিপ্ত হয়েছ।[১]

أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ

তোমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নিদৃষ্ট ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাড়াহুড়া করলে এবং এমন অন্যায় কাজ করলে। হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক ৪০ দিন রোজাব্রত পালনের এবং কুহ-ই-তূরে এ'তেকাফরত অবস্থায় অতিবাহিত করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং এরপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসমানী গ্রন্থ প্রদানের কথা ছিল কিন্তু হতভাগারা গো-বৎসের প্রতিমা পূজা শুরু করে দেয়। তাই হযরত মূসা (আঃ) কুহ-ই-তূর থেকে ফিরে এসে তাদের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। বিশেষতঃ তাঁর ভাই হযরত হারুন (আঃ)-এর প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন।

وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ

তাঁর হাতে তৌরাতের যে ফলক ছিল তা একদিকে রেখে দিলেন যেন হাত দ্বারা হারুন (আঃ)-এর চুল ধরতে পারেন। বস্তুতঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর ক্রোধ ছিল আল্লাহর দ্বীনের জন্যে কেননা, বনী ইসরাঈল জাতি তাঁর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর নাফরমান হয়েছিল এবং শেরক ও কুফরী কাজে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের জন্যেই ছিল তাঁর এ ক্রোধ।

এবনে আবি হাতেম সাঈদ এবনে যোবায়েরের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক জবরযদ পাথরের সাতটি ফলকের উপর লিখিত তৌরাত দান করেছিলেন, যার মধ্যে সব কিছুর বিবরণ স্থান পেয়েছিল এবং বনী-ইসরাঈলের জন্যে হেদায়েত ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) কুহ-ই-তূর থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন দেখলেন যে, বনী ইসরাঈল গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে তখন তিনি ভীষণ ভাবে ক্রোধান্বিত হলেন, তাঁর হাত থেকে তৌরাত লিখিত ফলকগুলো সজোরে মাটিতে রেখেছিলেন, ফলে তা সাতভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ পাক তন্মধ্যে ছয় ভাগকে উঠিয়ে নেন, শুধু সপ্তম ভাগ বা খন্ডটি তাঁর নিকট থেকে যায়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ অতীত এবং ভবিষ্যত সম্পর্কীয় গায়বী খবর যে খন্ডগুলোতে ছিল তা উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যে খন্ডে হেদায়েত, বিধি-নিষেধ এবং হালাল-হারামের বিবরণ ছিল তা থেকে যায়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯০-৯১

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, কোন বিষয়ে কোন কথা শ্রবণ করা ও দেখা এক প্রকার হয় না, আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর প্রতি দয়া করে, কুহ-ই-তূরে অবস্থান কালে আল্লাহ পাক তাঁকে বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তখন তাঁর হাত থেকে তৌরাত পড়েনি অথচ যখন স্বচক্ষে বনী ইসরাঈলকে গো-বৎস পূজা করতে দেখলেন তখন তিনি তা সইতে পারলেন না, এত অধিক পরিমাণে রাগান্বিত হলেন যে, হাত থেকে অত্যন্ত রাগান্বিত হওয়ার কারণে ফলকগুলো একদিকে রেখে দিলেন ফলে তা ভেঙে সাত খন্ডে পরিণত হল।[১]

আলোচ্য বাক্যটির এ অর্থও হতে পারে, তোমরা তাড়াহুড়ো করে এ সিদ্ধান্তে এসেছ যে, কুহ-ই-তুরে হয়তো আমার মৃত্যু হয়ে গেছে, এরপর তোমরা এমন অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছ। এরপর তিনি হযরত হারুন (আঃ)-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। কেননা, হযরত মূসা (আঃ) তাঁকে বনী ইসরাঈলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কেন তিনি বনী ইসরাঈলকে এমন অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখলেন না? তাই রাগান্বিত অবস্থায় তাঁর দিকে হাত বাড়াবার নিমিত্ত তৌরাতের ফলকগুলো ক্ষিপ্র গতিতে মাটিতে রেখে দিলেন। এ অবস্থাকে পবিত্র কোরআন وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ। বাক্য দ্বারা বর্ণনা করেছে।

'এলক্বা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোন জিনিস হাত থেকে ফেলে দেয়া। এর দ্বারা এ সন্দেহ হয় যে, হযরত মূসা (আঃ) রাগান্বিত অবস্থায় তৌরাত লিপিবদ্ধ ফলকগুলোকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন। এতে করে তৌরাতের প্রতি বেআদবী হয়েছে যা অত্যন্ত বড় গুনাহ। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম মা'সুম বা নিঃস্পাপ হন। এজন্যে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হল হারুন (আঃ)-কে ধরবার জন্যে তিনি অতি সত্বর তৌরাত রেখে হাতকে অবসর করেছেন। আর রাগান্বিত অবস্থায় অতি দ্রুত এ কাজটি করেছেন তাই মনে হয়েছে তিনি তৌরাত হাত থেকে ফেলে দিয়েছেন। যেহেতু হযরত মূসা (আঃ)-এর এই ক্রোধ ছিল তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের জন্যে তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তাই তাঁর এ কাজের সমালোচনা করা হয় না।[২]

وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ط

হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত দেখে তাদের উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হন। ঐ উত্তেজিত অবস্থায় নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর হাত

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৬-৬৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯১
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৩৪৮

থেকে তৌরাত লিপিবদ্ধ ফলকগুলো পড়ে যায়। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, তিনি নিজেই অত্যন্ত দ্রুত তৌরাতের ফলকগুলো একদিকে রেখে হযরত হারুন (আঃ)-এর চুল দাড়ী ধরে টান দেন কেননা, তাঁর ধারণা ছিল বনী ইসরাঈলের পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে হারুন (আঃ) সঠিকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি। যদি হারুন (আঃ) সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন, হয়তো বনী ইসরাঈল জাতি এই জঘন্য অন্যায় থেকে বিরত থাকতো।

قَالَ ابْنَ أُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ

হযরত হারুন (আঃ) এর জবাবে বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র! আমার সর্বশক্তি দিয়ে আমি চেষ্টা করেছি বনী ইসরাঈলকে এ অন্যায় থেকে রক্ষা করতে কিন্তু তারা আমাকে দুর্বল মনে করেছে এবং তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে এমন উপক্রমও হয়েছিল। আমি এ ব্যাপারে এতটুকুও চেষ্টার ত্রুটি করিনি। অতএব, আপনি যদি আমার প্রতি এ ব্যবহার করেন তবে দুশমন হাসবে, দয়া করে আমাকে দুশমনের সমানে হাস্যাম্পদ করবেন না এবং আমাকে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবেন না।

কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়–

হযরত হারুন (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর সহদোর ভাই ছিলেন, তবুও হারুন (আঃ) তাঁকে 'মায়ের ছেলে' বলে সম্বোধন করেছেন এজন্যে যেন তিনি ভ্রাতৃ-স্নেহকে উদ্বেলিত করে হযরত মূসা (আঃ)-এর ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারেন, যেন মূসা (আঃ)-এর অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি হয়।

اِنَّ الْقَوْمَ

অর্থাৎ যারা গো-বৎসের পূজারী ছিল তারা শুধু যে আমার বাধা মানেনি তাই নয়; বরং আমাকে মেরে ফেলতেও চেয়েছিলো।

فَلَا تُشْمِتْ بِىَ

অতএব, আমার সঙ্গে আপনি এমন ব্যবহার করবেন না যদ্বারা দুশমন খুশি হয় আর উত্তেজিত অবস্থায় আমাকে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবেন না। এখানে জালেম শব্দ দ্বারা গো-বৎসের পূজারীদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) যখন তার ভাই হারুন (আঃ)-এর বক্তব্য শ্রবণ করে উপলব্ধি করলেন যে, এ ব্যাপারে হারুন (আঃ)-এর কোন দোষ নেই তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে এভাবে মুনাজাত করলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِىْ

হে পরওয়ারদেগার! আমার ভাইয়ের সাথে আমি যে আচরণ করেছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর আর গো-বৎসের পূজায় বনী ইসরাঈলকে বাধা দেয়ার ব্যাপারে যদি তার কোন অপরাধ হয়ে থাকে তবে তাকেও মাফ করে দিও এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়াতলে স্থান দিও, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। আয়াতের বর্ণনা দ্বারা একথা বোঝা যায়, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর ভাইয়ের ক্ষমা লাভের জন্যে এ দোয়া করছিলেন, তবে সঙ্গে তিনি নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা, নিয়ম হল কারো জন্যে এস্তেগফার করার পূর্বে নিজের জন্যে এস্তেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থী হতে হয়। যাতে করে নিজেকে অপরাধমুক্ত বা গুনাহ্ থেকে পবিত্র মনে করার সন্দেহ না থাকে। দ্বিতীয়তঃ দোয়া কবুল হওয়ার পথে একটা বড় বাধা হল গুনাহ, এজন্যে নিয়ম হল সর্বপ্রথম নিজের গুনাহর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া। এরপর দোয়া করা। এজন্যেই দেখা যায় জানাযার নামাযের দোয়ায় বলা হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মাফ কর আমাদের জীবিতদের ও মৃতদের। মৃতদের পূর্বেই জীবিতদের উল্লেখ করা হয়েছে। আর যে দোয়া করছে সে জীবিত। তাই সে প্রথমে নিজের জন্যে এবং পরে মৃতদের জন্যে দোয়া করে। ঠিক এমনিভাবে হযরত মূসা (আঃ) প্রথমে নিজের জন্যে ও পরে তাঁর ভাইয়ের জন্যে দোয়া করেন।[১] আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) আল্লাহ পাকের রহমত এবং মাগফেরাতের গুরুত্ব সবার চেয়ে বেশী উপলব্ধি করেন। তাই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল হলেন। এর দ্বারা পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, যদি কারো দ্বারা কোন অন্যায় হয় তবে তার প্রধানতম কর্তব্য হল অনতিবিলম্বে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯২
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫৮

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي
نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾ وَاخْتَارَ
مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ
رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي
مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

তরজমা

(১৫২) নিশ্চয় যারা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে দুনিয়ার জীবনে, তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের গজব ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে। আর এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি তাদেরকে যারা মিথ্যা রচনা করে থাকে।

(১৫৩) আর যারা অন্যায় অসৎ কাজ করেছে এরপর তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।

(১৫৪) আর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হল তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নেন, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্যে তাতে ছিল হেদায়েত এবং রহমত।

(১৫৫) মূসা তার জাতি থেকে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্যে মনোনীত করলো। অতঃপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প আক্রমণ করে তখন মূসা বলে, হে আমার প্রতিপালক। ইচ্ছা করলে তুমি ইতিপূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের জাতির নির্বোধ লোকদের কর্মদোষে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এতো শুধু তোমার পরীক্ষা, যা দ্বারা তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে বিপথগামী কর, আর যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথে রাখ। তুমিই যে আমাদের অভিভাবক। আর তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। বস্তুতঃ তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।

তফসীরুল কোরআন

নিশ্চয় যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে আপতিত হবে তাদের প্রতি গজব এবং লাঞ্ছনা। যারা গো-বৎসের পূজা করেছিলো তারা আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে একে অন্যকে হত্যা করতে বাধ্য হয়, তাদের মধ্যে এমনও লোক ছিল যারা গো-বৎস পূজা করেনি ঠিকই কিন্তু এ অন্যায় কাজে বাধাও দেয়নি তারাও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম দল গো-বৎস পূজার কারণে অপরাধী হয় দ্বিতীয় দল এমন অন্যায় থেকে বিরত রাখার কর্তব্য পালন না করার অপরাধ করে। উভয়েরই শাস্তি হয়। নেমে আসে তাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে গজব। এ অপরাধের শাস্তির কথা ইতিপূর্বে সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।[১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আতীয়্যাহ ইয়াওফী বলেছেন যে, এর দ্বারা প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাদের পূর্ব পুরুষদের অন্যায় আচরণের কথা স্মরণ করে দিয়ে তাদেরকে লজ্জিত করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতে হবে তোমাদের কঠিন কঠোর শাস্তি আর দুনিয়াতেও তোমরা ভোগ করবে লাঞ্ছনা। যেমন মদীনাবাসী ইহুদী গোত্র বনু কোরায়জা ও বনু নযির গোত্রকে পঞ্চম হিজরীতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। তাদের একটি গোত্রের পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় গোত্রকে মদীনা থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الذلة। শব্দটি দ্বারা জিযিয়া বা অমুসলিম করকে বোঝানো হয়েছে।[২]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা শওকানী (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের غضب শব্দটির ব্যাখ্যা হল দুনিয়াতে তারা পরস্পরকে হত্যা করার মাধ্যমে যে শাস্তি ভোগ করেছে, আর আখেরাতে তাদের অপরাধের জন্যে তাদের প্রতি যে আযাব হবে তথা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানকেই غضب শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত الذلة। শব্দটির ব্যাখ্যা হল সেই লাঞ্ছনা যা তাদের অদৃষ্টে আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং যার ঘোষণা রয়েছে পবিত্র কোরআনের এ আয়াতেঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

এবং তাদের উপর অপমান ও দারিদ্র্য নিপতিত হল এবং তারা আল্লাহর কোপগ্রস্ত হল। সূরা বাকারায় ইহুদীদের এ শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে[৩]।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৪-০৭
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৬
তানবীরুল মেকবান মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা ১৩৮
৩। আরও জানতে দ্রঃ নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্টা ৩২৩-২৭

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, তাদের ذلة বা লাঞ্ছনা হল তাদেরকে মদীনা শরীফের উপকণ্ঠ থেকে বহিস্কার করা।[১]

গো-বৎসের নির্মাতা সামেরীর পরিণাম

তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে গো-বৎসের নির্মাতা সামেরীর ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) তাকে আদেশ দিয়েছিলেন সে যেন কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা না করে। তাই সে সারাজীবন মানুষ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয় এবং জীব-জন্তুর সঙ্গেই তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, কোন মানুষ তার কাছেও আসত না। এভাবে হয়েছে আলোচ্য আয়াতের ঘোষণার বাস্তবায়ন।

ইমাম কুরতবী (রঃ) হযরত কা'তাদা (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক সামেরীকে আযাব দিয়েছিলেন, যদি সে কারো গায়ে হাত দিত অথবা কেউ তার দেহ স্পর্শ করতো তবে সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের দেহে জ্বর আসতো।

তফসীরে রুহুল বয়ানে একথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, তার প্রতি যে আযাব হয়েছে তা তার বংশধরদের মাঝেও সংক্রামিত হয়। পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে এভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্যে কঠিন কঠোর শাস্তি।

পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ

আর এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি তাদের, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে থাকে। হযরত সুফিয়ান এবনে উয়াইনা বলেছেনঃ যারা দ্বীনের মধ্যে বেদআত অবলম্বন করে অর্থাৎ যা অধর্ম তাকে ধর্মীয় কাজ মনে করে তথা যে কাজ শরীয়তের বিধান নয় তাকে শরীয়তের বিধান মনে করে; তাদেরও এমনি অপমানজনক শাস্তি হয়। ইমাম মালেক (রহঃ) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন, যারা দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন কথা আবিষ্কার করে তথা বেদআতের প্রচলন করে তাদের জন্যে দুনিয়াতে অপমান ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।[২]

কোন কোন গুনাহর শাস্তি দুনিয়াতে হয়

এতে একথা প্রমাণিত হয়, কোন কোন গুনাহর শাস্তি দুনিয়াতে হয় যেমন, গো-বৎস নির্মাতা এবং গো-বৎসের পূজারীদের হয়েছে।

১। তফসীরে ফতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫০
২। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯২৯

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا

অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতির মধ্যে যারা গো-বৎসের পূজা করেছিল, এরপর তারা সেই নাফরমানীর কাজ থেকে তওবা করে এবং প্রকৃত ঈমান আনে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অন্যকে হত্যা করে (এটিই ছিল তাদের তওবার পন্থা)। আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেন।

اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

কেননা, নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক অতীব দয়াবান, অবশ্য এ ক্ষমা এবং দয়া তারা প্রকৃত তওবা এবং ঈমান আনয়নের পরই লাভ করে।

এ বাক্যটি দ্বারা আল্লাহ পাকের রহমত ও মাগফেরাতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ও নীতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা মন্দ কাজ করার পর তথা নাফরমানীর পর খাঁটি তওবা করে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে ও ঈমানের দাবী পূরণ করে তথা নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদের তওবার পর তাদেরকে মাফ করেন, তাদের গুনাহ যতবড় বা বেশীই হোক না কেন। কেননা, তিনি পরম দয়ালু, তাঁর দয়ামায়া অনন্ত অসীম, যেমন কবি আবু নওয়াস বলেছিলেনঃ

يا رب ان عظمة ذنوبى كثرة= فلقد علمت بان عفوك اعظم

হে পরওয়ারদেগার! যদিও আমার গুনাহ অনেক বেশী এবং অত্যন্ত বড় কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি তোমরা ক্ষমা সর্বশ্রেষ্ঠ।

ان كان لا يرجوك الا محسن = فبمن يلوذ ويستجير المجرم

যদি এমন হয় যে, নেককার ব্যতীত তোমার রহমতের আশা কেউ না করে, তবে যারা গুনাহগার তারা কার আশ্রয় নেবে?

অন্য একজন আরও সুন্দর বলেছেনঃ

انا مذنب انا مخطئ انا عاصى= هو غافر هو راحم هو عافى
قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبن اوصافه اوصافى

আমি গুনাহগার, আমার ভুল অনেক এবং আমি নাফরমান, এ হলো আমার বৈশিষ্ট্য, আর তিনি ক্ষমাশীল, তিনি দয়াবান, তিনি মাফ করে থাকেন, আমার তিন অবস্থার সঙ্গে তাঁর তিনটি গুণের মোকাবেলা করেছি, অচিরেই তাঁর গুণাবলী প্রভাব বিস্তার করবে আমার অবস্থার উপর।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মানুষ যত মন্দ কাজই করুক না কেন এমনকি, যদি শেরক ও কুফরও করে, এরপর খাঁটি তওবা করে, এরপর আল্লাহ পাকের প্রতি প্রকৃত এবং পূর্ণ ঈমান আনে তবে আল্লাহ পাক পূর্বে কৃত গুনাহ মাফ করে দেন। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন, হে আমার বন্দাগণ! তোমরা যারা গুনাহর কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

এখানে একথা প্রনিধানযোগ্য, ক্ষমা করার এ ঘোষণা আখেরাতের ব্যাপারে, দুনিয়াতে ইসলামী শরীয়ত যে অপরাধের জন্যে যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে তা অবশ্যই জারী হবে।

দ্বিতীয়তঃ এ ঘোষণা হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্বের ব্যাপারে, হক্কুল এবাদ বা বন্দার হক্বের ব্যাপারে নয়। কেউ যদি কারো অর্থ সম্পদ আত্মসাত করে, কেউ যদি কারো হক্ব নষ্ট করে তবে হক্বদারকে অবশ্যই তার হক্ব দিতে হবে, কারো আমানত থাকলে তা অবশ্যই আমানতের মালিককে ফেরত দিতে হবে। তৃতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তথা বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা গো-বৎসের পূজা করেছিল তাদের শাস্তি নির্দিষ্ট হয়েছে আত্মনিধন যেমন পবিত্র কোরআনেই এরশাদ হয়েছেঃ

فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তওবা কর নিজেদেরকে হত্যা করে, এ শাস্তি ঘোষণার পর আখেরাতের শাস্তির ব্যাপারে উল্লেখ করেছেনঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ

যে নিজের জুলুমের পর তওবা করে এবং আত্মসংশোধন করে, আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করেন।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ

আর যখন মূসা (আঃ)-এর ক্রোধ প্রশমিত হল অর্থাৎ হযরত হারুন (আঃ) তাঁর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং বনী ইসরাঈল কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করল তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর ক্রোধ প্রশমিত হল, তখন তিনি তৌরাত লিপিবদ্ধ ফলকগুলো তুলে নিলেন, তাতে

ছিল হেদায়েত এবং রহমত সে সব লোকদের জন্যে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আমর এবনে আবিদ্দুনিয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, ফলকগুলো দ্রুত রাখার কারণে ভেঙে গিয়েছিল, এরপর হযরত মূসা (আঃ) পুনরায় ৪০ দিন রোজা রাখলেন, তখন দু'টি ফলকের উপর লিপিবদ্ধ তৌরাত তাঁকে পুনরায় প্রদান হয়।[১]

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ج

বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলে, আমরা আল্লাহ্ পাকের কথা শ্রবণ করতে চাই। সরাসরি আল্লাহ্ পাকের কথা শ্রবণের ব্যবস্থা করা হোক। আমরা শুধু এ অবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনতে পারি। যদি এ ব্যবস্থা না হয় তবে আমরা ঈমান আনবনা। হযরত মূসা (আঃ) তখন বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে সত্তরজন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এরপর তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তূর পর্বতে গমন করেন। বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে এ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমার জাতির মধ্য থেকে সত্তর জন মানুষকে নির্বাচন কর যেন তারা গো-বৎসের মূর্তি পূজার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীদের উপর একটি আবর এসে ছায়া ফেলে এবং তাদেরকে ঘিরে ফেলে, সকলে তখন সেজদারত হয় এবং সকলে শ্রবণ করে যে, আল্লাহ্ পাক মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলছেন। এ কথায় ছিল কিছু বিধি-নিষেধের হেদায়েত, এরপর আবর সরে গেল। যদিও মূসা (আঃ)-এর সাথীরা স্বকর্ণে সরাসরি আল্লাহ্ পাকের কালাম শ্রবণ করে, তবুও সেই মুহূর্তে তারা আল্লাহ্ পাকের দীদারের দাবী উত্থাপন করে। তারা বলে আমাদেরকে সরাসরি আল্লাহ্ পাককে দেখিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে আমরা ঈমান আনবো না। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّٰعِقَةُ

[illegible] হে মূসা! আল্লাহকে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমার প্রতি ঈমান আনবনা। তাদের এ ধৃষ্টতার কারণেই নেমে আসে আল্লাহর গজব। বর্জ নির্ঘোষ তাদেরকে পাকড়াও করে এবং নিচে থেকে শুরু হয় ভূমিকম্প।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ঐ ভূমিকম্পের সময় তারা সকলেই সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় অথবা তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সুদ্দী (রহঃ) এ মত পোষণ করেছেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৪

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে সত্তর জনের উপর বিদ্যুৎ পড়েছিলো তাদের ঘটনা পরে হয়েছে। আর যারা আল্লাহকে না দেখে ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদের ঘটনা পূর্বে ঘটেছিলো। আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-কে আদেশ দিলেন সত্তর জন মানুষকে নির্বাচন করে নিয়ে আস। হযরত মূসা (আঃ) সত্তর জনকে নির্বাচন করে বস্তির বাইরে নিয়ে আসলেন। তখন তারা সমবেতভাবে দোয়া করলেন, দোয়াতে তখন তারা একথাটি বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন কিছু দান কর যা ইতিপূর্বে কাউকে দান করনি আর আমাদের পরেও কাউকে দান করবে না। আল্লাহ পাক তাদের এ আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তাদের প্রতি আপতিত হল বজ্র নির্ঘোষ, এমন অবস্থায় তারা কাঁপতে থাকে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অথবা মৃতের মত পড়ে থাকে। হযরত মূসা (আঃ) এ ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।[১]

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ

যখন তাদেরকে ভূমিকম্প বা বর্জ নির্ঘোষ পাকড়াও করলো তখন মূসা (আঃ) এভাবে দোয়া করলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! যদি আপনি ইচ্ছা করতেন তবে ইতিপূর্বেও তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করতে পারতেন। নিঃসন্দেহে এটি আপনার তরফ থেকে পরীক্ষা কিন্তু আমরা যে অত্যন্ত দুর্বল, এ পরীক্ষায় টিকে থাকার যোগ্যতা যে আমাদের নেই। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র পন্থা হে পরওয়ারদেগার! আপনার সাহায্য। আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করতে পারেন। অর্থাৎ এ কঠিন পরীক্ষায় যে ঈমানের উপর টিকে থাকে সে হেদায়েত লাভ করে। আর যে ঈমানের উপর টিকে না থাকে সে পথভ্রষ্ট হয়।

অথবা এ বাক্যটির অর্থ হল হে পরওয়ারদেগার! আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে ধ্বংস করেন তার পথভ্রষ্টতার কারণে, আর যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন ঈমান আনয়নের তৌফিকের মাধ্যমে।

اَنْتَ وَلِيُّنَا

হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমাদের অভিভাবক, আপনি আমাদের একমাত্র সহায়, আপনার নিকটই আমাদের সকল আশা ভরসা। অতএব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন আর আপনি উত্তম ক্ষমাকারী।

فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৪
তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৭

আল্লামা সুয়ূতি (রহঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, الرجفة। অর্থ ভূমিকম্প। যেহেতু গো-বৎস পূজার সময় গো-বৎসের পূজারীদের থেকে এই লোকেরা আলাদা হয়ে যায়নি তাই তারা ভূমিকম্পে গ্রেফতার হয়। তাদের এ অবস্থা দেখে তাদের প্রতি হযরত মূসা (আঃ)-এর দয়া হয়। তিনি চিন্তিত হন যেন তারা মৃত্যুমুখে পতিত না হয় অথচ তারাই হযরত মূসা (আঃ)-এর সব সৎ কাজে ছিল তাঁর দক্ষিণ হস্ত এবং তাঁর পূর্ণ অনুগত। তাদের করুণ অবস্থা দেখে হযরত মূসা (আঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং আরজ করলেন رَبِّ لَوْ شِئْتَ

হে পরওয়ারদেগার! এ দৃশ্য দেখার পূর্বেই আপনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে এবং আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত করতে পারতেন, এর অর্থ হলো ইচ্ছা করলে আপনি ফেরাউনের হাতেও তাদের জীবনের অবসান ঘটাতে পারতেন অথবা তাদেরকে সাগরে নিমজ্জিত করে মেরে ফেলতে পারতেন কিন্তু আপনি দয়া করেছেন, তাদেরকে রক্ষা করেছেন, ফেরাউন থেকেও রক্ষা করেছেন, সলিল সমাধি থেকেও রক্ষা করেছেন এবং অন্যান্য সকল মুসিবত থেকে তাদেরকে রেহাই দিয়েছেন, এখন যদি পুনরায় তাদের প্রতি দয়া করেন তবে তাও আপনার রহমতে অতি সহজেই সম্ভব।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হল হে পরওয়ারদেগার! আপনি ইচ্ছা করলে কুহ-ই-তূরে আগমনের পূর্বেই আমাদের সম্প্রদায়ের সম্মুখে এদের জীবনাবসান ঘটিয়ে দিতেন এবং সকলেই এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করতো, তখন আমার উপর এ সম্পর্কে কোন অপবাদ আসতো না।

اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ

হে পরওয়ারদেগার! কতিপয় নির্বোধ লোক এরপর দীদারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় আপনি কি আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দেবেন?[১] আল্লামা শওকানী (রহঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটির বর্ণনা ভঙ্গি দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, এর অর্থ হল হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। কেননা, মূসা (আঃ) জানতেন, আল্লাহ পাক একজনের অপরাধে অন্যজনকে শাস্তি প্রদান করেন না। একথাটির দৃষ্টান্ত হল হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথার ন্যায়, তিনি বলেছিলেনঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

হে পরওয়ারদেগার! যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন কেননা তারা আপনার বন্দাই। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে তাও করতে পারেন, কেউ আপনাকে বাধা দিতে পারেনা কেননা, আপনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৪
২। তফসীরে ফতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৮

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ؕ
قَالَ عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ
مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ؗ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ
يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾ ع

তরজামা

(১৫৬) আর আমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারিত কর। আমরা তোমার নিকটই প্রত্যাগমন করেছি। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে থাকি। আর আমার রহমত বস্তু মাত্রের মধ্যেই ব্যাপ্ত রয়েছে। অতএব, আমি রহমত তাদের জন্যেই লিখে দেব যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে এবং যারা (যথা নিয়মে) যাকাত আদায় করে এবং যারা আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে।

(১৫৭) যারা অনুসরণ করে আমার রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর কথা তারা তাদের নিকট তৌরাত ইঞ্জিলে দেখতে পায়, যিনি তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করেন এবং তাদের জন্যে পবিত্র বস্তু সমূহ হালাল এবং অপবিত্র বস্তু সমূহ তাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করেন এবং যিনি তাদেরকে তাদের উপর চাপানো বোঝা এবং শেকল থেকে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল। অতএব, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে সম্মান করে এবং তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই নিঃসন্দেহে সফলকাম।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। প্রথম দোয়া ছিল ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার্থে, বালা-মুসিবত দূরীভূত করার জন্যে আর এ দোয়া হলো উপকৃত হওয়ার জন্যে, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ লাভের জন্যে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে কল্যাণ "লিখে দেয়া" কথাটির তাৎপর্য হল কল্যাণ দান করা, তার জন্যে কাগজে লিখে দেয়া জরুরী নয়।

اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ط

অর্থাৎ আমরা তোমার দিকে মনোনিবেশ করেছি, তোমার নিকট তওবা করেছি।

কাতাদা (রহঃ) এবং এবনে জোরায়েয (রহঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আর মোহাম্মদ এবনে কা'ব বলেছেন যে, এ ব্যক্তিদের অপরাধ ছিল এই, তারা গো-বৎস পূজার সময় পূজারীদের থেকে ভিন্ন হয়ে যায়নি। তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা জরুরী মনে করেনি, বরং তাদের সাথে মিশে মিশেই ছিল।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে هُدْنَا অর্থ تُبْنَا

অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি এবং আমরা তোমার প্রতি বিনীত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেছি।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে যা কিছু সর্বোত্তম এবং যা কিছু সর্বাধিক কল্যাণকর হযরত মূসা (আঃ) তাঁর উম্মতের জন্যে তারই দরখাস্ত করেছেন।

قَالَ عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ

আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর এ আরজীর জবাবে এরশাদ করেছেন, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে আযাব দিয়ে থাকি, আর আমার রহমতও সব কিছুতে প্রসারিত রয়েছে। তবে হে মূসা! তুমি যে বিশেষ রহমতের আবেদন করেছ তা সর্ব সাধারণের জন্যে নয়; বরং বিশেষ রহমত তারাই লাভ করবে যারা পরহেযগারী অবলম্বন করবে, যারা আল্লাহকে ভয় করে চলবে, যারা মন্দ কাজ পরিহার করে জীবন যাপন করবে, যারা আত্মশুদ্ধি লাভ করবে, যারা নিয়মিত যাকাত আদায় করবে তথা আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি অর্থ শুদ্ধিও করবে এবং যারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে।

قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِۦ

অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আমার রহমত সব কিছুতেই সম্প্রসারিত রয়েছে তথা আমার রহমত থেকে কেউ বঞ্চিত নয়। দুনিয়ার এ জীবনে মোমেন হোক কি কাফের সকলেই আল্লাহর রহমত অহরহ লাভ করছে, অবশ্য আখেরাতে কাফেরদের প্রতি রহমত হবে না। কেননা, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তারা আল্লাহর রহমতকে নিজেরাই অস্বীকার করেছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার সমস্ত উম্মতই জান্নাতে যাবে শুধু সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে অস্বীকার করেছে। আরজ করা হল কে অস্বীকার করেছে? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যে আমার অনুসারী হবে সে জান্নাতী হবে আর যে আমার অবাধ্য হবে সে অস্বীকারকারী বলে পরিগণিত হবে। (বোখারী)

আতীয়্যা ইয়াওফি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের রহমত সব কিছুকে ঢেকে রেখেছে কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, রহমত শুধু মোত্তাকী পরহেযগারদের জন্যেই আসে। ঈমানদারদের জন্যেই তা সুনির্দৃষ্ট। যদিও মোমেনদের উসিলায় অন্যরাও সে রহমত ভোগ করে। যেমন মোমেনদের জন্যেই কাফেররা রিয্ক লাভ করে, বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা পায়। এভাবে তারা আল্লাহর রহমত লাভ করতে থাকে। যখন মোমেনগণ আখেরাতে পৌঁছবে তখন রহমত শুধু মোমেনরাই লাভ করবে, কাফেররা বঞ্চিত হবে। এর একটি দৃষ্টান্ত হল যেমন কেউ অন্যের প্রদীপ দ্বারা উপকৃত হয় যখন প্রদীপের মালিক প্রদীপ নিয়ে চলে যায় তখন সে অন্ধকারে পতিত হয়।

فَسَأَكْتُبُهَا

অর্থাৎ হে বনী ইসরাঈল! আখেরাতে তোমার সে সব লোকদের জন্যেই শুধু রহমত লিপিবদ্ধ করবো যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে, যারা কুফর নাফরমানী এবং পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করে। অর্থ-সম্পদের লোভ থেকে তাদের মন হবে পবিত্র। আর এ কারণে তারা যাকাত দিতে দ্বিধাবোধ করবে না এবং তাদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, তারা আমার আয়াত সমূহে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে। একটিকে মানবে আর একটিকে মানবেনা– এমন অবস্থা তাদের হবে না।

হযরত মূসা (আঃ)-এর আরজীর জবাব

হযরত মূসা (আঃ)-এর আরজীর জবাবে আল্লাহ পাক দুটি কথা এরশাদ করেছেনঃ

১. আমার আযাব যাকে ইচ্ছা তাকেই আমি দিয়ে থাকি। এ ব্যাপারে কারো কোন প্রকার আপত্তি করার কিছু নেই। কেননা সবাই আল্লাহ পাকের গোলাম। সবই

তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর এটিই স্বাভাবিক। আরও এরশাদ হয়েছে, আর আমার রহমত সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে, এটি সাধারণ রহমত যা দুনিয়াতে মোমেন কাফের সবাই ভোগ করে। যদি এই রহমত না থাকতো তবে কোন কাফের, কোন মুশরেক, কোন পাপিষ্ঠ জীবিত থাকতনা। এজন্যেই আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

(যদি আল্লাহ পাক মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করতেন তবে পৃথিবীতে একটি প্রাণীও অবশিষ্ট থাকত না) বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও মেহেরবানীতে এত অনাচার অবিচার এবং পাপাচার সত্ত্বেও পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে। এতদ্ব্যতীত, আমাদেরতো অস্তিত্বই ছিল না, আল্লাহ পাক দয়া করেই আমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন, এটি তাঁর সাধারণ রহমত যে, তিনি যার কোন অস্তিত্ব ছিল না তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ

(মানুষের কি এমন সময় ছিলনা যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।)

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক দয়া করেই মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন, লাভ করেছে সে জীবন। এটি সর্বকালের সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান। তাই মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেনঃ

ما نبوديم وتقاضاے ما نبود=لطف تونا گفته مامی شنود

আমরা ছিলাম না এবং এখানে আগমনের কোন আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। হে পরওয়ারদেগার! তোমরা দয়া ও মেহেরবানী আমাদের না বলা কথা শ্রবণ করে থাকে।

এটি ছিল আল্লাহ পাকের সাধারণ রহমত, যার মধ্যে মোমেন কাফের সকলেই অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আল্লাহ পাকের আরেকটি বিশেষ রহমত রয়েছে, যা তাঁর বিশিষ্ট বন্দারাই লাভ করে। তবে এ বিশেষ রহমত লাভের জন্যে তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) তাকওয়া পরহেযগারীর গুণ লাভ করতে হবে। (২) যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মনকে ধন-সম্পদের লোভ থেকে পবিত্র করতে হবে (৩) আল্লাহ পাকের যাবতীয় নিদর্শন সমূহের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যারা এ তিনটি শর্ত পূরণ করবে তারা বিশেষ রহমত লাভে ধন্য হবে।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ

বিশেষ রহমত লাভের আরও একটি শর্ত এই, যারা সেই উম্মী নবীর অনুসরণ করবে যাঁর উল্লেখ তারা তাদের তৌরাত ইঞ্জিলে দেখতে পাবে, যিনি সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করেন এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ রাখেন। প্রতিটি পবিত্র বস্তু তাদের জন্যে হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম ঘোষণা করেন এবং তাদের উপর চাপানো বোঝা এবং শেকল নামিয়ে দেন। অতঃপর যারা তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনে এবং তাঁকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে এবং যে নূর (পবিত্র কোরআন) তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করে, নিঃসন্দেহে তারাই হবে সফলকাম অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতের অধিকারী তারা হবে, যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের অনুসারী হবে। যিনি হবেন নবীয়ে উম্মী।

"উম্মী" নবীর ব্যাখ্যা

"উম্মুন" শব্দের অর্থ মা। যিনি উম্মী তিনি সে অবস্থাতেই রয়েছেন যে অবস্থায় জন্মলগ্নে ছিলেন। অর্থাৎ মাতৃ-গর্ভ থেকে আসার পর কারো নিকট লেখা-পড়া করেননি। কোন মানুষের নিকট আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ছোট করতে চাননি। তাই তাঁকে কারো শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়নি। কিন্তু আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁকে যে এলম দান করেছেন তা পৃথিবীর কাউকে দান করেননি। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اوتيت علم الاولين والاخرين

'আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যত এলম দান করা হয়েছে সবই আমাকে দেয়া হয়েছে'।

যিনি কোন প্রকার সাধনা না করেই সকল জ্ঞান গুণে গুনান্বিত হয়েছেন, কোন মানুষের নিকট লেখাপড়া না করেই যিনি অসাধারণ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী হয়েছেন, যাঁর প্রতিটি কথা এবং কার্য বিবরণী সরক্ষিত হয়েছে, বিশ্বের সকল জ্ঞান পিপাসু তাঁর জ্ঞান আহরণ করে কোন দিন শেষ করতে পারবে না, তিনিই ছিলেন সকল জ্ঞানের উৎস। যাঁর জবান মোবারক থেকে নিঃসৃত মহান বাণী তথা হাদীস শরীফ সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছেন বিশ্বের অগণিত সাধকমন্ডলী, তিনিই যে আমাদের উম্মী নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমরা উম্মী দল লিখতে জানিনা এবং হিসাবও জানিনা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, "উম্মী" শব্দটি "উম্মুল কোরা" থেকে নিষ্পন্ন। মক্কা শরীফের অপর নাম হল উম্মুল কোরা। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মভূমি হল মক্কা শরীফ, এ কারণে তাঁকে উম্মী বলা হয়। এমন অবস্থায় উম্মী শব্দের অর্থ হবে মক্কায় জন্ম গ্রহণকারী।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিকভাবে মক্তব-মাদ্রাসায় লেখাপড়া না করেও সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে জ্ঞান বিতরণ করেছেন। তাই উম্মী হওয়াও তাঁর জন্যে গৌরবের বিষয়। তিনি যে উম্মী নবী হবেন– একথা তৌরাত ইঞ্জিলে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উম্মী শব্দটি উম্মতের সাথে জড়িত। যেহেতু তাঁর উম্মত অনেক বেশী হবে তাই তাঁকে উম্মী নবী বলা হয়। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা সকল নবীর উম্মতের চেয়ে বেশী হবে এবং আমিই সর্ব প্রথম জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করবো। (মুসলিম শরীফ)

এবনে হাব্বান হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক নবীর জন্যে নূরের একটি মিম্বর হবে। আমি সবচেয়ে উঁচু এবং সর্বাধিক নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট হবো। তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবেন, নবী উম্মী কোথায়? আম্বিয়াগণ বলবেন, আমাদের প্রত্যেকেই নবীয়ে উম্মী (অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেরই উম্মত আছে), কার উদ্দেশ্যে বাণী এসেছে? ঘোষক দ্বিতীয়বার ফিরে এসে বলবে নবী উম্মী আরবী কোথায়? তখন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে অবতরণ করবেন এবং বেহেশতের দ্বারে গমন করে করাঘাত করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হবে, কে? জবাব দেয়া হবে মোহাম্মদ এবং আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। জিজ্ঞাসা করা হবে, ডাকা হয়েছে কি? জবাব দেয়া হবে, হ্যাঁ। এরপর বেহেশতের দ্বার উম্মুক্ত করা হবে, আল্লাহ পাক তাঁর তাজাল্লী বিকীরণ করবেন। তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেজদায় পড়ে যাবেন, এভাবে আল্লাহর হামদ বর্ণনা করবেন যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। তখন হুকুম হবে মাথা উত্তোলন করুন, সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

এই হাদীস দ্বারা জানা যায়, উম্মী 'উম্মত' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এজন্যে প্রত্যেক নবী নিজেকে উম্মী বলেছেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষতঃ উম্মী নবী বলা হয় এজন্যে যে, তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্য সকল নবীর উম্মত থেকে হবে অধিকতর।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নয়টি গুণের উল্লেখ করেছেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৮-৯৯

(এক) তিনি হলেন রসূল, যাঁকে আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছেন।

(দুই) তিনি হলেন নবী, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে যাঁর মর্তবা সর্বোচ্চে।

(তিন) তিনি হলেন উম্মী। তিনি কোন মানুষের নিকট লেখাপড়া শেখেননি অথচ তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

(চার) তৌরাত, ইঞ্জিলে তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে ঃ

الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا

অর্থাৎ- তৌরাত এবং ইঞ্জিল গ্রন্থে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য তোমরা দেখতে পাবে।

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আসবে তাদের কর্তব্য হবে তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। কেননা, তৌরাত ইঞ্জিলে তাঁর গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এজন্যেই ইহুদী ও নাসারাদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) সহ অনেকেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং বলেছেন, তিনিই সেই নবী যাঁর সম্পর্কে তৌরাত ইঞ্জিলে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

আর এ কারণেই আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছেন। রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াস যদিও ঈমান আনেনি কিন্তু একথা স্বীকার করেছে যে, তিনিই সেই নবী, যাঁর উল্লেখ রয়েছে তৌরাত এবং ইঞ্জিলে। বিখ্যাত সুফী সাধক মাওলানা রুমী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

بود در انجیل نام مصطفےٰ= وان سر پیغمبران بحر طفا

بود ذکر حلیها و شکل او= بود ذکرغز و صوم واکل او

طائف نصرا نیسان بهر ثواب=چون رسیدندے بدان نام وخطاب

بوسه داد ندے بدان نام شریف= رونها دندے بدان وصف لطیف

ইঞ্জিল গ্রন্থে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকের উল্লেখ ছিল, যিনি নবী রসূলগণের দলপতি।

তাঁর হুলিয়া এবং আকৃতি মোবারকের বিবরণও ছিল এবং তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ, রোজা পালন ও পানাহারের কথাও ছিল। নাসারাদের একদল যখন সেই নাম মোবারক দেখতে পেল তখন সওয়াবের আশায় ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে নাম মোবারকে চুম্বন করল।

পরবর্তীতে এক জালেম বাদশাহ খৃষ্টানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছিল কিন্তু যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকের চুম্বন করেছিল,

আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জালেম রাজার অকথ্য জুলুম থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই মাওলানা রুমী (রঃ) লিখেছেনঃ

اندرین فتنة که گفتم ان گروه = ایمن از فتنة بود ندوانه شکو

অর্থাৎ ঐ দলকে আল্লাহ্ পাক জালেম বাদশাহর ফেতনা থেকে রক্ষা করেছেন।

امن از شر ایران ووزیر= در پناه نام احمد ومستجیر

আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জালেম বাদশাহর জুলুম থেকে নিরাপদে রেখেছেন এবং 'আহমদ' নামের বরকতে আশ্রয় দিয়েছেন। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করার পর মাওলানা রুমী (রঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ

نام احمد چون چنین یارے کند = تاکه نور ش چون مددگارے کند

যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক এত উপকারী হতে পারে তবে তাঁর নূর মানুষের জন্যে কত বড় সাহায্যকারী হতে পারে!

(পাঁচ) يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থাৎ তিনি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন ঃ "সৎ কাজের আদেশ" বাক্যটির মধ্যে দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে–

(ক) আল্লাহ্ পাকের আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ও তা পালন করা।

(খ) মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা। এর মধ্যে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং সত্যকে সু-প্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

(ছয়) وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

তিনি মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবেন। যদিও এ দু'টি গুণ প্রত্যেক নবীরই ছিল কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে এ দু'টি গুণ পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়। তিনি এ পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন।

আল্লামা শওকানী (রঃ) লিখেছেনঃ এ দু'টি গুণের মধ্যে চরিত্র মাধুর্যের যাবতীয় গুণাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন ঃ

بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

'চরিত্র মাধুর্যের পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি'।

(সাত) وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ

অর্থাৎ তিনি মানুষের জন্যে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন বস্তু সমূহকে হালাল ঘোষণা করবেন।

মানুষ স্বভাবগতভাবে যে বস্তু সমূহকে ঘৃণা করেনা; বরং তা দ্বারা উপকৃত হয় এবং স্বাদ পায় এমন বস্তু সমূহকে তিনি হালাল ঘোষণা করবেন।

(আট) وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ

তিনি মন্দ, ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় বস্তু সমূহকে হারাম ঘোষণা করবেন।

যা মানুষের স্বভাব পছন্দ করেনা এবং যা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হয় এমন বস্তু সমূহকে তিনি হারাম ঘোষণা করবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আতা (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এর অর্থ হল মৃত জন্তু এবং রক্ত আর অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এতে শুকর, মদ এবং জুয়ার আমদানী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(নয়) وَيَضَعُ عَنْهُمْ

অর্থাৎ ইহুদীরা যেসব কঠিন নির্দেশ পালনে বাধ্য ছিল এবং তাদের অন্যায় আচরণের কারণে তাদের প্রতি যে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা সহজ করে দিয়েছেন। তাদের জন্যে ঐ কঠিন বিধি-নিষেধগুলো বোঝার মত ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, তারা যদি কোন গুনাহ করত তবে তার তওবা ছিল আত্মনিধন তথা পরস্পরকে হত্যা করা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়তে এ আদেশ বাতিল হয়েছে এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে এমন অন্যায় না করার সংকল্প করা তথা খাঁটি তওবা করা যথেষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এমনিভাবে যদি ইহুদীদের পোষাক নাপাক হত তবে কাঁচি দ্বারা ঐ নাপাক অংশটি কেটে ফেলতে হত কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়তে নাপাক অংশটুকু পানি দ্বারা ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্র করার বিধান পেশ করা হয়েছে।

এমনিভাবে তৌরাতে এ আদেশ ছিল যে, শনিবার দিন কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবেনা তথা এদিন সর্ব প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়, ইসলামী শরীয়ত এ আদেশকে বাতিল করে। তৌরাতে এ আদেশ ছিল যে, মসজিদ তথা এবাদতের নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত নামায আদায় করা যাবেনা। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌজন্যে আল্লাহ পাক সারা পৃথিবীর যে কোন স্থানে দন্ডামান হয়ে

নামায আদায় করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এমনিভাবে বনী ইসরাঈলদের জন্যে পানি ব্যতীত পবিত্রতা অর্জনের কোন পন্থা ছিলনা, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়তে পানি না পাওয়া গেলে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[১]

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নয়টি গুণাবলীর উল্লেখের পর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ

অর্থাৎ "যারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনবে"। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইহুদীদের প্রতি। কেননা, হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কেই দোয়া করছিলেন আর তারই জবাবে আল্লাহ পাক যা এরশাদ করেছেন তার বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, তৌরাত ও ইঞ্জিলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এরপর যারা তাঁর যুগ পাবে তারা যদি তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর তাযীম করে এবং তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন তার শিক্ষা মেনে চলে তবে তারাই হবে সফলকাম।

জীবনের সাফল্য কোন্ পথে?

আলোচ্য আয়াতে জীবন সাধনায় সাফল্য লাভের জন্যে চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে—

১. হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

৩. তাঁকে সাহায্য করা।

৪. পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে গ্রহণ ও অনুসরণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, عزروه শব্দটির অর্থ তাঁর তাযীম করা, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

মূলকথা হল, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত রাখবে, তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করবে, তাঁর দুশমনদের মোকাবেলায় তাঁকে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৩-২৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৯-৪১

সাহায্য করবে আর একথা সর্বজনবিদিত যে, তাঁর প্রতি প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান থাকলেই এসব গুণাবলী অর্জিত হতে পারে। যাদের এ অবস্থা হবে, তারাই জীবন-সাধনায় সাফল্যমন্ডিত হবে।

এখানে উল্লেখ্য, তাঁর জীবদ্দশায় এই সাহায্য তাঁর সঙ্গে সম্পর্কীয় ছিল এবং তাঁর ইন্তেকালের পর এ সাহায্য হতে হবে তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত বা জীবন বিধানের জন্যে তথা ইসলামের জন্যে সাহায্য করতে হবে।

পবিত্র কোরআন হলো নূর

আলোচ্য আয়াতে কোরআনে করীমকে "নূর" বলা হয়েছে। এর কারণ এই, নূর তথা আলোর আলো হওয়ার জন্যে কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। নূর নিজেই তার প্রমাণ। ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআন যে আল্লাহ পাকের কালাম তার জন্যেও কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই; বরং পবিত্র কোরআন নিজেই তার প্রমাণ। কেননা পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, নূর বা আলো শুধু নিজেই আলো নয়; বরং অন্যকেও সে আলোকিত করে তথা অন্ধকারকে সে দূরীভূত করে, ঠিক এমনিভাবে পবিত্র কোরআনও গোমরাহীর অন্ধকারকে দূরীভূত করে।

পবিত্র কোরআনের সাথে সুন্নতে রসূলের অনুসরণও জরুরী

এ আয়াতের প্রারম্ভে এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ

অর্থাৎ যারা এই উম্মী নবীর অনুসরণ করে। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ

অর্থাৎ- যারা পবিত্র কোরআনকে অনুসরণ করে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সার্বিক কল্যাণ এবং নাজাত লাভের জন্যে যেমন পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা মেনে চলতে হবে ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের অনুসরণও করতে হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান, তা'যীম এবং মহব্বত অবশ্য কর্তব্য

আলোচ্য আয়াতে عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ বাক্যের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ তথা তাঁর বিধি-নিষেধ পালনই যথেষ্ট নয় যেমন দুনিয়াতে শাসনকর্তাদের বিধি-নিষেধ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পালন করা হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে পূর্ণ ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, তাঁর প্রতি আন্তরিক মহব্বতের সঙ্গে। অর্থাৎ মানব অন্তরে তাঁর প্রতি এত মহব্বত এবং ভক্তি শ্রদ্ধা থাকতে হবে যার কারণে তাঁর অনুকরণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর না থাকে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার কারণে তাঁর বিশেষ শান এবং অবস্থা রয়েছে। তিনি সকলের প্রিয় রসূল আর উম্মত হল তাঁর প্রেমিক। তাই তাঁর প্রতি মহব্বত পোষণ করা একান্ত কর্তব্য যেমন, বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে ঃ

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه..... الحديث

তোমাদের মধ্যে কেউ সে পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হবে না যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা মাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলের চেয়ে সর্বাধিক প্রিয় না হই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব

এমনিভাবে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব রক্ষার নিমিত্ত এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই যেন তাঁর দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলা না হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

হে মোমেনগণ! তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলো না, এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তা'যীম ও সম্মান প্রদর্শন করার আদেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তা'যীম

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ

অর্থাৎ– তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহর রসূলের তা'যীম কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর।

সতর্কবাণী

এমনকি, এ পর্যায়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যদি তাঁর প্রতি আদব তা'যীম রক্ষার নির্দেশ পালনে কোন প্রকার ত্রুটি হয় তবে তোমাদের জীবনের যাবতীয় সৎ কর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তথা বাতিল বলে গণ্য হবে। পবিত্র কোরআনের সূরা হুজুরাতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রসূলকে এভাবে ডাক দিয়োনা যেভাবে তোমরা একে অন্যকে ডাক দিয়ে থাক। এতে তোমাদের যাবতীয় সৎ কাজ বাতিল হয়ে যাবে অথচ তোমরা কিছুই জানতে পারবে না।

আর এ কারণেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে কোন কথা বলার সময় অত্যন্ত অনুচ্চস্বরে বলতেন। হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ পৃথিবীতে আমার নিকট হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় কেউ ছিলনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমার অবস্থা এই, আমি কোন দিন তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে পারিনি। যদি কেউ আমার নিকট তাঁর হুলিয়া মোবারক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে আমি তা বর্ণনা করতে সক্ষম হব না। কেননা আমি কোন দিন তাঁকে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারিনি।

ইমাম তিরমিজী হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ যখন সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হত তখন সকলেই নীচের দিকে নজর রেখে বসতেন। শুধু হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর দিকে নজর করতেন এবং তিনি তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে মুচকি হাসতেন।

মক্কার কোরায়শরা ওরওয়া এবনে মাসুদ নামক এক ব্যক্তিকে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্যে গোয়েন্দা হিসেবে মদীনায় প্রেরণ করে। সে ফেরত এসে যে রিপোর্ট পেশ করে তা এই, আমি রোমক সম্রাট এবং পারস্য সম্রাটের দরবার দেখেছি কিন্তু আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে অবস্থা দেখেছি তা আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা এই যে, তোমরা কখনও তাঁর মোকাবেলায় সফল হবে না।

হযরত মুগীরা এবনে শো'বা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যখন তিনি তাঁর ঘরে অবস্থান করতেন তখন সাহাবায়ে কেরাম বাইরে থেকে তাঁকে ডাক দেয়া

বেয়াদবী মনে করতেন। এমনকি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের পরও সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। এমনকি, কেউ যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করতো তবে সাহাবায়ে কেরাম ভীত হতেন এবং ক্রন্দন করতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের এই তা'যীমের কারণেই তাঁরা উচ্চ মর্তবার অধিকারী হয়েছেন।[১]

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ
فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ
وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ
وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾ وَقَطَّعْنَٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَآ
إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنۢبَجَسَتْ
مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ
ٱلْغَمَٰمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ۚ
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

তরজমা

(১৫৮) (হে রসূল!) বলুন, হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট সেই আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূল যিনি আসমান ও জীমীনের সত্ত্বাধিকারী, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। অতএব, তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন, আর তাঁর সেই রসূলের প্রতি ঈমান আন যিনি উম্মী নবী, যিনি স্বয়ং আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর যাবতীয় কথায় বিশ্বাস করেন, আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা সরল সঠিক পথ লাভ কর।

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৪৫-৪৮

(১৫৯) এবং মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন দল রয়েছে যারা সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং সেই অনুসারে ন্যায় বিচার করে।

(১৬০) আর আমি তাদেরকে দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তাঁর নিকট পানির জন্যে আবেদন করলো তখন আমি নির্দেশ প্রদান করি, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর, ফলে পাথর থেকে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হল। প্রত্যেকটি দল পানির ঘাট চিনে নিল আর আমি তাদের উপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া বিস্তার করেছিলাম এবং তাদের জন্যে আমি অবতরণ করি মান্না ও সালওয়া। তাদেরকে বলি, আমি তোমাদেরকে যে উত্তম রিয্ক দান করেছি তোমরা তা আহার কর। প্রকৃতপক্ষে তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি কিন্তু নিজেদের প্রতিই তারা জুলুম করেছিল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদ ছিল। আর একথা ঘোষণা করা হয়েছিলো, বিশেষ রহমত শুধু সেই পরহেযগার লোকদের জন্যেই যারা উম্মী নবীর অনুসারী যাঁর আবির্ভাব হবে শেষ যুগে। আর আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে, উম্মী নবীর আগমন হবে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে। তিনি বিশেষ কোন দেশ, কাল এবং জাতির জন্যে আগমন করবেন না; বরং তাঁর আবির্ভাব হবে সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে। তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর অনুকরণ করা সারা বিশ্বের সকল মানুষের কর্তব্য হবে। যারা আহলে কিতাব তথা ইহুদী এবং নাসারা তারা যদি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে ধন্য হতে চায় তবে তাদেরকে অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। আর এ আয়াত দ্বারা একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, তৌরাত এবং ইঞ্জিলে তাঁর এ গুণের উল্লেখ রয়েছে যে তিনি উম্মী নবী হবেন। কিন্তু তিনি শুধু উম্মীদের জন্যে প্রেরিত হবেন না; বরং তাঁর আবির্ভাব হবে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে, যেমন মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ইহুদী বা নাসারা আমার খবর পেয়েও আমার প্রতি ঈমান আনবেনা সে দোযখে যাবে।

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ– (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত হয়েছি। পূর্বকালে বিশেষ দল বা জাতির জন্যে নবী প্রেরিত হতেন কিন্তু আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত হয়েছি।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক আমাকে এমন কয়েকটি বিষয় দান করেছেন যা আর কোন নবীকে দান করেননি।

১. প্রত্যেক নবী তাঁর বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হতেন কিন্তু আমাকে সাদা কালো তথা আরব-আজম সবার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।

২. আমার নিকট নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ আমার পর আর কোন লোককে নবুওয়্যত দান করা হবে না। শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন। কিন্তু আমার ছয়শ' বছর পূর্বে তাঁকে নবুওয়্যত প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ এবার তিনি নবী হিসেবে আসবেন না, বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আসবেন। অতএব, তাঁর আগমন খতমে নবুওয়্যতের বিরোধী কোন বিষয় নয়।

৩. আমাকে শাফাআতের মাকাম দান করা হয়েছে। কেয়ামতের দিন পূর্বাপর সকলের জন্য আমি শাফাআত করবো।

৪. আমার জন্য গণিমত তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে, আমার পূর্বে কোন নবীর জন্যে গনিমতের মাল হালাল করা হয়নি।

৫. সারা পৃথিবী আমার জন্যে পবিত্র এবং নামাযের স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানেই নামাযের সময় হোক সেখানেই আমার উম্মত নামায পড়তে পারবে।

৬. আল্লাহ পাক এক মাসের দূরত্বে অবস্থানকারী দুশমনের অন্তরে আমার ভয় সৃষ্টি করে দেন, অর্থাৎ যে-পথ অতিক্রম করতে এক মাস সময় অতিবাহিত হয় দুশমন যদি এত দূরেও অবস্থান করে তবুও আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে আমার ভয় সৃষ্টি করে দেন।

৭. আমাকে "জাওয়ামেউল কালেম" দান করা হয়েছে অর্থাৎ এমন বাক্য সমূহ যা আকারে ছোট হবে কিন্তু তার অর্থ হবে অত্যন্ত ব্যাপক। বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, আমার আবির্ভাব বিশ্ববাসীর জন্যে, আমি সেই আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূল হিসেবে তোমাদের সকলের নিকট আগমন করেছি, যাঁর মালিকানায় রয়েছে আসমান জমীন তথা সমগ্র বিশ্ব যাঁর কর্তৃত্বাধীন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।

يُحْيٖ وَيُمِيْتُ

তিনিই মানুষকে জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ

তাই তোমরা এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো যিনি নবী এবং যিনি স্বয়ং এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর যাবতীয় কথার উপর ঈমান আনেন আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, হয়তো তোমরা হেদায়েত লাভ করবে অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত হেদায়েত লাভ করা সম্ভব নয় আর হেদায়েত লাভ না করলে তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী না হলে নাজাত লাভের কথা চিন্তাও করা যায় না।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু সমগ্র মানব জাতির জন্যেই প্রেরিত হননি, বরং জ্বীন জাতির জন্যেরও তিনি প্রেরিত হয়েছেন আর অন্যান্য নবীগণে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন।[১]

এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি কথা প্রমাণিত হয়-

১. নবীর কর্তব্য হল নবুওয়্যতের দাবী করা এবং নবুওয়্যতের কথা প্রকাশ করা কেননা, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে قل শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ আয়াতের বক্তব্য প্রকাশ কর।

২. প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত সমগ্র মানব ও জ্বীন জাতির জন্যে কিন্তু শুধু তাঁর যুগের মানুষের জন্যেই নয়, বরং কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে- সবার জন্যে তিনি নবী হিসেবে আগমন করেছেন। কেননা جميعا শব্দটি একথার প্রমাণ বহন করে।

৩. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোন মানুষের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি, এ ব্যাপারে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁকে আল্লাহ্ পাকই পূর্বাপর সকল জ্ঞান দান করেছেন এবং সর্বাধিক জ্ঞান দান করেছেন। النبى الامى শব্দ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

৪. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণ ব্যতীত হেদায়েত এবং নাজাত লাভ করা সম্ভব নয়। واتبعوه বাক্যটি দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

৫. যিনি সমাজের সংস্কারক বা পথ প্রদর্শক, ওয়ায়েজ বা পীর মুর্শেদ হবেন, তাঁর কর্তব্য হবে নিজে শরীয়তের বিধানের উপর আমল করা। الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ বাক্য দ্বারা এ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০৩

৬. আয়াতের শুরুতে যেভাবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালাতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আসমান জমীনের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক, যিনি রসূল, তিনি সমগ্র বিশ্বের রসূল। আয়াতের বর্ণনা শৈলী এদিকেই ইঙ্গিত করে।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াত দ্বারা এ ঐতিহাসিক সত্যই বিশ্ব মানবের সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র ক্ষমতা, নিরংকুশ আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। সবই তাঁর সৃষ্টি, সবই তাঁর অনুগত। আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়ে কেউ রেহাই পেতে পারে না, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি বিশ্ব প্রতিপালক। আলোচ্য আয়াতে এর পাশাপাশি এ সত্যও ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রাচ্য-প্রতীচ্য, আরব-অনারব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির নিকট রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। সাদা- কালো, ধনী-দরিদ, সকলেই তাঁর উম্মত। তাঁর নবুওয়্যত বিশ্বজনীন, তিনি বিশ্বনবী, তাঁকে অস্বীকার করে, তাঁর অনুসরণ না করে কেউ সত্য পথ পেতে পারে না। হেদায়েতের পথ শুধু তাঁরই পথ, নাজাত এবং মুক্তির পথ শুধু তাঁর পথ। যে তাঁকে অস্বীকার করল সে পথভ্রষ্ট হল, তাঁকে অস্বীকার করলে সকল নবীগণকে অস্বীকার করা হয়। তাঁর প্রতি ঈমান আনলে সকল নবীর প্রতি ঈমান আনা হয় আর শুধু ঈমান আনা যথেষ্ট নয়, বরং তাঁর অনুসরণ করাও একান্ত করনীয় কাজ। তাই পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে।

প্রথমে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে এভাবে-

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ

অর্থাৎ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর পাকের প্রতি এবং আল্লাহ পাকের সেই রসূলের প্রতি যিনি উম্মী নবী, যিনি নিজেও আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর বিধান সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

(আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে সাথে) তাঁর অনুসরণও কর। অতএব, ঈমান এবং এতায়াত- এ দু'টি পালনের মাধ্যমেই হয়তো তোমরা হেদায়েত লাভ করবে। এ দু'টি কর্তব্য পালনের শুভ পরিণতি স্বরূপই হেদায়েত লাভ

১। খোলাসাতুততাফাসীর খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৪

হবে। এর মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে আকেরটিকে গ্রহণ করা যথেষ্ট হবে না। যদি কোন ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে কিন্তু তিনি যে শরীয়ত পেশ করেছেন তা মানেনা, তাহলে চিন্তা এবং আকীদার দিক থেকে সে হেদায়েতে প্রাপ্ত হবে কিন্তু আমলের দিক থেকে সে পথভ্রষ্ট হবে।[১]

খাতেমুন নাবিয়্যীন

তফসীরকারগণ এ আয়াত দ্বারা খতমে নবুওয়্যতের বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষে আসবে, সবার জন্যেই আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না, এর কোন প্রয়োজনও হবে না, তাই তিনি খাতেমুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী। তিনি যে জীবন বিধান বিশ্ব মানবের সম্মুখে পেশ করেছেন তা পূর্ণ পরিণত, যুক্তিসংগত, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত এবং সকল দেশ ও পরিবেশের জন্যে এবং সর্বকালীন মানুষের জন্যে সমভাবে উপযোগী এবং প্রযোজ্য। মানব জাতির জীবন-সাধনার পরম সাফল্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের সঠিক বাস্তবায়নের মাঝেই রয়েছে নিহিত। বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক মুহূর্তে আরাফাতের ময়দানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত জীবন বিধান তথা ইসলামের পরিপূর্ণতার কথা এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজকের দিনে আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্যে জীবন বিধানকে এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে জীবন বিধান রূপে পছন্দ করলাম"।

দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতার এ ঘোষণা হলো প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের ঠিক ৮০ দিন পূর্বে। এ ঐতিহাসিক ঘোষণার পর আর কোন নবীর নবুওয়্যতের আদৌ কোন প্রয়োজন থাকে না। এজন্যেই বাতিল ফেরকা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী না মানে তারা ইসলামের দাবী করলেও তারা মুসলমান থাকে না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মসনদে আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে তাবুকের যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১০৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৩

ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে মশগুল ছিলেন। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম আশঙ্কা করলেন যে, দুশমনরা হয়তো এমন সময় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আক্রমণ করবে। এজন্যে তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পাশে একত্রিত হলেন। তিনি নামায সুম্পন্ন হওয়ার পর এরশাদ করলেনঃ আজ রাতে আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোর নবী রসূলকে দান করা হয়নি। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে একটি ছিল এই, তিনি বলেছেন আমার নবুওয়্যত সর্বকালের সর্বপ্রকার মানুষের জন্যে। এই হাদীসে বর্ণিত আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আর তা হল, আল্লাহ পাক প্রত্যেক রসূলকে একটি দোয়ার অনুমতি দিয়েছেন যা অবশ্যই কবুল হবে। প্রত্যেক নবী দুনিয়াতেই, সেই দোয়া করেছেন যা কবুল হয়েছে এবং তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমাকেও বলা হয়েছে যে, আমিও যেন কোন দোয়া করি, কিন্তু আমি আমার এ দোয়া আখেরাতের জন্যে সংরক্ষণ করেছি আর সে দোয়া হবে তোমাদের জন্যে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেবে তথা তৌহিদে বিশ্বাসী হবে তাদের জন্যে।[১] এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে সকলের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই আল্লাহর প্রেরিত রসূল। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর অনুসরণ সকলেরই কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন নাজাত লাভের পূর্বশর্ত।

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

যদিও ইহুদীরা ইসলামের বিরোধীতায় অত্যন্ত তৎপর ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে সব গুণাবলীর উল্লেখ তৌরাতে করা হয়েছে তারা সেগুলো গোপন রাখার অপচেষ্টা করেছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যেই কিছু ভাগ্যবান লোক ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ "এবং মূসার সম্প্রদায়েও এমন একদল লোক রয়েছে যারা সত্যের পথ দেখায় এবং সে অনুসারেই ন্যায়বিচার কায়েম করে"।

অর্থাৎ তারা মানুষকে সত্য কথার হেদায়েত করে এবং পরস্পরের মধ্যে সুবিচার কায়েম করে।

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৫১

এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে যে, "তারা সত্যের দিকে মানুষকে হেদায়েত করেন" তাদের সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে লিখেছেনঃ কোন কোন তফসীরকারের মতে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম কবুল করেছেন যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং এবনে সুরিয়া প্রমুখ, তাঁদের কথাই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকারের মতে, যাদের কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তারা পূর্বকালে এসেছিলেন। বনী ইসরাঈলের এ সত্য-সন্ধানী লোকেরা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঠিক অনুসারী ছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রদত্ত শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করেছেন। যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন হল তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন।

সুদ্দী (রঃ) এবং তফসীরকারগণের একদল এ মত পোষণ করেন, বনী ইসরাঈল যখন আল্লাহর নাফরমান হল এবং আম্বিয়ায়ে কেরামকে হত্যা করল তখন তাদের মধ্যে বারটি দলের মধ্যে একটি দল এসব অন্যায় থেকে বিরত রইল এবং তারা আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজী পেশ করল যেন তিনি তাদেরকে জালেমদের থেকে নাজাত দেন।

আল্লাহ পাক তাদেরকে নাজাত দিলেন। পৃথিবীর দ্বার তাদের জন্যে উম্মুক্ত করে দিলেন। তারা তাদের দেশ থেকে সফর করে পৃথিবীর পূর্ব দিকে গমন করল এমনকি, চীন থেকেও দূরে চলে গেল। সেখানে তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বীনের অনুসরণ করতে থাকল।

তফসীরকারগণের একদল এ মত পোষণ করেছেন যে, অবশেষে তারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়েছেন, কা'বা শরীফকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, শনিবারের স্থলে শুক্রবারকে পবিত্র দিন হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তারা পরস্পর জুলুম করেনা, একে অন্যকে হিংসা করেনা।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, যাহ্যাক, কালবী এবং রবী (রহঃ)-এর বর্ণনা হল যে দলের কথা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তারা পৃথিবীর সম্পূর্ণ পূর্ব অংশে চীন থেকেও দূরে আওরাক নামক সাগরের তীরে অবস্থান করে। তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই, তাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিও নেই যে তার কাছে ধন-সম্পদ আছে এবং তার সাথীর কাছে নেই, সেখানে প্রত্যহ রাতে বৃষ্টি হয়, দিনে আকাশ পরিস্কার থাকে। তারা কৃষি কাজ করে, সেখানে কেউ যেতে পারে না,

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৩১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৫

তারা সকলেই সত্য দ্বীনের অনুসারী। বর্ণিত আছে যে, শবে মে'রাজে জীব্রাঈল (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তাদের সেখানে গমন করেছিলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা যাঁর সাথে কথা বলছো তাঁকে কি তোমরা চেন? তারা বললো, না।

জিব্রাঈল (আঃ) তখন বললেন, ইনিই হলেন সর্বশেষ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, একথা শ্রবণ করে তারা সবাই তাঁর প্রতি ঈমান আনলো এবং আরজ করলো, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! হযরত মূসা (আঃ) ওসীয়ত করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পাবে সে যেন তাঁকে আমার সালাম দেয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা (আঃ)-এর সালামের জবাব দিলেন এবং তাদেরকে মক্কায় অবতীর্ণ দশটি সূরা শিক্ষা দিলেন এবং এ আদেশও দিলেন যে, তারা যেন নিজের স্থানেই বাস করে। তারা শনিবার দিন এবাদত করতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শুক্রবার দিন এবাদত করার নির্দেশ দিলেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ বর্ণনাকে "দুর্বল" আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যারা এ বর্ণনাকে সত্য বলেছেন তারা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, এ পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। আমেরিকার মত এত বড় দেশ সম্পর্কে বিশ্ববাসী আড়াইশ' বছর আগে কিছুই জানতো না। যাদের সম্পর্কে উপরোক্ত বর্ণনা রয়েছে এবং যে স্থানে তারা বাস করে হয়তো তা এখনও মানব জাতি আবিস্কার করতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীতে যে আবিস্কার হবে না এমনও নয়। তাই এ বর্ণনার সত্যতায় সন্দিহান হওয়ার কোন যুক্তি নেই।[১]

ইমাম কুরতবী (রঃ) এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ ঘটনাকে বিস্ময়কর বলে মন্তব্য করেছেন। বিভিন্ন তফসীর গ্রন্থে এ ঘটনার আরো বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। শবে মে'রাজে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের নিকট ওজন করার কোন ব্যবস্থা আছে কি? এখানে তোমাদের জীবন ধারণের কি ব্যবস্থা? তারা বললো, আমরা জমীনে বীজ বপন করি, যখন ফসল হয় তখন আমরা সেখানেই সমস্ত ফসল একত্রিত করি এবং প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন মোতাবেক ফসল নিয়ে আসি। ওজন করার বা মাপ দেয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা আরজ করলেন, না কেননা যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে তবে সঙ্গে

১। তফসীরে মাযহারী ..., পৃষ্ঠা-৪০৫
খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৫

সঙ্গে একটি অগ্নি এসে তাকে জ্বালিয়ে ফেলে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সকলের বাসস্থান একই প্রকার কেন? তারা জবাব দিল, যেন কেউ কারো উপর দম্ভ প্রকাশ করার সুযোগ না পায়। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীর সম্মুখে কবর কেন খুঁড়ে রেখেছ? তারা বললে, যেন মৃত্যুর কথা সর্বদা স্মরণ থাকে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মে'রাজের সফরের শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

এ ঘটনার বিবরণ তফসীরে রুহুল মাআনীতেও সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লামা আলুসী (রহঃ) এবনে জরীর ও এবনে জোরায়েযের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন।[১]

আল্লামা শওকানী (রহঃ) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে সামেরী এবং তার সঙ্গীদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে গো-বৎসের পূজা করেছে, তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ে কিছু ভাল লোকও ছিল, যারা মানুষকে হেদায়েতের দিকে তথা সত্যের দিকে আহ্বান জানাতো এবং মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করার সময় ন্যায় বিচার করতো। আল্লামা শওকানী লিখেছেনঃ বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে যাঁরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করেছেন তাদের কথাই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

وَقَطَّعْنَٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ

বনী ইসরাঈলের জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং সুনিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে বারটি দলে বিভক্ত করা হয়। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

আমি তাদেরকে বারটি দলে বিভক্ত করেছি, প্রত্যেক দলের জন্যে একজন করে প্রধান বা দলপতি নিযুক্ত করা হয়, এ দলপতিরাই তাদের অধীনস্থ লোকদের প্রতি নজর রাখতেন। কোন প্রকার প্রয়োজন হলে তাদের এসলাহ বা সংশোধন করতেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (রহঃ) লিখেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বারজন সন্তান ছিল, প্রত্যেক সন্তানের বংশধরদেরকে "সেবত" বলা হয়। তাঁর বারজন সন্তান অনুসারেই বনী ইসরাঈলকে বারটি দলে বিভক্ত করা হয়। জুযাজ (রঃ) বলেছেন, আয়াতের অর্থ হল আমি বনী ইসরাঈলকে বারটি দলে বিভক্ত করেছি।[৩]

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৫৪
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৮৪
তফসীরে ফাহহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৫
৩। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০৫

আল্লামা আলুসী (রহঃ) লিখেছেন, বার দলে বিভক্ত করার কারণ হল পরস্পরের মধ্যে যেন পার্থক্য প্রকাশিত হয়, যেমন আরবদের মধ্যে কবীলা বা গোত্র হিসেবে পার্থক্য ছিল।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ

আর আমি মূসার নিকট ওহী প্রেরণ করলাম। যখন তার সম্প্রদায় তাকে পানির জন্যে বললো, আমি নির্দেশ দিলাম তোমার লাঠি দিয়ে এ পাথরে আঘাত কর। ঐ নিদৃষ্ট পাথরে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমতে ঐ পাথর থেকে বারটি নির্ঝর বের হল। প্রত্যেক ব্যক্তি বা দল তার পানি পান করার স্থান চিনে নিল এবং ছয় লক্ষ মানুষের জন্যে পানির ব্যবস্থা হল।[১]

وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰىؕ

আর আমি দান করি তাদের উপর মেঘের ছায়া এবং তাদের জন্যে অবতরণ করি মান্না সালওয়া। আমি তাদেরকে বলি তোমাদেরকে যে উত্তম রিয্‌ক দান করেছি তা তোমরা আহার কর। আর তারা আমার অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য হয়ে আমার কোন ক্ষতি করেনি; বরং নিজেদের প্রতিই জলুম করেছিল। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে প্রদত্ত তাঁর দুটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. ময়দানে তীহে যখন রৌদ্রের প্রখর তাপে তাদের চরম কষ্ট হচ্ছিল, তখন আল্লাহ্ পাক আবর দ্বারা তাদেরকে ছায়া দান করেছিলেন।

২. আল্লাহ্ পাক তাঁর অদৃশ্য ভান্ডার থেকে তাদের জন্যে রিয্‌ক হিসেবে অবতরণ করেন মান্না সালওয়া।[২]

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৩-২১
২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১১-১২

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا
هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾ وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ
كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ
يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

তরজমা

(১৬১) আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তাদেরকে বলা হয় এ শহরে তোমরা বসবাস কর আর যেখান থেকে ইচ্ছা আহার কর এবং বল 'ক্ষমা চাই' এবং মাথা নত করে শহরে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করব। আমি নেককারদের জন্যে আমার দান বৃদ্ধি করব।

(১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা পাপিষ্ঠ ছিল তারা ঐ কথা পরিবর্তন করলো এমন কথা দ্বারা যা তাদেরকে বলতে বলা হয়নি। তাই আমি আসমান থেকে তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করি কেননা, তারা সীমালজ্ঘন করেছিল।

(১৬৩) আর তাদেরকে সমুদ্র সৈকতে বসবাসকারীদের কথা জিজ্ঞাসা কর, তারা শনিবার দিন সীমালজ্ঘন করত, যখন শনিবার দিন মাছ তাদের নিকট পানিতে ভেসে আসত, অথচ যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করত না, সেদিন মাছেরা তাদের নিকট আসত না। এভাবেই তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। কেননা, তারা অবাধ্য হয়েছিলো।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তা সূরা বাকারাতেও সংকলিত হয়েছে। তবে সূরা বাকারার আয়াতে আর এ আয়াতের ভাষায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

১. সূরা বাকারায় এরশাদ হয়েছে ঃ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

"স্মরণ কর সে সময়কে যখন আমি বলেছিলাম তোমরা এ শহরে প্রবেশ কর"। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

অর্থাৎ– স্মরণ কর সে সময়কে যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলো এ শহরে বসবাস কর।

২. সূরা বাকারার আয়াতে রয়েছেঃ فَكُلُوْا

আর এ আয়াতে রয়েছে ঃ وَكُلُوْا

৩. সূরা বাকারাতে রয়েছঃ رغدا

আর আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি নেই।

৪. সূরা বাকারাতে ছিল ঃ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ

আর আলোচ্য আয়াতে এ শব্দগুলো আগে পরে পরিবর্তন করা হয়েছে।

৫. সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ

আর এ আয়াতে واو অক্ষরটি বাদ দেয়া হয়েছে।

৬. সূরা বাকারায় বলা হয়েছেঃ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

আর এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

৭. সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ

যদিও এ বাক্যগুলো কাছাকাছি অর্থেই ব্যবহৃত এবং এর মধ্যে পরস্পর কোন বিশেষ পার্থক্য নেই তবুও ভিন্ন ভিন্ন শব্দ চয়নের যে উপকারিতা থাকে তা বিদ্যমান রয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে বায়তুল মোকাদ্দাসে মতান্তরে আরীহা শহরে প্রবেশের এবং বসবাস করার আদেশ দিয়েছিলেন। সেখানে আমালেকা জাতি বাস করেছিলো। তাদের সাথে জেহাদ করার আদেশও হয়েছিলো বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি। তাদেরকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা প্রবেশের সময় "হেত্তাতুন" (ক্ষমা চাই) বলবে। কিন্তু তারা প্রবেশের সময় হেত্তাতুন এর পরিবর্তে "হেন্তাতুন"(গম চাই) বললো।

তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিলো নত শিরে সেজদারত অবস্থায় যেন তারা ঐ শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা এ আদেশও অমান্য করলো। পরিণামে নেমে আসলো তাদের উপর আসমানী আযাব। এ আযাব ছিল প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব। এ আযাবের কারণে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে বনী ইসরাঈল জাতির সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু হয়।[১]

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۝

এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, তাদের উপর এ আযাব জুলুম-অত্যাচার, অবাধ্যতা, নাফরমানী তথা তাদের অন্যায় আচরণের কারণেই এসেছে।

এ ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবকে এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, এ পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা জাতি আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হবে, যখন তারা নাফরমানীর ব্যাপারে চরম পর্যায়ে পৌছবে তখন বিশ্ব-প্রতিপালকের তরফ থেকে নেমে আসবে তাদের প্রতি কঠোর শাস্তি। পূর্বকালের ঘটনা স্বরূপ পবিত্র কোরআন ফেরাউন, নমরূদ, শাদ্দাদের ঘটনা উল্লেখ করেছে।

আয়াতের আলোকে আজকের পৃথিবী

আমরা আলোচ্য আয়াতের আলোকে আজকের পৃথিবীর প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি তবে কি দেখতে পাই? আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে সমাজতন্ত্র প্রলয়ংকরী বন্যার মত হাযির হল। পৃথিবীর একটি বিরাট অংশকে পদানত করে বসলো। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এমনকি বাক স্বাধীনতা পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নেয়া হল। কোটি কোটি মানুষকে নির্যাতীত অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমগ্র মানব জাতির জন্যে এক বিভীষিকায় পরিণত হল।

কিন্তু আজ সত্তর বছর পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যাদের নিকট মানুষের জীবন, সম্পদ, ধর্ম বিশ্বাস এবং বাক স্বাধীনতার মূল্য ছিলনা তারা আজ বিদায় নিয়েছে, বিদায় নিয়েছে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের মরফিয়া পান করে যারা বেহুশ অবস্থায় যুগের পর যুগ অতিবাহিত করেছে বর্তমানে তাদের হুশ বহাল হতে দেখা যাচ্ছে। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তারা মুক্ত বিশ্বের দিকে। নিঃসন্দেহে এটি এক বিপ্লব, যাকে নীরব বিপ্লব বলা যেতে পারে। এভাবেই পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটে যুগে যুগে, বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে আর তা ঘটে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এবং মর্জিতে। তাই আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন ঃ

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৩১৩-৩১৬

بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ

তারা যে জুলুম করেছিলো তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তারা ভোগ করেছে।

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বনী ইসরাঈল জাতির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির পূর্ব পুরুষদের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল একথা বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী এবং অবাধ্যতা বনী ইসরাঈল তথা ইহুদীদের মজ্জাগত। তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং অবাধ্যতা তারা তাদের পূর্ব পুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছে। সেজন্যে যুগে যুগে তারা তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তিও ভোগ করেছে। তাদেরকে বানর এবং শুকরে পরিণত হতে হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী এবং অবাধ্যতার শাস্তি চির অপরিহার্য। আল্লাহ্ পাককে ফাঁকি দেয়া যায় না। মানুষের কোন কাজই ছোট হোক বা বড় তাঁর নিকট গোপন নেই। বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালনে শুধু অবহেলাই করেনি; বরং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশকে অমান্য করেছে। আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তা হলো এই, লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত “আইলা” নগরীতে এক দল বনী ইসরাঈল বাস করতো। মাদীয়ান এবং তূর পর্বতের মধ্যস্থলে এ স্থানটি অবস্থিত। তাদের পেশা ছিল মাছ শিকার। তাদেরকে শনিবার দিন মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু তারা সে নিষেধ অমান্য করে, তাদেরকে পরীক্ষা করার নিমিত্তে শনিবার দিনই মাছ ভেসে উঠত, তাদের হাতের নাগালে চলে আসতো। অথচ অন্যদিন মাছ কাছেও আসতো না। তারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলো। আর এজন্যে একটি কৌশল অবলম্বন করলো এভাবে যে, যেখানে মাছের সমাগম হত তার কাছাকাছি একটি জলাধার তৈরী করলো এবং সাগরের সঙ্গে তার যোগাযোগ করে দিল। শনিবারে যখন মাছ ভেসে উঠত এবং জলাধারে মাছ প্রবেশ করলে তারা তার মুখ বন্ধ করে দিত। পরের দিন ঐ মাছ ধরে আনতো। এভাবে আল্লাহর বিধান অমান্য করার কৌশল আবিষ্কার করলো। এ আইলাবাসীর শাস্তির হয়েছে অত্যন্ত কঠোর। তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়েছে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ বনী ইসরাঈলের যেসব লোক শনিবারের নির্দেশ সম্পর্কে নাফরমানী করেছিল তাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে, শয়তান

১। আইলাবাসীর পরিণাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৯-৪৩

হয়তো তাদের অন্তরে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, আল্লাহ্ পাক শবিবার দিন মাছ শিকার করা নিষেধ করেননি, বরং মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। এজন্যে তারা শনিবারে মাছ শিকার করে। অথবা শয়তান তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করেছে, শনিবারে মাছ শিকার নিষিদ্ধ হয়েছে, শনিবারে মাছ শিকার করব না তবে তাদের তৈরী জলাধারগুলোতে মাছ যেতে পারে তার ব্যবস্থা করে এবং রবিবারে ধরে নিয়ে আসে। এ কৌশলের মাধ্যমে তাদের অপরাধ শুরু হয়। কিছুদিন পর তাদের আস্পর্ধা বেড়ে যায় এবং তারা শনিবারেও মাছ ধরা শুরু করে শুধু তাই নয়, বরং ক্রয়-বিক্রয় শুরু করে এবং শনিবার দিন তাদের খাবারে মাছ রাখতে তারা আর ইতস্ততঃ করতো না। আইলাবাসীর এক তৃতীয়াংশ এ অপরাধে শরীক হয়।[১]

আল্লামা শওকানী (রঃ) লিখেছেনঃ তফসীরকারগণের মতে, আইলাবাসী বনী ইসরাঈল তিনভাগে বিভক্ত হয়।

(এক) যারা এ অপরাধে লিপ্ত ছিল।

(দুই) যারা এ অপরাধ করেনি কিন্তু অপরাধীদেরকে বাধাও দেয়নি এবং তাদের থেকে দূরেও সরে যায়নি।

(তিন) যারা এ অপরাধ করেনি; বরং অপরাধীদেরকে বাধা দিয়েছে এমনকি, অবশেষে তাদের থেকে আল্লাহর গজবের ভয়ে দূরে সরে পড়েছে। অপরাধীদের মাঝে এবং তাদের বাড়ী-ঘরের মাঝে দেয়াল দিয়েছে এবং তাদের সাথে ওঠা-বসা বন্ধ করে দিয়েছে।[২]

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ
اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ
عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০৮
২। তফসীরে ফতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৭

তরজমা

(১৬৪) আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তাদের একদল বলেছিলো, আল্লাহ পাক যাদেরকে ধ্বংস করবেন অথবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাদেরকে উপদেশ কেন দাও? তারা বলে তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে দায়িত্ব পালনের কৈফিয়ত দেয়ার জন্যে, হয়তো তারা সতর্কতা অবলম্বন করবে এই আশায়।

(১৬৫) তবুও যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো যখন তারা তা ভুলে গেল তখন আমি নাজাত দিলাম সে সব লোককে যারা তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট ছিল, আর পাপিষ্ঠদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করি। তারা যখন নিষিদ্ধ কার্য দম্ভ সহকারে করতে থাকে তখন আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হও।

তফসীরুল কোরআন

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ

সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন বনী ইসরাঈলের একদল অন্য দলকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আপনারা এমন সম্প্রদায়কে কেন উপদেশ দেন যাদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দেবেন। অর্থাৎ যারা অন্যায় কাজ করতো না কিন্তু অন্যায়ে বাধাও দিতনা তারা বলত, এদের নসিহত করে কি লাভ?

مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ

আপনারা এমন সম্প্রদায়কে কেন উপদেশ দেন যাদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দেবেন।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ যেহেতু তারা জানত যে, এ পৃথিবীতে যারাই আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়, অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি আযাব নাযিল করেন। একথার ভিত্তিতেই তারা বলেছে যে, যারা শনিবার সম্পর্কে সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং আল্লাহর বিধান অমান্য করে মৎস্য শিকার করে, তাদেরকে অবশেষে আল্লাহ পাক ধ্বংস করবেন। অথবা তাদের জন্যে আসবে কঠোর শাস্তি। এক কথায় তাদের শাস্তি অবধারিত। এমন অবস্থায় আপনারা তাদেরকে নসীহত কেন করছেন? এরাতো উপদেশ শুনবেনা, তাদের সর্বনাশ অনিবার্য, তারা কি আর আমাদের উপদেশ মেনে চলবে? আর এ উপদেশে লাভ কি?

قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ۝

এর জবাবে উপদেশ দাতারা বললো, আমরা উপদেশ দিচ্ছি মহান প্রতিপালকের দরবারে কর্তব্য পালনের কৈফিয়ত দেয়ার জন্যে, আর হয়তো তারা আমাদের

নসীহতের কারণে অন্যায় আচরণ থেকে বিরতও হতে পারে (আমরা নিরাশ নই)। অর্থাৎ তারা দু'টি কথা বলে ঃ

১. তোমাদের কথা ঠিক যে, এ অপরাধীরা আমাদের উপদেশ মানবেনা, কিন্তু একথাও সত্য যে, তাদের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, আমাদের উপদেশ তারা গ্রহণ করুক বা না করুক কিন্তু আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করেই যেতে হবে। তারা আমাদের কথা মানেনা, এ অজুহাতে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত হতে পারিনা। যদি তা করি তবে আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের অপরাধী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমরা আমাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাদেরকে নসীহত করি যেন একথা বলতে পারি যে, আমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমরা এতটুকু গাফলত করিনি। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছি।

২. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ভবিষ্যতে কি হবে তা আমরা জানিনা, এমনও তো হতে পারে যে, আমাদের নসীহতের কারণে অবশেষে তারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করতেও পারে।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ

যখন অপরাধীরা সকল উপদেশ উপেক্ষা করে অন্যায় অনাচারে লিপ্তই রইল, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে পাকড়াও করলেন, তাদের অন্যায় আচরণের কারণে তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলেন। যে কাজ থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল তারা তা থেকে বিরত হল না, তাই আমি আদেশ দিলাম যে, তোমরা বানরে পরিণত হয়ে যাও। আর যারা এ অন্যায় কাজ থেকে তাদেরকে বাধা দিয়েছিল তাদেরকে আমি নাজাত দিলাম।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর শাগরেদ একরামা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে

اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ

সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, অন্যায় অনাচারকে যারা বাধা দেবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে নাজাত দেবেন। আর যারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হবে তাদের শাস্তি হবে। কিন্তু যারা মন্দ কাজ থেকে বিরত রয়েছে এবং নীরবতা পালন করেছে তাদেরকে নাজাত দেয়া হবে কি-না তা সুস্পষ্ট ভাষায় এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একথা শ্রবণ করে একরামা (রঃ) আরজ করেন, "হযরত! আপনার প্রতি আমার জান কোরবান, আপনি লক্ষ্য করেননি যারা অপরাধ করেনি এবং নীরবতা পালন করেছে তথা দ্বিতীয় দল, তারা অপরাধীদের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে তাদের ঘৃণা এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এবং অপরাধীদের কাজকে মন্দ এবং নিন্দনীয় সাব্যস্ত করেছে আর যারা তাদেরকে উপদেশ দান করেছিলেন তাদেরকে বলেছে, এ অপরাধীদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করবেন, এ অপরাধই তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। অতএব, তাদেরকে নছিহত কেন করছেন? এ দলের সম্পর্কে যদিও আল্লাহ পাক একথা বলেননি যে, আমি তাদেরকে নাজাত দিয়েছি কিন্তু একথাও বলেননি যে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি। একরামা (রঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আমার একথাটি অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং আমাকে পুরস্কার স্বরূপ দু'টি চাদর প্রদান করেন এবং বলেন, যারা অন্যায় থেকে বিরত রয়েছে এবং নীরবতা পালন করেছে তারাও নাজাত পেয়েছে।[১](হাকেম)

ইয়ামান এবনে রোবাব বলেছেনঃ দু'টি দলই নাজাত পেয়েছে। অর্থাৎ যারা অন্যায় অনাচারে বাধা দিয়েছে, আর যারা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রয়েছে, তারা নাজাত পেয়েছে। আর যারা শনিবারে মৎস্য শিকার করেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে বানরে পরিণত করে ধ্বংস করেছেন। হযরত হাসান বসরী এবং মুজাহেদ (রঃ) এ মতই পোষণ করেন।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেনঃ যারা অপরাধ থেকে মানুষকে বাধা দিয়েছেন শুধু তারাই নাজাত পেয়েছেন। আর অবশিষ্ট দু' দলই ধ্বংস হয়েছে। কেননা, অন্যায় থেকে বাধা দেয়ার কর্তব্য পালনের প্রতি আলোচ্য আয়াতে বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন তিনি ক্রন্দন করতেন। তিনি একথাও বলতেন যে, যারা অপরাধীদেরকে বাধা দেয়নি, তারাও ধ্বংস হয়েছে। ইতিপূর্বে একরামা (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা পরবর্তী কালের অভিমত।

ইমাম রাজী (রঃ) একথাও বলেছেন, যারা অপরাধীদেরকে উপদেশ দেয়নি, শুধু নিজেরা অন্যায় থেকে বিরত রয়েছে তারা উপদেশ প্রদান না করার অপরাধ করেছে। এরপর তিনি এর জবাব দিয়েছেন, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা একটি অবশ্য কর্তব্য কাজ। তবে তা কেফায়াহ অর্থাৎ কিছু লোক এ দায়িত্ব পালন করলে সবার তরফ থেকে সে দায়িত্ব পালন করা হয়, আর তারা যে নসীহত করেনি তার কারণ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০৯

হতে পারে এই, তাদের মতে এদেরকে নসীহত করলে কোন লাভ হবে না। তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ

'তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও'।

আল্লাহ পাক সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর নীতি ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা হল এই, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন 'হও' আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতাংশেও আইলাবাসী অপরাধীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও'। তাই সঙ্গে সঙ্গে বানরে পরিণত হয়। তাদের পুরুষগুলো নর বানরে এবং স্ত্রীরা মাদী বানরে পরিণত হয়।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা শৈলী দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে নাফরমানীর কারণে কোন কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা এবং মন্দ আচরণ থেকে বিরত হয়নি, তাই তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করা হয়।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ নেককার লোকদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বলেছিলেন, তোমরা কেন এ হতভাগাদেরকে উপদেশ দান কর কেননা, তারা মনে করত এই দুবৃত্তদেরকে উপদেশ দান করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তখন তাদের কথার জবাবে উপদেশ দানকারীগণ বলেন, আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের ওজর হিসেবে পেশ করার জন্য তাদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকি যেন উপদেশ না দেয়ার অপরাধ আমাদের উপর না বর্তায়।

অথবা এর ব্যাখ্যা হল এই, যারা শনিবারে মৎস্য শিকার করার ব্যাপারে অপরাধীদের নসীহত করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং নসীহত করা থেকে বিরত হয়েছিলেন, তারা একে অন্যকে বললেনঃ আর এদেরকে নসীহত করে কি হবে? কেন এদেরকে নসীহত করছো?

তখন তারা বললেন, আল্লাহ পাকের দরবারে কর্তব্য পালনের আরজী পেশ করার জন্যে এ মর্মে যে, আমরা তাদেরকে উপদেশ দিয়েছি এবং অন্যায় থেকে তাদেরকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৩৯-৪০

বর্ণিত আছে যে, উপদেশ প্রদানকারীগণ যখন শনিবারের ব্যাপারে সীমা লজ্ঞনকারীদের হেদায়েত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তারা অপরাধীদের সাথে বসবাস করা অনুচিত মনে করলেন। বস্তিকে তারা ভাগ করে নিলেন। মুসলমানদের এলাকার প্রবেশদ্বার ভিন্ন করা হল এবং পাপিষ্ঠদের প্রবেশদ্বার ভিন্ন হল। দু'দলের মধ্যখানে একটি দেয়াল দিয়ে দেয়া হল।

হযরত দাউদ (আঃ) পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে বদদোয়া করলেন। একদিন সকালে নেককারগণ লক্ষ্য করলেন, পাপিষ্ঠদের এলাকা থেকে কেউ বের হচ্ছে না, তখন তারা প্রমাদ গুণলেন। তারা বললেন, হয়তো আজ রাতে তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়েছে। তাই তাদের এলাকায় গিয়ে দেখলেন, সকলেই বানরে পরিণত হয়েছে। এরা তাদের আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারে না। কিন্তু বানররা তাদেরকে চিনতে পেরেছে এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট এসে তারা ক্রন্দন করতে থাকে, তখন নেককার আত্মীয়-স্বজন তাদেরকে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে নসীহত করিনি? তোমাদেরকে বারে বারে মৎস্য শিকারে আমরা কি বাধা দেইনি? তখন তারা মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়। তিন দিন পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকে। লোকেরা এসে তাদেরকে দেখত, এরপর তাদের মৃত্যু হয়।[১]

আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি কথা

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। আলোচ্য ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা সত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তারাই নাজাত পেয়েছেন। অপরাধীরা তাদের নসীহত গ্রহণ করুক বা না করুক নসীহতকারীগণের শুভ-পরিণতি অনিবার্য। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

এবং নসীহত কর কেননা, নসীহত মোমেনদের জন্যে উপকারী হয়। বর্তমান যুগে যারা মন্দ এবং নিন্দনীয় কাজ দেখেও নসীহত বা উপদেশ প্রদান থেকে বিরত থাকে তাদের জন্যে এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ শিক্ষা। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ পাকের কোন নাফরমানী হতে দেখলে প্রধান কর্তব্য হল এমন অন্যায় কাজ থেকে নিজে বিরত থাকা। এরপর প্রথম কাজ হল সর্বশক্তি দিয়ে সে অন্যায় কাজে বাধা দেয়া।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১০

দ্বিতীয় কাজ হল শক্তি প্রয়োগে অপারগ হলে মৌখিক প্রতিবাদ করা এবং পাপিষ্ঠদেরকে উপদেশ দেয়া।

তৃতীয় কাজ হল– অন্যায় কাজকে মন্দ জানা, তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক জালেমদের ধ্বংসের কথা এবং অন্যায় অনাচারে বাধাদানকারীদের নাজাতের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যারা এ পর্যায়ে নীরবতা পালন করেছেন আল্লাহ্ পাকও তাদের ব্যাপারে নীরব রয়েছেন তথা তাদের ব্যাপারে কোন কথা ঘোষণা করেননি। তাদের আযাব বা নাজাতের কোন কথাই ঘোষণা করা হয়নি, কেননা, আযাব বা নাজাত মানুষের কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হয়। সৎ কাজ করলে তার পরিণতি হবে শুভ, আর মন্দ কাজ করলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। কিন্তু যারা নীরবতা পালন করেছে তাদের প্রশংসাও করা হয়নি এবং তাদের শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়নি। এজন্যে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে কোন কথা ঘোষণা করেননি, তাই আদব হল আমাদেরও এ সম্পর্কে কোন কথা না বলা। অবশ্য এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার মন্তব্য করেছেন যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

ইমাম কুরতবী (রঃ) এ পর্যায়ে দলিল সহ তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

যারা জালেম তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি, এতে একথা বোঝা যায়, যারা পাপীষ্ঠ তাদেরই শাস্তি হয়েছে। কিন্তু যারা পাপকার্যে শরীক হয়নি তবে নীরব রয়েছে, আর যারা পাপ কার্যে শরীক হয়নি এবং পাপীদেরকে বাধা দিয়েছে উভয় দলই নাজাত পেয়েছে[১] (আল্লাহ পাকই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী)।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫১
তফসীরে কুরতবী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০৭।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ
يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿۱۶۷﴾ وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ
دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۶۸﴾
فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا
الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ
اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۹﴾ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا
نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۷۰﴾ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ
وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

তরজমা

(১৬৭) আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমার প্রতিপালক এই ঘোষণা করেছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত তিনি ইহুদীদের উপর এমন ব্যক্তি প্রেরণ করতে থাকবেন যে, তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তি প্রদানে দ্রুত। আর নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১৬৮) আর আমি তাদেরকে পৃথিবীতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেই। তাদের মধ্যে কিছু নেককার লোক রয়েছে আর কিছু লোক ভিন্নরূপ, আর আমি তাদেরকে ভাল এবং মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করি যেন তারা ফিরে আসে।

(১৬৯) এরপর তাদের অযোগ্য পরবর্তীরা আসে, তারা এই কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়। তারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে, পুনরায় যদি তাদের নিকট অনুরূপ সম্পদ আসে তবে তা-ও তারা গ্রহণ করে, কিতাবের মধ্যে কি তাদের এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি? যে তারা

আল্লাহ পাক সম্পর্কে সত্য ব্যতীত কিছুই বলবে না আর তাতে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে তাতো তারা পাঠও করে, যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসস্থলই উত্তম, তোমরা কি এ সত্য উপলব্ধি কর না?

(১৭০) যারা কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং নামাযকে কায়েম করে (তাদের সাধনা ব্যর্থ হবে না)। নিশ্চয় আমি নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করি না।

(১৭১) আর স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন আমি তাদের উপরে পর্বতকে উত্তোলন করি চাঁদোয়ার ন্যায়, আর তারা আশঙ্কা করে যে তা তাদের উপর পড়বে। (আদেশ করলাম) আমি যা কিছু দান করেছি তা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর আর তাতে যা কিছু আছে স্মরণ কর, হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ইহুদীদের অন্যায় আচরণ এবং দুর্নীতির বিবরণ ছিল এবং ইহুদীদের একটি বিশেষ দলের অপমানজনক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করা হয়। আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের বেঈমানী এবং দুষ্কৃতির শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ কেয়ামত পর্যন্ত তাদের লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তথা তারা চির অভিশপ্ত জাতি বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে।[১]

ইহুদীদের চির শাস্তির ঘোষণা

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ط

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) تَاَذَّنَ শব্দটির অর্থ করেছেন قَالَ অর্থাৎ স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আল্লাহ পাক বলেছেন। আর মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল اَمَرَ এবং আতা (রঃ) বলেছেন حَكَم অর্থাৎ যখন আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন। আর سوء العذاب অর্থ হল হত্যা করা, বন্দী করা এবং তাদের থেকে জিযিয়া তথা অমুসলিম কর আদায় করা প্রভৃতি।

আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আপনার প্রতিপালক ইহুদীদের সম্পর্কে এই ঘোষণা করেছেন যে, তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে, আল্লাহ পাক তাদের উপর এমন দুর্ধর্ষ এবং দুর্জয় শক্তিকে বসিয়ে দেবেন যারা সর্বদা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে থাকবে। যদি তারা তৌরাতে বর্ণিত বিধান মোতাবেক জীবন

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৩
তফসীরে কবীর খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৪১

যাপন না করে তবে তাদের প্রতি বর্ণনাতীত উৎপীড়ন ও নির্যাতন হতে থাকবে তাদেরকে একথা আল্লাহ্ পাক বহু পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তারা সতর্ক হয়নি, অন্যায় আচরণ বন্ধ করেনি, পরিণামে আল্লাহ্ পাকের এ ঘোষণা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক সর্ব প্রথম হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে তাদের উপর ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু হতভাগা ইহুদী জাতি সীমালঙ্ঘন করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি; বরং তারা তাদের অন্যায়-অনাচার, দুষ্কৃতি এবং বেঈমানী অব্যাহত রাখে, তাই তাদের উপর নেমে আসে আসমানী গজব এবং জমীনি বালা-মুসিবত যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে।

"বখতে নসর" কঠিন শাস্তির প্রতীক হিসেবে তাদের উপর চেপে বসেছিলো, সে তাদের বাড়ি-ঘর ভেঙে দিয়েছিলো, তাদের যুবকদের হত্যা করেছিলো, তাদের স্ত্রীলোকদের বাঁদী ও গোলাম বানিয়ে ছিল, হত্যাকাণ্ড থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলো, তাদের উপর কর আরোপ করেছিলো। এরপর "জালুত" তাদের উপর বসেছিলো। এমনিভাবে আরো বহু ক্ষমতাসীনদের হাতে তারা নির্যাতীতি হয়েছে শুধু নির্যাতন নয়, বরং কখনও নির্বাসিত করা হয়েছে, কখনও তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, কখনও তারা খৃষ্টানদের গোলাম হয়েছে আর কখনও মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। এভাবে কারো না কারো পরাধীন হয়েই তাদেরকে যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত জীবন যাপন করতে হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাস বনী কোরায়জা নামক গোত্রের ইহুদী দুবৃত্তদের হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদের বন্দী করা হয়। বনী নজীর ও বনু কিনকা গোত্রকে মদীনা শরীফ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়। খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে খায়বর ও ফোদক থেকেও বহিষ্কার করেন। অভিশপ্ত ইহুদী জাতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের এই ঘোষণা শুধু যে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত হয়েছে তাই নয়; বরং এই পৃথিবী যতদিন আছে ততদিন তাদের এই শাস্তি অব্যাহত থাকবে। এই সেদিন হিটলার ইহুদীদের প্রতি যে নির্যাতন করেছে তা পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতের বাস্তবায়নের ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইসরাঈল রাষ্ট্রে এই ঘোষণার পরিপন্থী নয়

যদিও পরবর্তীতে আমেরিকা এবং বৃটেনের মদদপুষ্ট হয়ে ইসরাঈল নামে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে কিন্তু তাই বলে ইহুদীদের অপমান ও লাঞ্ছনার মাত্রা এতটুকু কমেনি। বিশ্ব-সভায় তারা সম্মান লাভ করতে পারেনি; বরং তাদের লাঞ্ছনা এবং অপমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে কেননা, ইসরাঈল যে স্বাধীন রাষ্ট্র নয়; বরং আমেরিকার অধীন, একথা বিশ্ববাসী ভালভাবেই জানে। আমেরিকার মত বৃহৎ শক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করেও ইসরাঈলকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার আসীন করতে পারেনি। বিশ্বের বহু

দেশ আজও ইসরাঈলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হতে থাকবে। হাদীস শরীফে আছে, দজ্জাল ইহুদীদের মধ্যে থেকেই বের হবে এবং ইহুদীরা দজ্জালের সঙ্গী হবে। হযরত ঈসা (আঃ) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে অবতরণ করবেন। তিনি দজ্জালকে হত্যা করবেন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গী হবে তখন মুসলমানগণ। মুসলমানদের হাতে তারা চরম শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে একথাও আছে যে, ইহুদীরা আত্মরক্ষার্থে কোন বৃক্ষের আড়ালে দাড়াবে। আল্লাহ পাক বৃক্ষকে বাক শক্তি দান করবেন। বৃক্ষ মুসলমানদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, আল্লাহর দুশমন তার আড়ালেই রয়েছে, এভাবেই এ অভিশপ্ত জাতিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।[১] পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ

(নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী) যারা দুর্নীতিবাজ এবং দুষ্কৃতকারী, যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তারা চরম শাস্তি ভোগ করবে আর তাতে বেশি বিলম্বও হবে না। পক্ষান্তরে যারা কৃত অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হবে, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে খাঁটি তওবা করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

'নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, আল্লাহ পাক অতি সত্ত্বর অবাধ্য, নাফরমানদেরকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বড় ক্ষমাশীল এবং দয়াবান তাই যে তওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থী হয়, তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও আযাব এবং রহমতের উল্লেখ পাশাপাশি করা হয়েছে যাতে করে আযাবের ভয়ে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে যায়। এজন্যে প্রথমে আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, পরে রহমতের আশা প্রদান করা হয়েছে।

আযাবের ভয়ের কারণে মানুষ পাপাচার থেকে বিরত থাকবে, পরহেযগারী অবলম্বন করবে আর রহমতের আশায় মানুষ নেক আমল করবে এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২]

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯৫৪-৭০
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২২২
২। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৯

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে তাদের জন্য এ আয়াতে বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে এ মর্মে যে, এখনও তওবার সুযোগ রয়েছে, ইচ্ছা করলে যে কেউ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে বিশেষতঃ ইহুদীরা যদি ইসলামের শত্রুতা পরিত্যাগ করে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে ও তাঁর অনুসরণ করে তবে তারাও দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে।

এখানে আরও উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে যে সর্তকবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তা কাদের উদ্দেশ্যে, পূর্বকালের ইহুদীদের উদ্দেশ্যে? ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, যে ইহুদীরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানা পেয়েছে তাদের সম্পর্কেই এই সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে এ মর্মে যে, যদি এখনও তোমরা ঈমান না আন, সত্য পথ না গ্রহণ কর এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী না হও, তবে কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদেরকে অপমান এবং লাঞ্ছনার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে পূর্বকালের ইহুদীদের জন্যে এ মর্মে যে, যদি তোমরা তোমাদের সংশোধন না কর, সকল সঠিক পূণ্য পন্থা গ্রহণ না কর, তবে চিরকাল তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। লাঞ্ছনা এবং অপমান তোমাদের চির সাথী হবে। তৌরাতেও এমনি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদের জন্যও এতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী।[১]

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ج

'আর আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি, তাদের মধ্যে কেউ নেককার এবং কেউ ভিন্নরূপ, আমি তাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা ফিরে আসে'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক দূরাত্মা ইহুদীদের সম্পর্কে আরো একটি কথা ঘোষণা করেছেন যে, তাদের অন্যায় আচরণের শাস্তিস্বরূপ তারা অর্ন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকবে, তাদের মধ্যে কোনদিন জাতীয় ঐক্য ও সংহতি দেখা যাবে না, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তারা অপমানিত অবস্থায় থাকবে। তারা হয়তো ধনী হবে, এমনকি তাদের কেউ জ্ঞানীও হবে কিন্তু সম্মানিত হবে না, বরং সর্বত্র নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হবে। যদিও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের সাহায্যে ফিলিস্তিনীদের

১। তফসীরে মাজেদ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৪

মাতৃ-ভূমি দখল করে অন্যায়ভাবে তথাকথিত ইসরাঈল রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করা তাদের ভাগ্যে জোটেনি, দুনিয়াতে কোন অপরাধীকে ধরার জন্যে পুলিশকে অপরাধীর সন্ধান করে পাকড়াও করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারের অপরাধীরা আল্লাহ পাকের কুদরতে তাদের শাস্তির স্থলে স্ব-ইচ্ছায়ই হাযির হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঘোষণা হল এই, কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের মসজিদে অবতরণ করবেন, তিনি দজ্জালকে হত্যা করবেন। আর তাঁর সাথী মুসলমানগণ ইহুদীদের নিপাত করবেন। তাই পূর্বাহ্নেই সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অভিশপ্ত ইহুদী জাতি একত্রিত হবে, এটিতো নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ইসরাঈল মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের একটি ছাউনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতএব, আল্লাহ পাক ইহুদীদের শাস্তি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে যে ঘোষণা দিয়েছেন তা অতীতে যেমন বাস্তবায়িত হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

আলোচ্য আয়াতের قطعنهم শব্দটির অর্থ হল তাদেরকে আমি ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছি। ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের অর্ন্তদ্বন্দ্ব এবং অনৈক্যের শাস্তির কথা ঘোষণা করে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছেঃ "হে মোমেনগণ! তোমরা পরস্পর কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়োনা"। যেমন অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় তাগিদ করা হয়েছেঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا

"তোমরা আল্লাহর রুজ্জুকে একত্রিত হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর আর পরস্পর দলাদলি করোনা"।

مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ

তাদের মধ্যে কিছু নেককার লোক রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তারা হল সে সব ইহুদী যারা মুসলমান হয়েছেন।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তারা সেসব ইহুদী, যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করত।

وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ তাদের মধ্যে অন্য প্রকারের লোকও ছিল যারা নেককার নয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা হল সেসব ইহুদী যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি। আর কোন কোন তফসীরকারের মতে তারা হল সে সব ইহুদী যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমানের দাবীদার ছিল অথচ পাপাচারে লিপ্ত ছিল। অথবা তারা হল সে সব ইহুদী, যারা হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে।[১]

وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝

আর আমি তাদেরকে সুখ-দুঃখ বা ভাল ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, তাদেরকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দিয়েছি যেন তারা সৎ পথে ফিরে আসে, সাবধান হয়।

حسنٰت

অর্থাৎ ভাল অবস্থা, অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া। আর سيٰات অর্থ অভাব-অনটন, অপমান এবং লাঞ্ছনা প্রভৃতি। মানুষের আনুগত্য এবং অবাধ্যতা পরীক্ষা করা যায় দু' অবস্থায়। কোন মানুষের প্রতি এহসান করে নেয়ামত দিয়ে সে দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় কি-না তা দেখা যায়। অথবা বিপদগ্রস্ত করে যে, বিপদের সময় সে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে আসে কি-না। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে سيٰات এবং حسنٰت অর্থাৎ পার্থিব সুখ এবং দুঃখ দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। কোন কোন সময় আধ্যাত্মিক ভাল অবস্থা এবং মন্দ অবস্থা দ্বারাও মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। কখনো লক্ষ্য করা যায় কোন ব্যক্তি গুনাহর কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহ পাকের নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। এর দ্বারা তার অন্তরে এ ধোকা হয় যে আমি হক্বের উপর রয়েছি, না হয় আল্লাহ পাকের এত নেয়ামত কেন লাভ করছি? অথচ প্রকৃত অবস্থা এই, সে বাতিলের উপরই রয়েছে কিন্তু তা উপলব্ধি করার শক্তি তার নেই, ঐ অবস্থাটি তার জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ এবং গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি নেয়ামত বৃদ্ধি করার অর্থ হল তাকে অবকাশ দেয়া।[২]

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১২
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৩৫৪

অর্থাৎ তাদেরকে সুখ দুঃখ দ্বারা যে পরীক্ষা করা হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই, তারা যেন সৎ পথে ফিরে আসে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বন্দাকে যখন আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন তখন তার উদ্দেশ্য হয় বন্দার কল্যাণ সাধন, অর্থাৎ পথহারা বন্দা যেন পথে ফিরে আসে কেননা, সুখ বা দুঃখ উভয় অবস্থাই মানুষকে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের প্রতি আহবান জানায়। নেয়ামত লাভ করলে আরো নেক আমল করার জন্যে অনুপ্রাণিত হয়। বালা-মুসিবত এবং বিপদাপদে নিপতিত হলে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে আসে।[১]

আয়াত সম্পর্কে আরও কিছু কথা

এ আয়াত দ্বারা আরও কয়েকটি কথা জানা যায়।

১. কোন জাতির একত্রিত থাকা তথা একস্থানে বাস করা এবং ঐক্যবদ্ধ থাকা আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত আর তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বিভক্ত হওয়া আল্লাহ পাকের এক প্রকার আযাব।

২. দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে সুখ দুঃখ তথা ভাল ও মন্দ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ, মানুষকে উভয় অবস্থায়ই পরীক্ষা করা হয়। যদি সম্পদ ও সমৃদ্ধি লাভ হয় তবে বন্দা আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে কি-না তা দেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি অভাব-অনটন এবং বিপদাপদে নিপতিত করা হয় তখন বন্দা সবর করে কি-না তা লক্ষ্যনীয় বিষয় হয়।

৩. মূলতঃ এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রী, সম্পদ ও সমৃদ্ধি আনন্দিত হওয়ার এবং অহংকারী হওয়ার কোন বিষয় নয়, বরং মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হওয়ার বিষয়। এমনিভাবে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের অভাব-অনটন বা অন্য কোন কষ্ট ব্যথিত মর্মাহত হওয়ার বিষয় নয়, কেননা দুনিয়ার সুখ এবং দুঃখ কোন অবস্থাই চিরস্থায়ী নয়।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ইহুদীদের মধ্যে কিছু নেককার লোকও ছিল। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কিন্তু তাদের পরবর্তীরা ছিল নিতান্ত অপদার্থ। যারা তৌরাতের উত্তরাধীকারী হয়, তারা ছিল নিতান্ত অসৎ প্রকৃতির লোক। অর্থ লিপ্সা ছিল তাদের মজ্জাগত। তৌরাত যখন তাদের হাতে আসে তখন তারা দুনিয়ার নগণ্য স্বার্থের বিনিময়ে তৌরাতের বিধান বিক্রয় করতে থাকে। তারা তৌরাতের সত্য বিবরণ গোপন রাখতো এবং যে তাদেরকে ঘুষ দিত তার ইচ্ছা মোতাবেক তৌরাতের বিধান পরিবর্তন করতো, দূরাত্মা ইহুদীরা এমন জঘন্য অন্যায় কাজকে সামান্য মনে করতোঃ

وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৪

"এবং বলতো আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করা হবে, "আমাদের সাত খুন মাফ" আমরা যে নবীর বংশ, অতএব, "আমরা যা কিছু করিনা কেন আমাদের ক্ষমা সুনিশ্চিত"।

এভাবে ইহুদীরা চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দেয় অথচ এরপরও যদি তাদের নিকট এমনি অন্যায় ভাবে অর্থ সম্পদ আসে, তবে তাও তারা গ্রহণ করে, কেননা তারা ছিল অর্থ লিপ্সায় অন্ধ।

তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে ইহুদী ধর্মযাজকরা তা গোপন করে রাখে কেননা, মানুষ যদি ইসলাম কবুল করে, তবে তাদের "হালুয়া রুটির" অভাব হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তারা অন্যায় করার পর অনুতপ্ত হওয়ার স্থলে আরও অন্যায় করতে থাকতো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে অনুগত রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য সৎ কাজ করেছে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি যে প্রবৃত্তির তাড়নার অনুগত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের নিকট ভিত্তিহীন আকাঙ্ক্ষা রেখেছে"। (আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজা)

وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ

এর অর্থ হলো, এ দূরাত্মা ইহুদীরা সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকতো, একবার পাপে লিপ্ত হওয়ার পর কোন প্রকার তওবা এস্তেগফার না করে পুনরায় সেই পাপ কাজ করতো, এরপরও আল্লাহ পাক "মাফ করে দেবেন" একথা বলে বেড়াতো।

সুদ্দী (রঃ) বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যদি বিচারক মনোনীত হতো, তবে সে ঘুষ ব্যতীত কোন বিষয়ের মীমাংসা করতো না। যখন মানুষ এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতো তখন সে বলতো এসব সামান্য ব্যাপার আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন, তাদের বিরোধীরা এ অন্যায়ের সমালোচনা করতো। বিস্ময়কর বিষয় হলো, যখন ঐ বিচারকের মৃত্যু হতো অথবা সে পদচ্যুত হতো এবং সমালোচকদের মধ্য থেকে কোন লোককে বিচারক মনোনীত করা হতো, তবে সেও ঘুষ গ্রহণ করতো, এছাড়া বিচার মীমাংসা করতো না।[১]

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ

বনী ইসরাঈল থেকে আল্লাহ পাক এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, "তারা আল্লাহ পাকের সম্পর্কে সত্য ভিন্ন কিছু বলবে না"।

আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে তাদের কৃত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে ঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১৪

وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِط

অথচ তারা তৌরাত পড়ে এবং পড়ায় এবং তৌরাতে রয়েছে সেই অঙ্গীকারের কথা, এমন অবস্থায় তারা তাদের অঙ্গীকারের কথা জানেনা বা ভুলে গেছে একথা বিশ্বাস করার কোন ন্যায্য কারণ নেই; বরং বাস্তব সত্য হল এই, তারা জেনে শুনেই তাদের কৃত অঙ্গীকারের বরখেলাফ করছে। তাদের অর্থ লিপ্সা, তাদের পদ লাভের মোহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে রেখেছে, হিতাহিত জ্ঞান তারা হারিয়েছে, আখেরাতের স্থলে দুনিয়াকে তারা প্রাধান্য দিয়েছে।

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَط

অথচ আখেরাত হল তাদের জন্যে যারা আল্লাহকে ভয় করে, পরহেযগারী অবলম্বন করে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা বিশ্বাস করে তাঁর অনুসারী হয়েছে তাদের জন্যে আখেরাতই উত্তম, উৎকৃষ্ট।

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

তোমরা কি এ সত্য উপলব্ধি করনা? আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন বাক্যটির অর্থ হল তোমরা নির্বোধ, তোমাদের বুদ্ধিই নেই কেননা, যার বুদ্ধি থাকে সে কল্যাণকর কাজকে গ্রহণ করে এবং অকল্যাণ পরিহার করে। অথচ তোমরা সত্যের পরিবর্তে অসত্যকে গ্রহণ করছো, আখেরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতকে বর্জন করে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের দ্রব্য সামগ্রী উপার্জন করছো; এর অর্থ হল, তোমরা আত্মোপলোব্ধি এবং আত্মচেতনা এক কথায় সবই হারিয়ে ফেলেছ।[১]

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَط

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলের একটি অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা ভঙ্গ করেছে এবং তৌরাতের বিধানকে পরিবর্তন করেছে, এ উদ্দেশ্যে তারা মানুষ থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছে।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের সকলেই বেঈমান ছিল না; বরং তাদের মধ্যে কিছু নেককার লোকও ছিল যারা ইতিপূর্বে তৌরাতের উপর আমল করতো এবং যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব

হয় তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর অনুসরণ করে জীবনকে ধন্য করে। হযরত মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)ও তাঁর সঙ্গীগণ তাঁদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা আত্ম সংশোধনে সচেষ্ট হয়েছে আল্লাহ পাক তাদের বিনিময়কে বিনষ্ট করেন না।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ঘোষণা

১. এবং যারা আল্লাহর কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, এর অর্থ হল তৌরাত, যার আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে অথবা সমস্ত আসমানী কিতাব তথা তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল, পবিত্র কোরআন।

২. এ আয়াত দ্বারা একথা জানা যায় যে, আসমানী কিতাবকে শুধু হেফাজত করে নিজের কাছে রেখে দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ পাকের কিতাবে যে বিধি–নিষেধ রয়েছে তার উপর সঠিকভাবে আমল করাই হল মূল উদ্দেশ্য। يمسكون শব্দ একথার প্রতি ইঙ্গিত করে।

৩. এখানে প্রনিধানযোগ্য বিষয় হল, তৌরাতে বর্ণিত বিধি-নিষেধের উপর আমল করার তাগিদ করা হয়েছে। আর তৌরাতে অনেক বিধান রয়েছে তন্মধ্যে আলোচ্য আয়াতে শুধু নামাযের উল্লেখ রয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর বিধান সমূহের মধ্যে নামাযই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আর নামায কায়েম করার মধ্যেমেই প্রমাণিত হয় কে আল্লাহর অনুগত, আর কে অবাধ্য। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নামায হল দ্বীনের খুঁটি। যে এ খুঁটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলো সে দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলো, আর যে এ খুঁটিকে বিনষ্ট করলো সে দ্বীনকে বিনষ্ট করলো, যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে গাফলত করে সে অন্য যত সৎ কাজই করুক না কেন, আল্লাহ পাকের দরবারে নামাযের জন্যে তাকে জবাবদেহী করতে হবে। আর যে নামায সঠিকভাবে আদায় করবে তার অন্য কাজ সহজ হবে। যেমন হাদীস শরীফে একথাও উল্লেখ রয়েছেঃ

اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلوة

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব হবে, যার নামায ঠিক হবে তার অন্য আমলের হিসাব সহজ হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে ধরবে এবং নামাযকে সঠিকভাবে কায়েম করবে, আল্লাহ পাক তাদের বিনিময় বিনষ্ট করবেন না। আতা (রহঃ) বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, বনী ইসরাঈলরা যদি আজও তৌরাতের প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশিত নবী হিসেবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর অনুসরণ করে তবে তারা লাভ করবে আল্লাহর ক্ষমা এবং তাদের সৎ কাজের সাধনা বিনষ্ট হবে না।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আমি তাদের উপর পর্বতকে চাঁদোয়ার ন্যায় উত্তোলন করি এবং তারা আতংক বোধ করে যে, যে কোন মুহূর্তে পাহাড় তাদের উপর পড়বে। আমি বলি, আমি যা কিছু দান করেছি তা শক্ত করে ধর তখন তারা তৌরাতকে মেনে চলার অঙ্গীকার করে। এখানে যে কথাটি প্রনিধানযোগ্য তা হল বনী ইসরাঈলরা আসমানী কিতাবের জন্যে আবদার করে তখন আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে তৌরাত দান করেন, কিন্তু এরপর তারা তৌরাতের বিধি-নিষেধ কঠিন বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আল্লাহ্ পাক পাহাড়কে তাদের মাথার উপরে তুলে ধরেন। যখন তারা উপলব্ধি করলো যে পাহাড় তাদের মাথার উপর পড়বেই, তখন তারা তৌরাতের বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করে। এ ঘটনাটি আরও বিস্তারিতভাবে সূরা বাকারায় স্থান পেয়েছে।[১]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে প্রশ হতে পারে যে, কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

"দ্বীনে কোন জবরদস্তি নেই" অথচ এ ঘটনা দ্বারা মনে হয় তৌরাতকে মেনে চলার জন্য জবরদস্তি করা হয়েছে। এর জবাব হলো, ইসলামে জবরদস্তী নেই এর অর্থ হল কোন অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জবরদস্তি করা হয় না এবং তা কোন দিন করা হয়নি। পক্ষান্তরে যে মুসলমান ইসলামের বিধান অমান্য করবে তাকে আল্লাহ্ পাক পদত্ত বিধান মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে। অতএব,

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

বাক্যে যে ঘোষণা রয়েছে তা অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত।

وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

আর আসমানী কিতাবে যা রয়েছে তা স্মরণ কর হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে কেননা, যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে আখেরাতে তারাই হবে সফলকাম।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০২-০৩

আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলের উপর পাহাড় উত্তোলনের যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে আশ্চর্যম্বিত হবার কিছুই নাই। কেননা আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

আর এ কারণেই তাঁর পক্ষে কোন কিছুই কঠিন নয়, তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। আমাদের মাথার উপরে যে নীলাভ আকাশ রয়েছে পাহাড় তো তার চেয়ে বেশী ভারী নয় যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

(তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি কোন প্রকার খুঁটি ব্যতীত আসমানকে উত্তোলন করে রেখেছেন) এমনিভাবে আকাশে যে মেঘমালা চলমান রয়েছে তা-ওতো আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, পাহাড়কে উত্তোলন করা কঠিন কিছুই নয়।

আমালুল কোরআন

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ

خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

যদি এ আয়াতকে লিপিবদ্ধ করে কোরআন শরীফ বা কিতাবের মধ্যে রেখে দেয়া হয়, তবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় হেফজ সহজ হবে এবং কিতাবের এল্‌ম হাসিল হবে। (কেতাবুল ফাওয়ায়েদ)

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى
شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٢﴾ اَوْ
تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ
اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

তরজমা

(১৭২) এবং স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" তারা সমস্বরে বলে, হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, এ স্বীকৃতি গ্রহণ এজন্যে যে, কেয়ামতের দিন তোমরা যেন না বল আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না।

(১৭৩) অথবা তোমরা যেন না বল আমাদের পূর্ব পুরুষরাই ইতিপূর্বে শেরক করে, আমরাতো তাদেরই পরবর্তী বংশধর মাত্র, তবে কি পাপিষ্ঠদের কার্যকলাপের কারণেই তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?

(১৭৪) আমি এভাবে নিদর্শন সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করছি যেন তারা ফিরে আসে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলের কৃত অঙ্গীকার এবং তা ভঙ্গ করার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং তাদের শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সে ঐতিহাসিক অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে যা সৃষ্টির প্রথম দিন সমগ্র মানব জাতির নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। যখন হযরত আদম (আঃ)-কে শুধু জীবন্ত মানুষ রূপে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ পাক তাঁর "রবুবিয়্যত" বা প্রভূত্বের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতি থেকে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সকলকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের প্রভূত্বের অঙ্গীকার করতে হয়েছে। সৃষ্টির সাথে হয়েছে স্রষ্টার প্রথম কথা। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে লক্ষ্য করে একটি প্রশ্ন করেছেন, সে প্রশ্নটি হলঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

'আমি কি তোমাদের প্রভু নই'? সেদিন কে দেবে এ প্রশ্নের জবাব? একমাত্র হযরত আদম (আঃ) জীবন্ত মানুষ আর বাকী সব রূহ, যাদেরকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় একত্রিত করা হয়েছে। সেদিন সর্বপ্রথম যিনি সমগ্র মানব জাতির তরফ থেকে মহান আল্লাহ পাকের এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন, তিনি হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনিই বলেছেন সর্ব প্রথম بلى হ্যাঁ, নিশ্চয় তুমিই আমাদের প্রতিপালক। তুমিই আমাদের

স্রষ্টা, পালনকর্তা, রিয্কদাতা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ জবাবের অনুসরণ করেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম তথা সমগ্র মানব জাতি। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে قَالُوْا بَلٰى তখন সকলেই বলে, প্রভূ তুমিই আমাদের রব, তুমিই আমাদের পরওয়ারদেগার। সেদিন আল্লাহ্ পাকের রবুবিয়্যতের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের শপথ গ্রহণ করেছিল প্রতিটি মানুষ। যদিও দুনিয়াতে আসার পর অনেকেই আত্মবিস্মৃত হয়েছে, ভুলে গেছে কৃত অঙ্গীকারের কথা, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সেই ঐতিহাসিক অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ প্রেক্ষিত সম্মুখে রেখেই মরমী কবি আল্লাম ইকবাল বলেছিলেন,

وهان قالوا بلی یهان بت پرستی = ذرا سوچ کها کیا تها کیاکها

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথন দিনতো আল্লাহ্ পাকের রুবুবিয়্যত ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অঙ্গীকার করে এসেছ আর এখানে এসে মূর্তি পূজা শুরু করেছ, একটু চিন্তা কর সেখানে কি বলে এসেছ আর এখানে কি করছো।

হাদীস শরীফের আলোকে আলোচ্য আয়াত

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পৃষ্ঠদেশে স্বীয় কুদরতী হস্ত মোবারক বুলিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ সৃষ্টি হবে সকলেই বের হয়ে আসলো। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকটি মানুষের দু' চক্ষুর মাঝখানে নূরের একটি চমক দান করলেন।

এরপর সকলকে হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মুখে হাযির করলেন। আদম (আঃ) আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! এরা কারা? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, ওরা সকলে তোমার সন্তান-সন্ততি। হযরত আদম (আঃ) একজনের দু' চোখের মাঝখানে নূর দেখে অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং আরজ করলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! এই ব্যক্তি কে? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ এ হল দাউদ। আদম (আঃ) এরশাদ করলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! তুমি তাকে কত বয়স দিয়েছ? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, ষাট বছর।

তখন আদম (আঃ) আরজ বরলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার বয়স থেকে তাকে চল্লিশ বছর দান কর। যখন হযরত আদম (আঃ) এর বয়স পূর্ণ হবার চল্লিশ

বছর বাকী রইলো, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা হাযির হল, আদম (আঃ) বললেনঃ আমারতো এখনো চল্লিশ বছর বয়স বাকী রয়েছে। তখন মালাকুল মউত বললেন, আপনি কি আপনার সন্তান দাউদ (আঃ)-কে চল্লিশ বছর দান করেননি? আদম (আঃ) একথা অস্বীকার করলেন, এজন্যেই তাঁর বংশধররা কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকে। আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের আদেশকে লঙ্ঘন করে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছিলেন তাই তাঁর বংশধররা আল্লাহ পাকের নির্দেশের কথা ভুলে যায়। আদম (আঃ)-এর দ্বারা ভুল হয়েছিলো, তাই তাঁর বংশধরদের দ্বারা ভুল হয়ে থাকে।

এই হাদীসকে ইমাম তিরমিজী (রঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তার ডান বাহুর উপর স্বীয় কুদরতী হাত রেখেছেন। ফলে ছোট ছোট পিপীলিকার মত তাঁর সাদা বংশধরগণ বের হয়ে পড়ে। এরপর বাম বাহুর উপর স্বীয় কুদরতী হাত রেখেছেন তখন কয়লার ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণের বংশধররা বের হয়ে পড়ে। যারা ডানদিক থেকে বের হল তাদের সম্পর্কে এরশাদ করলেনঃ এরা হল জান্নাতের দিকে গমনকারী। তাদের আনুগত্যের আমি পরোয়া করি না। আর বাম দিক থেকে যারা বের হয়েছে তাদের সম্পর্কে বলেছেনঃ তারা দোযখের দিকে গমনকারী, আমি তাদের নাফরমানীর পরোয়া করি না। (আহমদ)

মোকাতেল (রাঃ) এবং অন্যান্য তফসীরকারগণ এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তবে মোকাতেল (রঃ)-এর বর্ণনার সাথে এতটুকু কথা সংযোজিত হয়েছে যে, এরপর আল্লাহ পাক সকলকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টির প্রথম দিন অঙ্গীকার গ্রহণকারী সকল মানুষ যতক্ষণ তাদের পিতৃ-পৃষ্ঠ থেকে এবং মাতৃ উদর থেকে বের না হবে, আর যারা কবরে চলে গেছে তারা কবরে বন্ধ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না।

মুসলিম এবনে ইয়াসার (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট আলোচ্য আয়াত

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন তিনি বলেন, আমি নিজে শুনেছি এ আয়াত সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর স্বীয় কুদরতী হস্ত মোবারক বুলিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর কিছু বংশধর বের হয়ে পড়ল। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আমি তাদেরকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছি, তারা জান্নাতবাসীদের আমল করবে। এরপর হযরত আদম (আঃ)-এর

পৃষ্ঠদেশে বাম হস্ত দ্বারা বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর আরো কিছু বংশধর বের হয়ে আসল। তিনি এরশাদ করেলেনঃ এদেরকে আমি দোযখের জন্যে তৈরী করেছি, এরা দোযখীদের আমল করবে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তবে আমলের প্রয়োজন কি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেনঃ আল্লাহ পাক যে বন্দাকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন তাকে জান্নাতবাসীদের আমল করার তওফিক দান করেন। এমনকি, সে মৃত্যুর সময়ও জান্নাতবাসীদের কোন আমল করে, ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। আর যাকে দোযখের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেন তাকে দিয়ে দোযখীদের কাজ করানো হয় এমনকি, মৃত্যুর সময়ও সে দোযখীদের কাজ করে, যে কারণে তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়া হয়। (মালেক, আবু দাউদ, আহমদ)

অঙ্গীকার কোথায় গ্রহণ করা হয়েছে

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের পর ওয়াদীয়ে নোমান যা ময়দানে আরাফাত নামে খ্যাত, সেখানে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীতে যত মানুষ সৃষ্টি করার ইচ্ছা তাঁর ছিল সকলকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন এবং তাদেরকে মুখোমুখি করে জিজ্ঞাসা করেছেনঃ আমি কি তোমাদের প্রভূ নই? সকলে সমবেত কণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ কেন নয়; আমরা তার সাক্ষী। (আহমদ, নেসায়ী, হাকেম)

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক সমস্ত বনী আদমকে একত্রিত করেন, এরপর তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভাগ করেন, এরপর তাদেরকে আকৃতি ও বাক শক্তি দান করেন। সকলে কথা বলতে সক্ষম হয়, এরপর তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই"? তখন সকলে জবাব দেয়, হ্যাঁ অবশ্যই। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমি তোমাদের এই অঙ্গীকারের উপর সাত আসমান সাত জমিনকে সাক্ষী করলাম এবং তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী করলাম যেন কেয়ামতের দিন তোমরা একথা না বল যে, আমরা তৌহিদ সম্পর্কে জানতাম না, খুব ভাল করে জেনে নাও, "আমি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা, আমি তোমাদের নিকট আমার পয়গম্বর প্রেরণ করবো, যে তোমাদেরকে এই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, আমি তোমাদের জন্যে আমার কিতাব নাযিল করবো, সকলে এক সঙ্গে জবাব দিল আমরা সকলে সাক্ষ্য প্রদান করি যে, নিশ্চয় তুমি আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের মা'বুদ, তুমি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নেই, কোন উপাস্য নেই।

এরপর সকলকে হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মুখে আনা হয়। তিনি উপর থেকে সকলকে পরিদর্শন করেন। ধনী দরিদ্র সুন্দর কুৎসিত সকলকে তাঁকে দেখানো হয়। তখন আদম (আঃ) আরজ করলেন, যে পরওয়ারদেগার! তুমি তোমার সকল বন্দাকে এক প্রকার কেন সৃষ্টি করোনি, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, আমি চাই যেন তারা আমার শোকর আদায় করে, ধনী নির্ধনকে দেখে, সুন্দর অসুন্দরকে দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

হযরত আদম (আঃ) তাঁর সন্তানদের মধ্যে আম্বিয়াগণকে প্রদীপের ন্যায় আলোকময় দেখেন। নবীগণ থেকে বিশেষ ভাবে নবুওয়্যত ও রেসালাত সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় যেমন কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ......وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

মানুষ পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে এবং তার ভোলা মনের কারণে সে জীবনের এ সত্যকে ভুলে যায় তথা-আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা ভুলে যায় তাই তার ভুলে যাওয়া কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আগমন করেছেন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত নবী রসূলগণ! পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ

"অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের নিকট কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যারা আমার হেদায়েত মেনে চলবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা আমার নাফরমানী করবে, অবাধ্য হবে আর আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করবে, তারা হবে দোযখবাসী, তাতে তারা চিরদিন থাকবে"।[১]

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পূর্বেই আল্লাহ্ পাক তাকে পথের পাথেয় হিসেবে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দিয়েছেন যেন মানুষ পৃথিবীর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে ভুলে না যায়। তবে একথা সত্য যে, যারা নিদর্শন সমূকে মিথ্যা জ্ঞান করবে তারা হবে নরকবাসী, তারা তার মধ্যে চিরকাল থাকবে।

অতএব, আখেরাতে একথা বলার সুযোগ কারোই থাকবে না যে, তৌহিদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না, অথবা এ সম্পর্কে আমাদেরকে কেউ কিছুই বলেনি, যদি সৃষ্টির প্রথম দিনের কৃত অঙ্গীকারের কথা কেউ ভুলেও যায় তবে যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১৫-১৮
তফ্সীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪২-৪৩

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا

অথবা কেউ একথাও যেন বলতে না পারে যে, আমরাতো আল্লাহ পাকের পরিচয় পাইনি, তৌহিদ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি, আমাদের পূর্ব পুরুষরা শেরক করেছে আমরা তাদের অনুসরণ করেছি তবে কি সেই বাতিল পন্থীদের অন্যায়ের কারণে হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ না করার এমন কৈফিয়ত আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। আলোচ্য আয়াতে একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তান-সন্ততি বের করে এনেছেন এবং ঐ সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তান-সন্ততি বের করেছেন, এরপর সকলের নিকট থেকে তার রবুবিয়্যতের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, এরপর তাদেরকে ঐ পৃষ্ঠদেশই প্রবিষ্ট করিয়েছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকেই তার নিজের অঙ্গীকার করেছে অতএব প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী হতে হবে। তাই পূর্ব পুরুষ ব. পিতার উপর দোষ চাপিয়ে রক্ষা পাওয়া যাবে না। অঙ্গীকারের কথা ভুলে গেছি এমন কৈফিয়তও অচল হবে।[১]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ পাক যখন শুধু হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন, আর কোন মানুষ অস্তিত্ব লাভ করেনি, ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় রূহ সমূহকে হাযির করা হয়েছে এমন অবস্থায় তাদের নিকট থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব হল? যখন আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভের কোন সুযোগ তাদের হয়নি, যখন তাদের বুদ্ধিও হয়নি। এমন সময় প্রতিপালকের তরফ থেকে কিভাবে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে? এর জবাব এই, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তাঁর কুদরত অসীম, তাঁর সকল ইচ্ছা কার্যকর, তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন যার কোন অস্তিত্ব ছিল না, তাঁর জন্যে আদৌ এ কাজ কঠিন নয় যে, মানুষকে তিনি প্রয়োজন মোতাবেক সে মুহূর্তে বিবেক বুদ্ধি দান করবেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক মানুষের এই ক্ষুদ্র অবয়বে অনেক প্রকার শক্তি দান করেছেন, স্বয়ং মানুষের মধ্যেই আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের অনেক জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে, আসমান জমিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত এবং নেয়ামতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

১। ফাওয়ায়েদ ওসমানী, পৃষ্ঠা-২২৩

আর এভাবেই আমি বিস্তারিত ভাবে আমার আয়াত সমূহ বর্ণনা করি যেন তারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে বাতিলকে পরিহার করে এবং সত্যের দিকে ফিরে আসে তথা শেরক ও কুফর বর্জন করে এবং তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে।

অঙ্গীকার কখন গ্রহণ করা হয়েছে

সমগ্র মানব জাতি থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণের কথা আলোচ্য আয়াত ঘোষণা করা হয়েছে তা কখন গ্রহণ করা হয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাবে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন-

১. হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পর জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২. কোন কোন তফসীরকারের মতে, জান্নাতে প্রবেশের পর পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আসমান থেকে অবতরণের পর পৃথিবীতেই এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, প্রকৃত অবস্থা এই, বিভিন্ন স্থানে এবং সময়ে বিভিন্ন অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে।[১]

আলোচ্য আয়াতে আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের হওয়ার কথা রয়েছে।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

(আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছেন)

এ আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে অথচ হযরত আদম (আঃ)-কে কেন্দ্র করেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। এর জবাবে বলা হয় যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, সকলেরই আদি পিতা হলেন হযরত আদম (আঃ) আর সকলেই তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়েছে। মসনদে আহমদ, নেসায়ী এবং মুসতাদরাকে সংকলিত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর বংশধরদেরকে বের করেছেন এবং তাঁর সম্মুখে পিপীলিকার ন্যায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন, আমি কি তোমাদের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬১

প্রভু নই? তখন সকলেই জবাবে বলেছে হ্যাঁ, অবশ্যই। একথাগুলো হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও উল্লেখিত হয়েছে।

হয়তো এ প্রশ্ন হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত অঙ্গীকার কারোই স্মরণ নেই, এমন অবস্থায় ঐ অঙ্গীকার গ্রহণের উপকারিতা কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, যদিও সেদিনের কৃত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ নেই কিন্তু সেই অঙ্গীকারের নিদর্শন মানব অন্তরে রয়েছে। স্বভাবগত ভাবেই মানব অন্তর আল্লাহ পাকের দিকে আকৃষ্ট হয়। মানুষ যখন কোন পেরেশানীতে পড়ে তথা কোন জটিল সমস্যায় জর্জরিত হয় তখন অন্তর আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে যায় এবং বিপদ বা মুসিবত দূরীভুত করার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের নিকটই সে আশা করে। তখন মানব অন্তর নিজেই সাক্ষ্য দেয় যে, আমার একজন প্রতিপালক অবশই আছেন যিনি আমার স্রষ্টা, আমার রিয্‌কদাতা। মানব মনের এ অবস্থা যে মোমেনদের মধ্যে সীমিত তাই নয়, বরং যারা অমুসলিম, মুশরেক, বে-দ্বীন তারাও যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন উপলব্ধি করে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন গতি নেই। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা এবং তার স্থান কাল স্মরণ না থাকলেও তার নিদর্শন এখনও মানব মনে বিদ্যমান রয়েছে। এজন্যে কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَذَكِّرْ ط اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ

(আপনি নসীহত করুন কেননা, আপনিতো নসীহতকারীই।)

'তাজকীর' শব্দের অর্থ হলো ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া।

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক মানব জাতি থেকে তার রবুবিয়্যত সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এটিই ছিল সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার প্রথম কথা। আর এটিই ছিল প্রথম আহবান। ঠিক এমনিভাবে যখন মানুষ মৃত্যুর পর কবরে যায় তখন সর্ব প্রথম এ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়। প্রত্যেকটি মানুষকে কবরে রাখার পর মুনকির নকির যে প্রশ্নটি করে তা হলো مَنْ رَّبُّكَ

তোমার প্রতিপালক কে?

এতদ্ব্যতীত, এখানে একথাও উল্লেখ্য; কোন কোন বুজুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আপনার কি সেই অঙ্গীকারের কথা মনে আছে? তখন তারা হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়েছেন। হযরত আলী সোহাইল ইসপাহানী (রঃ)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনার কি আল্লাহ পাকের প্রশ্নের জবাবে بَلٰى হ্যাঁ বলার কথা মনে আছে? তিনি বললেন অবশ্যই। এমন মনে আছে যেন গতকাল একথা হয়েছে। যখন তাঁর একথা শায়খুল ইসলাম খাজা আবদুল্লাহ আনসারীকে বলা হয় তখন তিনি বলেনঃ এই জবাবে কিছুটা ত্রুটি আছে কেননা, যা গতকাল বা যা অতীত হয়ে গেছে সুফী

দরবেশেদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সেদিনের তো এখনও সন্ধ্যা হয়নি যেদিন এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্যেই মরমী কবি বলেছেনঃ

انکه ازحق نیست غافل یك نفس
مضی ومستقبل ش حال است وبس

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে মুহূর্তের জন্যেও গাফেল থাকে না, তার অতীত এবং ভবিষ্যত সবই বর্তমান।[১]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ
مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ
بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ
كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَن يُضْلِلْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

তরজমা

(১৭৫) আর তাদেরকে তুমি সেই লোকটির অবস্থা জানিয়ে দাও যাকে আমি আমার নিদর্শন সমূহ দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা বর্জন করে চলে। পরিণামে শয়তান তার পেছনে লাগে এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(১৭৬) আমি ইচ্ছা করলে এ আয়াত সমূহ দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট রইল এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করল।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬১-৬২

তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়, যদি তুমি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তবে সে হাপিয়ে ওঠে, আর যদি ছেড়ে দাও (তথা বোঝা না চাপাও) তবুও সে হাপিয়ে থাকে। আমার নিদর্শন সমূহকে যারা প্রত্যাখ্যান করে তাদের এটিই দৃষ্টান্ত। অতএব, তুমি তাদেরকে এসব অবস্থা জানিয়ে দাও, যাতে তারা চিন্তা করে।

(১৭৭) যারা আমার নিদর্শন সমূহে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের অবস্থা কত মন্দ!

(১৭৮) আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করেন তারাই সঠিক পথ লাভ করে। আর তিনি যাদেরকে বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বলঅম এবনে বাউর সম্পর্কে। মতান্তরে তার নাম বলঅম এবনে বাউরও বলা হয়েছে। হযরত আবু তালহা (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি আমালেকা শহরের বাসিন্দা ছিল। আর মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, বলঅম এবনে বাউর বলকা শহরের অধিবাসী ছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) মোহাম্মদ এবনে এসহাক (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ তাঁর ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) যখন আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি সিরিয়ার কেনান নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেই এলাকার কিছু লোক বলঅম এবনে বাউরের নিকট হাযির হলো, সে এসমে আজম জানতো।

এজন্যে লোকেরা বললো, মূসা (আঃ)-এর নিকট অনেক সৈন্য, তাঁর মেজাজও অত্যন্ত কড়া, তারা আমাদের দেশে এজন্যে এসেছেন যেন আমাদেরকে বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দেন এবং আমাদের হত্যা করেন, আর আমাদের স্থলে বনী ইসরাঈলকে এখানে আবাদ করেন। আপনি দোয়া করুন এ মর্মে যে, আল্লাহ পাক যেন বনী ইসরাঈলকে আমাদের থেকে ফিরিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। আপনি দোয়া করুন। আপনার দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়। বলঅম বললো, আরে হতভাগার দল, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নবী, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ফেরেশতাগণ এবং মোমেনগণ! আমি তাঁর বিরুদ্ধে কিভাবে দোয়া করবো? আল্লাহ পাকের দরবার সম্পর্কে আমি যা জানি তোমরা তা জান না। যদি আমি তোমাদের কথা মত দোয়া করি তবে আমার দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সর্বনাশ হবে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু তার একথা লোকেরা গ্রহণ করলো না, বরং তারা বার বার তাদের কথা বলতে থাকলো, তার নিকট মিনতি জানাতে থাকলো এমনকি ক্রন্দন করলো।

তখন বলঅম এবনে বাউর বললো, আচ্ছা আমি আমার প্রতিপালকের নিকট এস্তেখারা করি। বলঅমের নিয়ম ছিল এই, যতক্ষণ স্বপ্ন যোগে কোন কথার অনুমতি লাভ না করতো ততক্ষণ সে দোয়া করতো না। তাই বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দোয়া করার ব্যাপারে সে এস্তেখারা করলো। কিন্তু স্বপ্নে তাকে বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দোয়া করতে নিষেধ করা হল। সে লোকদেরকে জানিয়ে দিল আমি এস্তেখারা করেছিলাম, কিন্তু বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। এ জবাব শ্রবণ করে লোকেরা তাকে কিছু উপঢৌকন দিল, সে তা গ্রহণ করলো। এরপর লোকেরা তাকে পুনরায় অনুরোধ করলো বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দোয়া করার জন্যে, বলঅম এবনে বাউর পূর্বের ন্যায় পুনরায় বললো, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট এস্তেখারা করি। সে এস্তেখারা করলো। কিন্তু এবার তাকে কোন জবাব দেয়া হলো না। সে লোকদেরকে বললো, আমি এস্তেখারা করেছি কিন্তু আমাকে কোন জবাব দেয়া হয়নি।

তখন লোকেরা বললো, যদি আপনার বদদোয়া করা আল্লাহ পাকের দরবারে অপছন্দনীয় হতো তবে পূর্বের ন্যায় অবশ্যই বদদোয়া করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতো। আর এবার বদদোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। এর দ্বারা এ কথা জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় নয়। তাই আপনি বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করুন। লোকেরা এভাবে তাকে অনুরোধ করলো। অবশেষে সে তাদের প্রতারণায় পড়ে গেল এবং তাকে পথহারা করতে তারা সফল হলো। তাই বলঅম একটি খচ্চরের উপর আরোহন করে 'হিতান' নামক পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলো যেন পাহাড়ের উপর আরোহন করে বনী ইসরাঈলের সৈন্যদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু পাহাড়ের দিকে একটু অগ্রসর হওয়ার পরই খচ্চরটি বসে পড়ল। বলঅম খচ্চরের পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে তাকে বেত্রাঘাত করলো, পুনরায় তার উপর আরোহন করলো। সামান্য পথ অগ্রসর হওয়ার পর পুনরায় সে বসে গেল, বলঅম তাকে পুনর্বার মারলো। এবার আল্লাহ পাক খচ্চরকে বাক শক্তি দান করলেন। খচ্চরটি বললো, হতভাগা বলঅম, তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছ? তুমি দেখনা আমার সম্মুখে ফেরেশতাগণ রয়েছেন। এরপরও সে খচ্চরকে ছাড়লো না, বরং তার উপর আরোহন করে হিতান পর্বতের উপর বদদোয়া করার জন্য পৌঁছলো। কিন্তু বদদোয়ার ভাষা যা বনী ইসরাঈল জাতির জন্য বের হতো তা তার নিজের জাতি আমালেকার জন্যে হচ্ছিল। আর তার জাতি আমালেকার জন্য যা করার ইচ্ছা ছিল তা বনী ইসরাঈলের জন্য হচ্ছিল, তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, আপনি কি জানেন কি বলছেন? আপনি বনী ইসরাঈলের জন্যে দোয়া করছেন, আর আমাদের জন্য বদদোয়া। সে বললো এ ব্যাপারে আমার কোন অধিকার নেই, এসব আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণধীন। এ পর্যায়ে আমি সম্পূর্ণ অসহায়।

বলঅমের পরিণাম

বলঅম এবনে বাউর কেনানের অধিবাসী ছিল। এসমে আজম তার জানা ছিল। তাই আল্লাহ পাকের দরবারে সে এসমে আজমের মাধ্যমে যে দোয়া করতো তা কবুল হতো। কিন্তু পার্থিব স্বার্থের বশীভূত হয়ে আমালেকাদের উপঢৌকন তথা ঘুষ নিয়ে হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সে যে দোয়া করার চেষ্টা করেছিল তার ভয়াবহ পরিণাম হলো এই, তার রসনা বের হয়ে বক্ষ পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে গেল, তাই সে বললো, আমার দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানই ধ্বংস হলো। এখন চালবাজি, ধোকাবাজি এবং ছলচাতুরী ব্যতীত তোমাদের উদ্দেশ্য অর্জনের আর কোন বিকল্প পথ নেই।

এখন তোমাদের জন্য আমাকে প্রতারণার পথ অবলম্বন করতে হবে। যাও, কিছু সুন্দরী নারীকে সুসজ্জিত করে ব্যবসায়ের মালপত্র তাদের হাতে দিয়ে বনী ইসরাঈলের সৈন্যদের নিকট বিক্রি করার জন্যে প্রেরণ কর, আর এ আদেশও দাও যদি বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের দিকে হাত বাড়াতে চায় তথা তাদেরকে কোন ভাবে ব্যবহার করতে চায় তবে তারা যেন অস্বীকার না করে। যদি বনী ইসরাঈলের একটি লোকও ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদের সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলায় তোমাদের সাফল্য অবধারিত। আল্লাহ পাকের নিকট ব্যাভিচার অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ, যে সম্প্রদায়ের লোক ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের গজব নাযিল হয়। বলঅম এবনে বাউরের এ শয়তানী কৌশল তারা গ্রহণ করলো এবং তার উপর আমল করা হলো। যখন কেনানী মেয়েরা বনী ইসরাঈলের সৈন্যদের নিকট পৌঁছল তখন এ শয়তানী কৌশল কার্যকর হলো। কাস্তি বিনতে ছোর নামক এক কেনানী মেয়ের প্রতি জমরী এবনে শলম নামক এক ইসরাঈলী র্সদারের চোখ পড়লো। সে ছিল ইসরাঈলী সর্দারদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

সে মেয়েটির হাত ধরে হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্মুখে হাযির হয়ে বললো, হয়ত আপনি বলবেন এ মেয়েটি তোমার জন্যে হারাম। হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ হ্যাঁ মেয়েটি তোমার জন্যে হারাম, তুমি তার কাছেও যেয়োনা। জমরী বললো, আল্লাহ পাকের শপথ! তার ব্যাপারে আমি আপনার কথা মানবো না। এরপর মেয়েটিকে সে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল এবং তার সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হলো। তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের প্রতি আযাব নাযিল করলেন। অনতিবিলম্বে তাদের মধ্যে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল এবং মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে তাদের ৭০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

হযরত মূসা (আঃ)-এর সর্দারদের মধ্যে একজন ছিল ফাইহাজ এবনে ফাইজার এবনে মারোয়ান। সে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ বীর, যখন জমরী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, তখন সে উপস্থিত ছিলো না। প্রত্যাবর্তনের পর এ ঘটনা শ্রবণ করে সে তার লৌহ নির্মিত বর্শাটি হাতে নিয়ে জমরীর তাঁবুতে গেল। তাদেরকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত দেখে সে বর্শা দ্বারা আঘাত করলো এবং তাদের উভয়কে বর্ষার মাথায় নিয়ে বের হয়ে আসলো এবং উপরের দিকে তুলে ক্রন্দণরত অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করতে লাগলো এই বলে, হে আল্লাহ! যে তোমার নাফরমানী করে তার সাথে এ ব্যবহার করা হয়। এরপর আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি দয়া করলেন, প্লেগ রোগ থেকে তাদেরকে নাজাত দিলেন।[১]

মোকাতেল (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ বলকার রাজা বলঅম এবনে বাউরকে বলেছে, তুমি মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বদদোয়া কর, বলঅম এবনে বাউর বললো, আমরা একই ধর্মে বিশ্বাসী, আমি তাঁর ব্যাপারে বদদোয়া করব না। তখন রাজা তার জন্যে ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরী করালো এবং তাকে আদেশ দিল, তুমি মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বদদোয়া কর অন্যথায় তোমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেব। বলঅম এবনে বাউর যখন এ অবস্থা দেখলো তখন বদদোয়া করার জন্যে খচ্চরের উপর আরোহণ করে বস্তি থেকে বের হয়ে আসলো। বনী ইসরাঈলের সৈন্যদের সম্মুখে আসার পর খচ্চর থেমে গেল। বলঅম খচ্চরকে মারলো তখন খচ্চরকে আল্লাহ্ পাক বাক শক্তি দান করলেন। সে বললো, তুমি আমাকে কেন মারো? আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে। বলঅম প্রত্যাবর্তন করলো এবং রাজার নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলো। রাজা বললো, তোমাকে বদাদোয়া অবশ্যই করতে হবে নতুবা আমি তোমাকে শূলে চড়িয়ে দেব।

অবশেষে বলঅম এবনে বাউর হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বদদোয়া করলো যেন তিনি এ শহরে প্রবেশ না করেন, বদদোয়া কবুল হল আর এ বদদোয়ার কারণে বনী ইসরাঈল জাতি ময়দানে তীহে আটকা পড়লো। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমরা কোন্ অপরাধের কারণে এখানে আটকা পড়েছি, আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, বলঅম এবনে বাউরের বদদোয়ার কারণে। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! যেভাবে তুমি তার বদদোয়া আমাদের ব্যাপারে কবুল করেছ, ঠিক তেমনি তার ব্যাপারে আমার বদদোয়া কবুল কর। এরপর হযরত মূসা (আঃ) বদদোয়া করলেন এভাবে যে, বলঅম থেকে এসমে আজম ও ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হোক। মূসা (আঃ)-এর বদদোয়ার কারণে তার

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪২০-২৩
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৭৫-৭৭
খোলাসাতুত্তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪

আধ্যাত্মিক শক্তি এবং ঈমান এভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয় যেভাবে বকরীর চামড়া তার দেহ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। সাদা কবুতরের ন্যায় একটি বস্তু তার ভেতর থেকে বের হয়ে যায়।

শানে নুযুল সম্পর্কে আরো কথা

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনে আস (রাঃ), সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) এবং লাইস এবনে সাদ (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে উমাইয়া এবনে সলত সকফী সম্পর্কে। সে আসমানী কিতাব সমূহ পাঠ করেছিল এবং একথা জানতে পেরেছিল যে, আল্লাহ পাক একজন পয়গম্বর প্রেরণ করবেন, সে মনে মনে এ আশা করেছিল যে, সে-ই হবে আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী। কিন্তু যখন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় তখন উমাইয়া এবনে সলত ঈর্ষান্বিত হয়। আর এ কারণে সে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাসাল্লামের রেসালাতকে অস্বীকার করে। লোকটি ছিল অত্যন্ত চতুর এবং বক্তা হিসেবেও ভাল।

এক বাদশাহর দরবার থেকে সে প্রত্যাবর্তন করছিল, বদর নামক স্থান অতিক্রম করার সময় অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, এরা মক্কাবাসী ছিল যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে নিহত হয়েছে, তখন সে এ মন্তব্য করলো, যদি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবী হতেন তবে স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করতেন না (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেক)। বর্ণিত আছে যে, উমাইয়ার মৃত্যুর পর তার ভগ্নী ফারেয়া হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়। তিনি ফারেয়াকে তার ভাইয়ের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন ফারেয়া আরজ করলো, আমার ভাই উমাইয়া স্বপ্নে দেখলো, দু' ব্যক্তি তার ছাদ ভেঙে নীচে অবতরণ করেছে। একজন তার পায়ের কাছে আরেকজন তার মাথার কাছে বসেছে। যিনি পায়ের কাছে বসেছিলেন তিনি অপরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার অন্তর কি সতর্ক আছে? সে বললো, হ্যাঁ আছে। সে পুনরায় প্রশ্ন করলোঃ কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে পবিত্র আছে?

সে বললোঃ প্রতারিত অবস্থায় আছে। ফারেয়া বর্ণনা করে আমি আমার ভাই উমাইয়াকে এ স্বপ্নের তা'বির জিজ্ঞাসা করেছি। সে জবাব দেয়, আমার সম্পর্কে কোন প্রকার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করা হয়েছিল কিন্তু সে কল্যাণকে ফেরত দেয়া হয়। এ কথা বলার পরই সে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন হুশ ফিরে আসে তখন সে বলেঃ

জীবন যত সুদীর্ঘই হোক না কেন অবশেষে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এখন আমার যে অবস্থা, হায় আক্ষেপ! যদি তার পূর্বেই আমি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় একটি

বকরী নিয়ে চলে যেতাম এবং বকরী চরিয়ে জীবন অতিবাহিত করতাম, মানুষ থেকে দূরে থাকতাম তবে কত ভাল হতো! একথা সন্দেহাতীত যে, হিসাবের দিন বড় কঠিন হবে। আর এত কঠিন হবে যে, তার ভয়াবহ অবস্থায় শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফারেয়াকে বললেনঃ আমাকে তোমার ভাইয়ের কবিতা শোনাও। তখন ফারেয়া কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তার কবিতা মোমেন, তবে তার অন্তর ছিল কাফের। বর্ণিত আছে যে, এই উমাইয়া এবনে সালত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) আরেকটি কথাও বর্ণিত আছে। আর তা হলো এই, এ আয়াত বনী ইসরাঈলের বসুলাস নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাকে তিনটি দোয়া করার হুক্ম দেয়া হয় তথা তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তার তিনটি দোয়া কবুল হবে। তার স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি ছিল। একদিন তার স্ত্রী বললো, তোমার একটি দোয়া আমার জন্যে কর। সে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি চাও? সে বললো আমি চাই বনী ইসরাঈলের মধ্যে আমি সবচেয়ে সুন্দরী নারী হই।

বসুলাস দোয়া করলো, স্ত্রীলোকটি সবচেয়ে সুন্দরী হয়ে গেল। যখন ঐ স্ত্রীলোকটির উপলব্ধি হলো যে, সে বনী ইসরাঈলের মধ্যে সবেচেয়ে সুন্দরী রমণী, তখন সে তার স্বামীকে অবজ্ঞা করতে লাগলো। স্বামী রাগান্বিত হয়ে তার ব্যাপারে বদ দোয়া করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে মাদী কুকুরে পরিণত হলো এবং সে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করলো। এভাবে বসুলাসের দু'টি দোয়া শেষ হলো। এদিকে তার সন্তানেরা তাদের মাতার এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যাকুল হলো এবং তাদের পিতাকে বললো, এ অবস্থা আমরা সহ্য করতে পারছি না যে আমাদের মাতা কুকুরে পরিণত হয়েছে। লোকেরা আমাদের লজ্জা দেয়। অতএব, আপনি দোয়া করুন যেন আমাদের 'মাকে' আল্লাহ পাক তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে বসুলাস দোয়া করলো। তখন তার স্ত্রী আসল অবস্থায় ফিরে এল। এভাবে তার তিনটি দোয়াই বেকার গেল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ উপরোক্ত তিনটি ঘটনার মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থাৎ বলঅম এবনে বাউর অথবা উমাইয়া এবনে সালতের ঘটনাই আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

হাসান এবং এবনে কাইসান বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আহলে কিতাবের মধ্যে যারা মুনাফেক ছিল, তাদের সম্পর্কে যারা তাদের সন্তান-সন্ততির মতই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চিনতো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতি সঠিকভাবে ঈমান আনেনি।

বিখ্যাত তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ আয়াত দ্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং আল্লাহ্ পাক একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এমন এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন যাকে আল্লাহ্ পাক হেদায়েত লাভের সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন কিন্তু সে ঐ হেদায়েত গ্রহণ করেনি।

শানে নুযুল সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে আলোচ্য আয়াতের اٰيٰتِنَا শব্দটির অর্থ হবে হেদায়েত। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের 'আয়াত' শব্দটির অর্থ এখানে এসমে আযম।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাকে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে কোন কিতাব দান করা হয়েছিল। কিন্তু সে ঐ কিতাবের বিধি-নিষেধ থেকে এভাবে বের হয়েছে যেমন সর্প তার গর্ত থেকে বের হয়।

এবনে যায়েদ বলেছেন, সে আল্লাহ্ পাকের নিকট যা চায় আল্লাহ্ পাক তাকে তাই দান করেন। এটি হলো আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত 'আয়াত' শব্দটির অর্থ।[১]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকারের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতে এমন দুনিয়া লোভী লোকদের অর্থ লিপ্সা এবং পরিণাম সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে যারা সত্যকে গ্রহণের পর শুধু অর্থ লিপ্সার কারণে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করেছে এবং শয়তানের অনুগামী হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এমন লোকদের পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ।

বনী ইসরাঈলের একজন বিখ্যাত আলেমের পথভ্রষ্টতার দৃষ্টান্ত

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেনঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ (হে রসূল!) আপনার জাতির নিকট বনী ইসরাঈলের একজন আলেমের ঘটনা পাঠ করে শুনিয়ে দিন, তাকে আল্লাহ্ পাক এসমে আজম শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে যখন যা দোয়া করতো আল্লাহ্ পাক তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল করতেন কিন্তু অর্থ লিপ্সার কারণে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং অবশেষে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে ধ্বংস হয়।

ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য

তফসীরকারগণ লিখেছেন যে, এ ঘটনার উদ্দেশ্য হল বনী ইসরাঈলকে একথা জানিয়ে দেয়া যে বলঅম এবনে বাউরের মত এত বড় আলেম দরবেশ যখন

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪২৩-২৫
তফসীরে কবীর খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫৪৩-৫৪

আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করে, তখন তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। অতএব, তোমরা যদি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর বিরোধিতা কর তবে তোমাদের অবস্থাও অনুরূপ হবে। যদিও আয়াতের শানে নুযুলে বিশেষ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তবে ওলামায়ে কেরামের জন্যে আলোচ্য আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহ পাক যাকে এলম এবং হেদায়েত দান করেন, যাকে তাঁর নৈকট্য-ধন্য করেন তার কর্তব্য হল কু-প্রবৃত্তির তাড়নার অনুসারী না হওয়া এবং এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আল্লাহ পাকের নিকট আত্মরক্ষার জন্যে দোয়া করতে থাকা।

اللهم اعوذبك من علم لا نيفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يتبع ومن دعاء لا يسمع

(হে আল্লাহ! আমি এমন এলম থেকে পানাহ চাই যা উপকারী হয় না এবং এমন অন্তর থেকে, যা ভীত হয়না এবং এমন প্রবৃত্তি থেকে যা তৃপ্তি লাভ করেনা। আমীন)

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষ যদি জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু যে আদর্শের জ্ঞান অর্জন করলো সেই আদর্শে বিশ্বাসী না হয় এমনিভাবে কেউ কোন বিষয়ের এলম হাসিল করলো কিন্তু এলম মোতাবেক আমল করলো না তবে এ ব্যক্তির এলম তার কোন উপকারে আসবে না। এক কথায় আদর্শচ্যুত জ্ঞানী তথা আলেমে বে-আমলের কোন মর্যাদা নেই, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক এলম ও হেদায়েতের উচ্চ মর্তবা দান করেছেন সে যদি নারী, অর্থ সম্পদ, উচ্চ পদ মর্যাদা এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের পেছনে ছুটে আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করে, আল্লাহর রসূলের কথার বিরোধিতা করে তবে তার পরিণাম যে ভয়াবহ হবে তা সহজেই অনুমেয়। বনী ইসরাঈলের বলঅম এবনে বাউরের দৃষ্টান্ত একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষনীয় বিষয়

এ ঘটনা থেকে যে শিক্ষা নেয়া কর্তব্য তা হল কোন গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তির তথা কোন আলেমের গুণ-জ্ঞান, এলম এবং এবাদত বন্দেগী ও পরহেযগারীর উপর গৌরব করা উচিত নয়। কেননা, এমন অবস্থা মানুষকে যে কোন সময় ধ্বংসের মুখোমুখি করে দেয়, বরং কর্তব্য হল উপরোক্ত নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করা এবং দৃঢ় সংকল্প থাকা ও আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখা এবং সর্বদা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নেক আমলের তৌফিকের জন্য দোয়া করতে থাকা।

দ্বিতীয়তঃ এমন কাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা যা দ্বীনের ক্ষতির কারণ হতে পারে বিশেষ করে অর্থ সম্পদের লোভ, পদ মর্যাদার মোহ থেকে আত্মরক্ষা করা একান্ত জরুরী।

তৃতীয়তঃ পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক না রাখা এবং তাদের হাদীয়া তোহ্ফা গ্রহণ না করা। কেননা, বলঅম এবনে বাউর এ কারণেই বিপদে পড়েছিল। এ ঘটনা দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ যখন যে সমাজ বা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমগ্র জাতির ধ্বংস নেমে আসে কেননা, অশ্লীলতার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের আযাবকে আহবান জানানো হয়। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক এলম দান করেন তার কর্তব্য হল এলমের কদর করা এবং নেক আমলের জন্য সচেষ্ট থাকা। আত্মসংশোধনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে তথা আখেরাত সম্পর্কে কোন সময়ই নিশ্চিন্ত না হওয়া।[১]

فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ۝

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করার কারণে শয়তান তার পিছু নেয়, সে নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় দ্রুতবেগে সর্বনাশের দিকে যেতে থাকে। পরিণামে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج

যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তার মর্তবা আরও বুলন্দ করতাম। মুজাহেদ (রহঃ) এ বাক্যটির অর্থ এভাবে করেছেন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাকে কুফর ও নাফরমানী থেকে রক্ষা করতাম। একথার তাৎপর্য এই, যদি সে আমার আয়াত সমূহের উপর আমল করতো তবে তার মর্তবা আরও বুলন্দ হতো, আর এত বুলন্দ হতো যে শয়তান সেখান পর্যন্ত পৌঁছতেই পারতো না।

اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ

কিন্তু উচ্চ মর্যাদার দিকে অগ্রসর হবার স্থলে সে নিচের দিকে আকৃষ্ট হয়, সে প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয়, পার্থিব স্বার্থের মোহে নৈতিক দুর্বলতার কারণে তার অধঃপতন হয়, উচ্চতর স্থান থেকে সে নিম্নতর স্থানে চলে যায় এবং সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج

আলোচ্য আয়াতে যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হল, আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহের এলম এবং তার উপর আমলই হল দুনিয়াতে উন্নতি অগ্রগতি এবং আখেরাতে চির শান্তি, চির মুক্তি লাভের মাধ্যম। কিন্তু যে বা যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহের সম্মান না রাখে, পার্থিব স্বার্থের বশীভূত হয়ে আল্লাহ পাকের আয়াত

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৮১

সমূহকে অমান্য করে তবে সেই এলমই তার বা তাদের জন্যে মহাবিপদের কারণ হয়। অভিশপ্ত বলঅম এবনে বাউরের ঘটনা একথারই প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হল কুকুরের ন্যায়, যার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও অথবা তাকে ছেড়ে দাও, সকল অবস্থায় সে হাপিয়ে থাকে, আর তার জিভ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এখানে উল্লেখ্য, প্রত্যেক জন্তুই ভেতরের বিষাক্ত হাওয়া বের করে দেয়ার এবং বাইরের তাজা হাওয়া ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে মুখ এবং নাককে ব্যবহার করে। কিন্তু কুকুরই একমাত্র প্রাণী যে নিঃশ্বাস আনা নেয়ার জন্যে রসনাকে বের করে দেয়। কোরআনে করীমে কুকুরের সঙ্গে সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে যে, পার্থিব সুখ ও স্বার্থ লাভের এবং ভোগ-বিলাসের পেছনে কুকুরের মত ছুটে বেড়ায়। এজন্যে বলঅম এবনে বাউরের জিভকে তার বুক পর্যন্ত বের করে দেয়া হয়েছে।

আর তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۚ

"আর এ দৃষ্টান্ত হল সে সম্প্রদায়ের যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে মক্কাবাসীকে। যারা সর্বদা এ আকাঙ্ক্ষা করত যে, যদি তাদের নিকট কোন পথ প্রদর্শক আগমন করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর সঠিক পথ শিক্ষা দান করেন তবে তারা তাঁর অনুসারী হবে। কিন্তু যখন আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আগমন হল এবং তাঁর সত্যতার সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ তারা দেখল তখন তারা তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে বনী ইসরাঈলের সে সব লোককে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তৌরাত পাঠ করে তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানত এবং তাঁর আগমনের অপেক্ষা করত কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন, তখন তারা তাঁর সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করল এবং তৌরাতে বর্ণিত তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী গোপন করতে লাগল। তারা সত্য দ্বীন থেকে এভাবে দূরে সরে গেল যেভাবে বলঅম এবনে বাউর সরে গিয়েছিল। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫৭

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۝

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ঐ ব্যক্তির ঘটনা তাদেরকে শুনিয়ে দিন, হয়তো তারা চিন্তা করবে। আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ লাভ করার পর তথা দীনে হক্বের সন্ধান লাভের পর যদি কোন ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়ানায় শয়তান দ্বারা পরিচালিত হয়, সত্য দ্বীনের শিক্ষাকে ভুলে যায়, আত্মবিস্মৃত হয় তবে নিঃসন্দেহে সে বলঅম এবনে বাউরের দলভুক্ত এবং অভিশপ্ত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদের অনেকেরই জানা ছিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য নবী এবং তাঁর প্রতি ঈমান ব্যতীত আখেরাতে নাজাত লাভের কোন আশা নেই। তবুও তারা তাঁর শত্রুতায় তৎপর ছিল। সত্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তাদের জন্যে উপকারী হয়নি।

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ

যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে তথা এভাবে নিজেদের প্রতিই তারা জুলুম করেছে এবং এতে আমার কোন ক্ষতি হয়নি; বরং তারাই দুনিয়াতে কুকুরের দৃষ্টান্ত হয়েছে। আর আখেরাতেও তাদের সাথে কুকুরের মতই ব্যবহার করা হবে।

এখানে আরো একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য, মুশরেকদের অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো পবিত্র কোরআনে তুচ্ছ প্রাণী মশা মাছির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে কিন্তু যারা সত্যের জ্ঞান অর্জন করা সত্ত্বেও সত্যকে বর্জন করেছে এবং নিতান্ত ঘৃণ্য লোভ-লালসা চরিতার্থ করার মানসে অসত্যকে গ্রহণ করেছে, পবিত্র কোরআনে তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে ঘৃণ্য জন্তু কুকুরের সাথে।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

যদিও আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ হল হেদায়েতের মাধ্যম এবং উপকরণ, কিন্তু যাকে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন সে-ই হেদায়েত লাভ করে। আর যাকে আল্লাহ পাক তৌফিক থেকে বঞ্চিত করেন সে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ পাক কাকে হেদায়েতের তৌফিক দান করেন? এর জবাব এইঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ যার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আছে, যার অন্তরে সত্যকে গ্রহণের জন্যে আন্তরিকতা এবং সঠিক অন্বেষণ রয়েছে, আল্লাহ পাক তাকেই তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক মানুষকে দান করেছেন বিবেক বুদ্ধি এবং ইচ্ছা শক্তি, বিবেকের নির্দেশ মোতাবেক সে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে, এ জীবনের অনেক কঠিন কাজ সে এভাবেই করে থাকে। কিন্তু সেই বিবেক বুদ্ধি যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয় এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সরল সঠিক পথের সন্ধান লাভের জন্যে মোনাজাত করা হয় তবে আল্লাহ পাক তাকে সঠিক পথ লাভের তৌফিক দান করেন। কিন্তু যারা সত্যকে বুঝতে চায়না, জানতে চায়না এমনকি জেনেও মানেনা, তারা হয় চির ক্ষতিগ্রস্ত চির অভিশপ্ত।

﴿١٧٩﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ
بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ
يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

তরজমা

(১৭৯) আমি দোযখের জন্যে অনেক জ্বীন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি তাদের হৃদয় আছে তবে তারা বুঝতে চায়না, চোখ আছে তবে তা দ্বারা দেখেনা, কান আছে তবে তা দ্বারা তারা শোনে না, তারা চতুঃষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চেয়েও অধিকতর পথভ্রষ্ট, তারাই সে সব লোক যারা গাফেল।

(১৮০) আর আল্লাহ পাকের জন্যেই তো সকল উত্তম নাম অতএব, তোমরা তাঁকে ঐ নামে ডাক, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথ অবলম্বন করে তাদেরকে বর্জন কর, অচিরেই তারা তাদের কৃতকর্মের বিনিময় পেতে থাকবে।

(১৮১) আর আমার সৃষ্টির মধ্যে এমনও একদল লোক রয়েছে যারা সত্যের পথ প্রদর্শন করে এবং সে অনুসারেই ন্যায় বিচার করে থাকে।

তফসীরুল কোরআন

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ

'আর নিশ্চয় আমি দোযখের জন্যে অনেক জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি'।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) একাধিক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার জনৈক আনসারীর পুত্রের জানাযায় গমন করছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি তখন বললামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এই শিশুটি তো জান্নাতের একটি পাখী, সে কোন মন্দ কাজ করেনি, দোযখেও তার কোন ঠিকানা নেই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে আয়েশা! এখন আমার কিছু কথা শ্রবণ কর, আল্লাহ্ পাক জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এবং সে সব লোকও সৃষ্টি করেছেন, যারা জান্নাতী হবে। তিনি জান্নাতীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত তখনই নিয়েছেন, যখন তারা আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে ছিল। আর আল্লাহ্ পাক দোযখ সৃষ্টি করেছেন এবং দোযখীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন আর তাদের সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত তখনই হয়েছে যখন তারা আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে ছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে হাদীস সংকলিত হয়েছে, আল্লাহ্ পাক একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যখন সন্তান মায়ের উদরে থাকে তখন ঐ ফেরেশতা চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেনঃ

১. ঐ বন্দার রিয্ক

২. তার বয়স

৩. তার আমল

৪. এবং সে নেক হবে কি বদ।[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীস বিস্তারিতভাবে তফসীরে মাজহারীতেও উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা হয় বেহেশতে বা দোযখে লেখা হয়নি, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, তাহলে আমরা একথার উপরই ভরসা করে থাকি এবং আমল ছেড়ে দেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪২৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১১৮

اعملوا فكل ميسر لما خلق له

তোমরা কাজ করতে থাক, যাকে যে জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্যে তা সহজ করা হবে। অর্থাৎ যে জান্নাতী হবে তার জন্য জান্নাতের কাজ সহজ হবে আর যে দোযখী হবে তার জন্য দোযখের কাজ সহজ হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'টি লেখা হাতে নিয়ে আগমন করলেন এবং এরশাদ করলেন, তোমরা কি জান এই দু'টি লেখায় কি আছে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা কিছুই জানিনা, যদি আপনি বর্ণনা করেন তবে জানতে পারবো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ডান হাতের লেখাটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ লেখাটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, এতে জান্নাতবাসীর নাম, তাদের পিতার নাম গোত্রীয় পরিচয় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে আর এটি সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ রয়েছে, ভবিষ্যতে এতে কম বেশী হবে না। এরপর বাম হাতের লেখাটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এতে দোযখবাসীর এবং তাদের পিতার নাম ও গোত্রীয় পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, এটিও সম্পূর্ণ। ভবিষ্যতে এতে কম বেশী হবে না। তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যখন জান্নাত ও জাহান্নামের বিষয় সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে তখন আমলের প্রয়োজন আর কোথায়? তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা সঠিক পথে চলতে থাক, যে ব্যক্তি জান্নাতী হবে তার শেষ আমল জান্নাতীদের আমল হবে। আর যে দোযখী হবে তার শেষ আমল দোযখীদের আমল হবে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হস্ত মোবারক দ্বারা ইঙ্গিত করেন এবং লেখা দু'টি রেখে দিয়ে এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন একদল জান্নাতী হবে আর একদল হবে দোযখী।[১]

আয়াতের মর্মকথা

সূরা জারিয়াতে আল্লাহ পাক মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"(অর্থাৎ) আমি মানব দানবকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যেই সৃষ্টি করেছি"।

অর্থাৎ মানব ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর বন্দেগী করা কিন্তু সকলে তার জীবনের সাধনা দ্বারা এ উদ্দেশ্যকে সফল করেনা। আল্লাহ

১। তাফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪২৮-২৯

পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি অর্জন করে এবং নাফরমানদের জন্যে তৈরী দোযখই হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস স্থল। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

নিশ্চয় আমি তৈরী করেছি অনেক জ্বীন ও মানুষকে দোযখের জন্য অর্থাৎ তাদের কার্যকলাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে দোযখের কঠিন শাস্তি, তাই তারা যেন দোযখের জন্যেই তৈরী হয়েছিল।

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا

তাদের নিকট সত্য উপলব্ধি করার জন্যে অন্তর ছিল, দেখার জন্যে চোখ ছিল, শোনার জন্য কান ছিল কিন্তু অন্তর দিয়ে তারা সত্যকে উপলব্ধি করেনি, সত্যকে দেখারও চেষ্টা করেনি এমনকি শুনতেও তারা রাজি হয়নি, আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত শক্তি সমূহের সদ্ব্যবহার তারা করেনি, তাই তারা দোযখের জন্যে যোগ্য বিবেচিত হয়েছে, কেননা তারা হেদায়েত লাভের কোন ইচ্ছাই পোষণ করেনি এজন্যে দোযখই হবে তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

তারা হল চতুঃস্পদ জন্তুর ন্যায় যাদের কাজ হল শুধু পানাহার এবং নিদ্রা; বরং তারা চতুঃস্পদ জন্তুর চেয়েও অধিকতর পথহারা। কেননা চতুঃস্পদ জন্তু তার মালিককে চেনে এবং মালিকের তরফ থেকে আরোপিত কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে কিন্তু পথভ্রষ্ট দিশেহারা মানুষ তার মালিকের পরিচয় লাভ করতেও চেষ্টা করেনা, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত, অহরহ ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকটি মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন, দেখার জন্য চক্ষু, শোনার জন্য কর্ণ দান করেছেন। কেননা মানুষ অন্তর দিয়ে বুঝতে পারে, চক্ষু দিয়ে দেখে ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে যদি নিজের বিবেক দিয়ে বুঝতে অক্ষম হয় তবে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের যে সব জলন্ত প্রমাণ সৃষ্টি জগতে রয়েছে তা স্বচক্ষে দেখতে পারে। যদি তাতেও সে অপরাগ হয়, তবে অন্যের কাছে সত্য কথা শ্রবণও করতে পারে, আল্লাহর প্রেরিত নবীর কথা শ্রবণ করতে পারে। স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী কোরআন শরীফ দেখতে পারে কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত এ সমস্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করেনা, যদি তা করতো তবে তারা দোযখের ইন্ধন হতো না।

যেভাবে চতুঃস্পদ জন্তু তার পানাহারে ব্যস্ত থাকে ঠিক তারাও চতুঃস্পদ জন্তুর মতই ভোগ-বিলাস আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকে। প্রবৃত্তির তাড়না তাদেরকে ক্ষণস্থায়ী জগতের সুখ-সামগ্রী সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত রাখে, পরিণামে তারা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত

অসীম কুদরতের অগণিত জীবন্ত নিদর্শন সমূহ দেখেও দেখেনা এবং কোন দিন সত্যকে উপলব্ধি করেনা, তাই তারা শুধু পশুর মত নয়, বরং পশুর চেয়ে অধিকতর পথভ্রষ্ট, কেননা পশুরা মালিকের ডাকে সাড়া দেয় এবং পশুরা তাদের মালিককে দেখে চিনে কিন্তু পথভ্রষ্ট মানুষ তাদের মালিক আল্লাহ্ পাককে চেনেনা, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ۝

'এরাই সে সব লোক যারা গাফলদের আবর্তে নিপতিত'।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, জীব-জন্তুও তার স্রষ্টার ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল নয়; বরং সমগ্র সৃষ্টি জগৎই তার স্রষ্টার ব্যাপারে সজাগ, সচেতন। এজন্যে কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

'আর বস্তু মাত্রই আল্লাহর হাম্‌দের তসবীহ্ পাঠ করতে থাকে'। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আর আসমান জমিনে যত কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অতএব, সমগ্র সৃষ্ট জগৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে কিন্তু যারা হতভাগা মানুষ, তারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়, তাই তারা পশুর চেয়েও নীচ এবং হীন। আর এ মানবাকৃতির পশুরা অন্যায়-অনাচারে চতুঃষ্পদ জন্তু থেকেও অধিকতর ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয়।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল তাদের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে তাঁর জিকরে মশগুল হওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল না হওয়ার তাগিদ করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে এমন লোকদের বর্ণনা রয়েছে যাদেরকে দোযখের শাস্তি দেয়া হবে কেননা, তারা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর জিকরের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফলত করা, আল্লাহ্ পাকের বিধান অমান্য করা এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান না আনা হলো দোযখের শাস্তি হওয়ার কারণ। কেননা,

মানব অন্তর যখন আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, এ ক্ষণস্থায়ী দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি লোভ-লালসায় মত্ত হয় তখন সে চিরস্থায়ী জিন্দেগী তথা পরকালীন জিন্দেগীর কথা ভুলে যায়। আত্মবিস্মৃত হয়, ভুলে যায় সে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে এমনকি, তাঁর অবাধ্যও হয়। আর এটিই হল কারণ আল্লাহর রহমত থেকে মাহরুম হওয়ার। যখন মানুষ তার কৃতকর্মের কারণে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় তখন আল্লাহর আযাব তার জন্যে অবধারিত হয়। আর এ অবস্থাই হলো মানব জাতির জন্যে সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ হলো মহান আল্লাহর জিকর।[১] তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

"আর আল্লাহর জন্যেই তো সকল উত্তম নাম অতএব, ঐ নামেই তোমরা তাঁকে ডাক"।

শানে নুযুল

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে নামাযে দোয়া করেছে। এরপর রহমান শব্দ উচ্চারণ করেও দোয়া করে। তখন কাফেররা বলতে লাগল, মুসলমানদের কি হয়েছে, তারা দাবী করে যে তারা একই পালনকর্তার বন্দেগী করে অথচ এ ব্যক্তি তার মুনাজাতে দু'জনকে ডাকে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

যারা আল্লাহ পাকের জিকর সম্পর্কে উদাসীন তাদের অবস্থা ও শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণার পর এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে আল্লাহর জিকরে মশগুল হওয়ার তাগিদ করে এরশাদ করেছনঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ

হে মোমেনগণ! খবরদার! তোমরা কখনো এ হতভাগ্যদের ন্যায় আল্লাহ পাককে ভুলে যেয়োনা।

তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাঁর বিধান অমান্য করে সর্বহারায় পরিণত হয়েছে। তোমরা জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহ পাককে স্মরণ কর, তাঁর স্মরণ থেকে গাফলতের পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব, তোমরা শুধু এক আল্লাহ পাকেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁর নিকটই আশা কর, আর তাঁর প্রতিই কর ভরসা। সব সুন্দর এবং উত্তম নামই তাঁর অতএব, এ পবিত্র সুন্দর

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৬৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৮
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩০

নামে তোমরা তাঁকে ডাক। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের ৯৯ টি নাম রয়েছে, যে এ নাম সমূহকে পাঠ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ পাক বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।

তিরমিজী এবং বায়হাকী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের ৯৯ টি নাম রয়েছে, যে এ পবিত্র নাম সমূহ কণ্ঠস্ত করবে সে জান্নাতে যাবে।

الله الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور
الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض
الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير
الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود
المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد
المحصى المبدى المعيد المحيى المميت الحى القيوم الواجد الماجد
الصمد الواحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر
الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤف مالك
الملك ذوالجلال والاكرام الجامع الغنى المغنى المانع الضار النافع
النور الهادى البديع الباقى الوادث الرشيد الصبور

আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম সমূহ সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইতিপূর্বে যে নাম সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হয়তো এই যে, এ নাম সমূহ যে পাঠ করতে থাকবে সে জান্নাতে যাবে। এজন্যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ নাম সমূহকে মুক্তার হারের মত সাজিয়ে দিয়েছেন যেন লোকেরা সহজে কণ্ঠস্ত করতে পারে।

ইমাম তিরমিজী (রঃ) বর্ণিত হাদীসে যে নাম সমূহের উল্লেখ রয়েছে তন্মধ্যে সাতাশটি এমন নাম রয়েছে যা সরাসরি কোরআনে করীমে নেই। নাম সমূহ নিম্নরূপঃ

القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل
الباعث المحصى المبدى المحيى المميت الواحد الماجد المقدم
المؤخرالوالى ذوالجلال والاكرام المقسط المغنى المانع
الضار النافع الباقى الرشيد الصبور

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তী (রঃ) লিখেছেনঃ আরো কিছু নাম পবিত্র কোরআনে রয়েছে যা তিরমিজীর বর্ণনায় সংকলিত হয়নি। নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হল।

هو خير وابقے اله شاكر رب العالمين احد مالك يوم الدين
الا على الاكرم خفے اعلم بمن ضل عن سبيله واعلم بالمهتدين
القريب النصير القدير المبين الخلاق مبتليكم الموسع المليك
الكافى فاطر السموات والارض القائم بالقسط غافرالذنب
قابل التوب شديد العقاب نعم المولى الغالب على امره
سريع الحساب فالق الحب والنوى فالق الاصباح جاعل
الليل سكنا علام الغيوب عالم الغيب والشهادة ذو الطول
ذوانتقام رفيع الدرجات ذوالعرش ذو المعارج ذوالفضل
العظيم ذوالقوة ذوالمغفرة جامع الناس ليوم لاريب فيه
متم نعمته متم نوره عدو للكافرين ولى المؤمنين القاهر
فوق عباده اسرع الحاسبين مخرج الميت من الحى محى
الفاتحين مخزى الكافرين موهن كيد الكافرين فعال لما
يريد المستعان نور السموات والارض اهل التقوى اهل
المغفره نعم الماهدون رب الناس ملك الناس اله الناس

اقرب اليه من حبل الوريد
القائم على كل نفس بما كسبت احق ان تخشاه
الذى هو اغنى واقنى والذى هو امات واحيى والذى هو
اضحك وابكے والذى خلق الزوجين الزكر والانثى والذى
هلك عادن الاولى الذى لم يكن له ولد (لم يلد ولم يولد ولم
يكن له كفرا احد) ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن
له ولى من الذل الذى انزل على عبده الكتاب الذى بيده
ملكوت كل شى الذى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الذى
يبدء الخلق ثم يعيده الذى بيده الملك الذى بعث فى
الاميين رسولا لا اله انت سبحانك انى كنت من
الظالمين

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ এছাড়াও আল্লাহ পাকের এমন অনেক নাম রয়েছে যা কোরআনে করীমে নেই এবং ইমাম তিরমিজী সংকলিত বর্ণনাতেও নেই। যেমন ঃ

الحنان المنان الجواد الاجود الفرد الوتر
الصادق الجميل القديم البار الوافى العادل المعطى
المغيث الطيب الطاهر المبارك خالق الشمس والقمر
المنير رازق الطفل الصغير

এতদসত্ত্বেও একথা উপলব্ধি করা সঠিক হবে না যে, পবিত্র কোরআনে বা হাদীস শরীফে আল্লাহ পাকের যে সব নামের উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাকের নাম শুধু এগুলোই, এছাড়া আর নাম নেই কেননা, বর্ণিত আছে তৌরাতে আল্লাহ পাক তাঁর এক হাজার পবিত্র নামের উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেনঃ

اللهم انى اسئلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته فى
كتاب او علمته احدا من خلقك او استاثرت به فى علم الغيب عندك

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দোয়া করি তোমার সেই নাম নিয়ে যে নামে তুমি তোমার পবিত্র সত্ত্বাকে নামকরণ করেছ অথবা যে নাম তুমি তোমার কোন কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা যে নাম তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছ অথবা তোমার এলমে গায়বে সংরক্ষণ করে রেখেছ'।

অতএব, কাম্য হলো আল্লাহ পাকের সমস্ত নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, পবিত্র কোরআনের চারটি স্থানে আল্লাহ পাক আসমাউল হোসনার উল্লেখ করেছেন।

(১) আলোচ্য আয়াত

(২) সূরা বনী ইসরাঈলের শেষে

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

(৩) সূরা তাহার শুরুতে

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

(৪) সূরা হাশরের শেষে

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اَسْمَآئِهٖ

"যারা আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের ব্যাপারে বাঁকা পথ ধরে তাদেরকে বর্জন কর"।

যে সব নাম আল্লাহ পাকের মহান মর্যাদার সঙ্গে শোভা পায়না অথবা যে সব নামের অনুমতি ইসলামী শরীয়ত দেয়না অথবা আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম অসাধু উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেমন, যাদু টোনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের ব্যাপারে যারা বাঁকা পথ ধরে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ বর্জনীয়। আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের ব্যাপারে বাঁকা পথ ধরার কয়েকটি পন্থা তফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেনঃ

১. আল্লাহ পাকের পবিত্র নামকে অন্য কিছুর ব্যাপারে ব্যবহার করা যেমন, পৌত্তলিকরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকেই উপাস্য মনে করে এবং এলাহ থেকে লাত এবং আজিজ থেকে উজ্জাহ তৈরী করে মূর্তির নামকরণ করে।

২. আল্লাহ পাককে অশোভন নামে ডাকা, যেমন খৃষ্টানরা আল্লাহ পাককে পিতা বলে সম্বোধন করে।

৩. আল্লাহ্ পাককে এমন নাম বা গুণবাচক শব্দ দ্বারা ডাকা যা আদবের খেলাফ। যেমন, এভাবে বলা হে ক্ষতিকারক! হে বঞ্চিতকারী! হে বানরের স্রষ্টা! যদিও আল্লাহ্ পাক সব কিছুর স্রষ্টা, কিন্তু দোয়ার মধ্যে এ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা আদবের সম্পূর্ণ খেলাফ। এমনিভাবে যে নাম শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন নাম দ্বারা আল্লাহ্ পাককে ডাকা, যেমন হে সখী! বলা শুদ্ধ নয়। এমনিভাবে আলেম বা হাকিম বলা শুদ্ধ কিন্তু আকেল বা চিকিৎসক বলা শুদ্ধ নয়।[১]

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

যারা আল্লাহ্ পাকের নাম নিয়ে বাঁকা পথ অবলম্বন করে, তারা অচিরেই তাদের কার্যকলাপের বদলা অবশ্যই পাবে। এ বাক্য দ্বারা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নাম নিয়ে এলহাদ করে। এলহাদের আভিধানিক অর্থ হলো যে বিষয় আল্লাহ্ পাকের শানের খেলাফ তা তাঁর সাথে সম্পর্ক যুক্ত করা, অথবা তাঁর গুণাবলীতে অন্যকে শরীক করা। উভয় পথই নিন্দনীয়।

আয়াতের দু'টি শিক্ষা

আয়াত দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত হাম্‌দ বা প্রশংসার যোগ্য আর কেউ নয়। আর মানুষের প্রয়োজনের জন্যে মিনতি প্রকাশ করার যোগ্যও আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ নয়।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ পাককে ডাকতে হলে কোন্ নামে ডাকব? কিভাবে ডাকব? তাঁর নিকট মিনতি প্রকাশ করার আদব কি? এসব কথা দয়া করে তিনি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। কেননা, মানুষ তাঁর মহান দরবারের আদব রক্ষার যোগ্য নয়। এজন্যে তাঁর পবিত্র নাম সমূহের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ এ নাম সমূহ পাঠ করে তাঁর মনের কথা আল্লাহ্ পাকের দরবারে পেশ করতে পারে। এজন্যেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক তাঁর দরবারে দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করব। দোয়ার একটি বড় উপকারিতা এই, দোয়া একটি এবাদতও, এজন্যে আমল নামায় দোয়ার সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে ঃ

الدعاء مخ العبادة

১। খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৭

দোয়া হল এবাদতের নির্যাস স্বরূপ। যে উদ্দেশ্যে মানুষ দোয়া করে অনেক সময় সে উদ্দেশ্য সফল হয়।

আর কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যা বন্দা চেয়েছে তা তার জন্যে উপকারী নয় বলে যা উপকারী তা আল্লাহ পাক বন্দাকে দান করেন। এজন্যে মানুষ যদি দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় অথবা কোন প্রকার কষ্ট পায় তবে তার কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর পবিত্র নাম উল্লেখ করে দোয়া করা। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুপ্রাণিত করেছেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন বিপদ, পেরেশানী বা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তার কর্তব্য হল এ বাক্যগুলো পাঠ করা। তাহলে তার সব কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বাক্যগুলো হল এই ঃ

لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم

এমনিভাবে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসতাদরাকে সংকলিত হয়েছে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) বলেছেনঃ আমার একটি ওসিয়ত মেনে নিতে তোমাদের কি অসুবিধা আছে? তোমরা আমার ওসিয়ত শ্রবণ কর (তার উপর আমল কর) আর ওসিয়ত হল তোমরা সকাল সন্ধ্যায় এ দোয়া পাঠ কর ঃ

يا حى يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لى شانى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

"আর আমার সৃষ্টির মধ্যে এমনও একদল লোক আছে যারা সত্যের পথ প্রদর্শন করে আর সে অনুসারে ন্যায় বিচার কায়েম করে থাকে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর অবাধ্য নাফরমানদের কথা বলা হয়েছে। বিশেষতঃ যারা আল্লাহর নাম এবং গুণের ব্যাপারে বাঁকা পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের অপব্যাখ্যা করে তাদের অবস্থা এবং শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে সেই ভাগ্যবান লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা সত্যকে গ্রহণ করে এবং অন্যকেও সত্য পথ প্রদর্শন করে। তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রশংসা করা হয়েছে এ মর্মে যে, পৃথিবীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতই একমাত্র সত্য ও ন্যায় পথের

অনুসারী এবং অন্যদের জন্যে আদর্শ। এ উম্মত ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করেনা এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম সমূহ সম্পর্কে কোন প্রকার বাঁকা পথ অবলম্বন করে না। এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা বগভী লিখেছেন, আতা (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে 'উম্মত' শব্দ দ্বারা মোহাজেরীন এবং আনসারদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর এ উম্মতের সে সব লোক তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের অনুসরণ করে।

কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, আমরা জানতে পেয়েছি এ আয়াত পাঠ করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এ আয়াত তোমাদের জন্য। আর এমন খোশখবরী সেই উম্মতকেও প্রদান করা হয়েছে যারা তোমাদের সামনে রয়েছে (অর্থাৎ ইহুদী নাসারা)। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

কালবী (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কোন বিশেষ উম্মত উদ্দেশ্য নয়; বরং এ আয়াতে তাদের উল্লেখ রয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখিত গুণাবলী পাওয়া যায়। যেমন একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা সত্য–বিমুখ, যারা অত্যাচারী তাদেরকে দোযখের জন্যে তৈরী করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, একদল লোককে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যারা সত্যের অনুসারী এবং সত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানায় এবং ন্যায় বিচার কায়েম করে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, সব যুগেই সত্যের সন্ধানী এবং সত্যের অনুসারী একদল লোক থাকবে। এ আয়াতের সম্পর্ক সেই হাদীসের সাথে যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মতে সর্বদা এমন একদল লোক সৃষ্টি হতে থাকবে যারা আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করতে থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবেনা, কেয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থাই থাকবে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

অর্থাৎ আমি অনেক জ্বীন ও মানুষকে দোযখের জন্যে তৈরী করেছি। আর এ আয়াতের পরই আলোচ্য আয়াতে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা হক্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং হক্বের দিকে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩৪-৩৫

তারা মানুষকে আহ্বান করে ও ন্যায় বিচার কায়েম করে, তাদেরকে বেহেশতের জন্যে তৈরী করা হয়েছে। কাতাদা এবং এবনে জোরায়েয বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আলোচ্য আয়াতে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্যে খোশ খবরী রয়েছে।

পবিত্র কোরআনের এ আয়াত দ্বারা দু'টি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

১. যারা অন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদের কর্তব্য হলো শরীয়তের বিধান মেনে চলা, যে কোন মূল্যে হক্ব বা সত্যের অনুসারী হওয়া এবং শুধু নিজেই যে হক্বের অনুসারী হবে তাই নয়; বরং অন্যদেরকেও হক্ব কবুল করার আহবান জানাবে।

২. যদি কোন কারণে পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্ব হয় তবে আদল বা ন্যায় বিচার কায়েম করবে, কোন অবস্থাতেই যেন ন্যায় বিচারের মূলনীতি পরিহার না করা হয় সেদিকে সর্বক্ষণ সর্তক দৃষ্টি রাখবে।

এ দু'টি মূলনীতি হলো একটি জাতির উন্নতি-অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি ও সাফল্য লাভের সুনিদৃষ্ট পন্থা। যুদ্ধ হোক কি শান্তি, বন্ধুত্ব হোক কি শত্রুতা কোন অবস্থাতেই হক্ব ও ইনসাফ এ দু'টি মূলনীতির বরখেলাফ করা যাবে না। মুসলিম জাতি যতদিন পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের এ শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ততদিন পর্যন্ত বিশ্ব নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতেই ছিল। কিন্তু যখন থেকে এ মূলনীতি বিস্মৃত হয়েছে তথা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং ন্যায়বিচারকে উপেক্ষা করা হয়েছে তখন থেকেই মুসলিম জাতি পতনোম্মুখ হয়েছে।

سبق پرہ شجاعت کا عدالت کا صداقت کا = لیا جائگا تجہ سے کام دنیا کی امامت کا

"বীরত্ব, সত্যবাদিতা এবং ন্যায় বিচারের পাঠ পুনরায় গ্রহণ কর, বিশ্বের নেতৃত্ব তোমার প্রতিই অর্পণ করা হবে"।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, বর্তমান পৃথিবীতে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে মানেনা, সত্য ও ন্যায়বিচারের ধার ধারেনা সর্বদা অন্যায় অনাচারেই থাকে লিপ্ত, তাদের উন্নতি অগ্রগতি হচ্ছে দেখার মত, এর কারণ কি? পরবর্তী আয়াতেই রয়েছে এ প্রশ্নের জবাব।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

অর্থাৎ যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, আমার হেকমত ও রহমতের কারণে হঠাৎ তাদের শাস্তি বিধান করিনা, তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি এবং ধীরে ধীরে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়। অবশেষে তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমানে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের অবসানের মাধ্যমে। বিগত সত্তর বছর সমাজতন্ত্র কোটি কোটি মানুষের জন্যে আযাবে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ পাক এবং

১। তাফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৭২

তাঁর রসূলকে অস্বীকার করাই ছিল তাদের প্রথম কাজ। কিন্তু আজ গোমরাহীর অন্ধকার কেটে গেছে, হক্ব এবং ন্যায় বিচার ব্যতীত, মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ব্যতীত মানুষের জীবন দুর্বিষহ- এ সত্য আজ তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ
يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٤﴾
أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ
مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ
حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ
وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ
ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ
حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

তরজমা

(১৮২) আর যারা আমার নিদর্শন সমূহকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনিভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারবে না।

(১৮৩) আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মজবুত।

(১৮৪) তারা কি চিন্তা করেনা? যে, তাদের সহচরের মধ্যে আদৌ উম্মাদের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। সে-তো এক প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।

(১৮৫) তারা কি লক্ষ্য করেনা? আসমান ও জমিনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ পাক যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে, আর এ বিষয়েও যে, হয়তো তাদের নির্ধারিত সময় অতি নিকটবর্তী অতএব, এরপর তারা আর কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে?

(১৮৬) আল্লাহ্ পাক যাকে গোমরাহ্ করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ছেড়ে দেন, যেন তারা উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়।

(১৮৭) (হে রসূল!) তারা আপনার নিকট কেয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করে যে, কোন্ সময় তা ঘটবে? আপনি বলুন, এর খবরতো একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকটই, শুধু তিনিই যথা সময়ে তা প্রকাশ করবেন, আসমান জমিনে তা অত্যন্ত ভয়ংকর ঘটনা হবে। যখন তোমাদের উপর তা আসবে তখন অতর্কিত ভাবেই আসবে। তারা আপনাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন আপনি এ সম্পর্কে অবহিত। (হে রসূল!) আপনি বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

তফসীরুল কোরআন

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

আর যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, যারা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার আদর্শের বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করেছে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের নীতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অতীব ভয়ানক। কেননা তাদেরকে তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হয় না; বরং তাদেরকে আল্লাহ্ পাক অবকাশ দেন, প্রথমেই কোন আযাব দেয়া হয় না; বরং সুখ-সামগ্রীর দ্বার তাদের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়া হয়। তাদের দুর্নীতি এবং দৌরাত্মের শাস্তি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল এবং নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে, এভাবে তারা অধিকতর অন্যায় আচরণে লিপ্ত হয়, তাদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হয়ে যায়। তারা সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক অবস্থায় জুলুম-অত্যাচারে গা ভাসিয়ে দেয়, এরপর একদিন অতর্কিতভাবে তাদের উপর আযাব আসে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করেছে, যেমন আবু জেহেল ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে ধীরে ধীরে শাস্তি দেয়া হবে।[১]

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১৪২

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াত মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, কেননা তারাই আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, যারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব, এভাবে যে তারা বুঝতেও পারবে না যে, তারা পায়ে পায়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আতা (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল আমি তাদের শাস্তির ব্যাপারে এমন গোপন ও সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করবো যে, তাদের কোন কিছুর খবরই হবে না।

কালবী (রহঃ) বলেছেন, ধীরে ধীরে শাস্তি দেয়ার তাৎপর্য এই, তাদের অন্যায় অনাচার তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয় এবং মোহনীয় হবে, এরপর তাদেরকে ধ্বংস করা হবে।

যাহ্যাক (রহঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল কাফেররা যত নতুন নতুন পাপকার্যে লিপ্ত হবে আমি তাদেরকে তত নতুন নতুন নেয়ামত দিতে থাকবো। যখন তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হবে তখন তাদেরকে ধ্বংস করা হবে।

সুফীয়ান সওরী (রহঃ) বলেছেন, আমি তাদেরকে দুনিয়ার নেয়ামত এবং সম্পদে সমৃদ্ধ করবো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলিয়ে দেব। এরপর কঠোর শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে।[১]

وَأُمْلِيْ لَهُمْ

অর্থাৎ আমি তাদের বয়স বাড়িয়ে দেব এবং তাদের অন্যায় কাজগুলো তাদের নিকট পছন্দনীয় করে দেব এবং তাদের যাবতীয় অন্যায়-অনাচার তাদের জন্যে সহজ হয়ে যাবে। তারা পাপাচারে লিপ্ত থাকবে। অবশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে।

إِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ

অর্থাৎ আমার ধরা বড় শক্ত ধরা। অথবা এর অর্থ হল, আমার কৌশল হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুদৃঢ়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, তাদের বিরুদ্ধে আমার গোপন তদবীর অত্যন্ত শক্ত এবং কঠিন। বর্ণিত আছে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে সে সব দূরাত্মাদের সম্পর্কে যারা আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবী করতো এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্রুপ করতো এবং মোমেনদের প্রতিও ঠাট্টা করতো। অবশেষে আল্লাহ পাক এক রাতেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩৫

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩৫

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল তথা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য এবং নাফরমান লোকদের অবস্থা ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে আর তা হলো, কাফেররা সত্য সম্পর্কে চিন্তা করেনা, তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারেও তথা আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও তারা এতটুকু চিন্তিত হয় না। এজন্যে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করে এমনকি, আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদেও বিশ্বাস করেনা, যদি তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং তাঁর মোজেযা সম্পর্কে চিন্তা করতো তবে তাঁর রেসালত সম্পর্কে তাদের কোন সন্দেহ থাকতো না। এমনিভাবে, যদি তারা আসমান জমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করতো, দিন-রাতের নিয়মিত পরিবর্তনের ব্যাপারে চিন্তা করতো তবে তারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদকে অস্বীকার করতে পারতো না। অতএব, তাদের কর্তব্য হল এ সব বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা। আর এ বিষয়ে চিন্তা করাও তাদের কর্তব্য- যে কোন সময়ই মৃত্যুর অলজ্ঘনীয় বিধান তাদের উপর কার্যকর হতে পারে এবং তাদের জীবনের অবসান ঘটতে পারে অতএব, মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করাও তাদের কর্তব্য।

এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সত্য-বিমুখ কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তথা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো, আলোচ্য আয়াতে তাদের সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে। এ দূরাত্মারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ সন্দেহ প্রকাশ করতো যে, যিনি নবুওয়্যতের দাবীদার তিনি পাগল ননতো? (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক) এতদ্ব্যতীত, তারা আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদ সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করতো। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাদের এ ভিত্তিহীন সন্দেহের জবাব দিয়েছেন।[১]

শানে নুযুল

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমার সাফা নামক পাহাড়ে আরোহণ করে কোরায়শের প্রত্যেক খানদানের লোকদের নাম ধরে ডাক দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১৭০
তফসীরে কবীর খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৭৫

আত্মরক্ষার আহ্বান জানান। আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং আখেরাতের আযাব থেকে নাজাত লাভের তাগিদ দেন। কিন্তু দূরাত্মা পৌত্তলিকরা তাঁর ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়নি, বরং তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত অশালীন এবং বেআদবী পূর্ণ মন্তব্য করে বলে, তোমাদের সাথী কি উন্মাদ হয়ে গেছে যে রাতভর চিৎকার দিচ্ছে? (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক) তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ

অর্থাৎ তারা কি চিন্তা করেনা যে, তাদের সাথী তথা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উন্মাদ বা বিকৃত মস্তিস্ক নন, এ সত্য তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট, তিনি তোমাদের মাঝেই অতিবাহিত করেছেন তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, বিশ্বস্ততা, তাঁর আমানতদারী সর্বজন-বিদিত, স্বীকৃত এবং সকলের নিকট প্রশংসিত ও অভিনন্দিত। তিনি যে সব হেকমত পূর্ণ কথা বলেন, তা শ্রবণ করেও কি তারা এ সত্য উপলব্ধি করেনা যে, কোন বিকৃত মস্তিস্ক লোক এমন কথা বলতে পারেনা।

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

মূলতঃ তিনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, তাঁর দায়িত্ব হলো তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা।

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তারা কি আসমান জমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে লক্ষ্য করেনা? যে, কি বিশাল, বিস্তৃত জমিনকে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন, কীভাবে তিনি এ নীলাভ আকাশকে কোন খুঁটি ব্যতীত ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন, কীভাবে নির্ধারিত সময়ে দিন রাতের পরিবর্তন হচ্ছে, এসব কি তারা দেখেনা? তারা কি আদৌ চিন্তা করেনা? আল্লাহ্ পাক এ পৃথিবীতে কত কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন, আর তারা এ বিষয়েও কি চিন্তা করেনা যে, তাদেরকে প্রদত্ত সময় হয়তো ঘনিয়ে এসেছে, যে কোন মুহূর্তে তাদেরকে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

যদি এসব কথার প্রতি চিন্তা করে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি তারা বিশ্বাস না করে, তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে এরপর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে? বিস্ময়কর বিষয় এই, হেকমতপূর্ণ এবং তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ পবিত্র গ্রন্থ্ কোরআনে করীম পেয়েও তারা পবিত্র কোরআনের আলোকে নিজেদের অন্তরকে আলোকিত করেনি, আরো বিস্ময়কর বিষয় এই যে, নবীগণের দলপতি, বিশ্বনবী হযরত রসূলে

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখেও এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েও তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করেনি।

প্রকৃত অবস্থা এই যে, হেদায়েত আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে, তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন, সে-ই হেদায়েত পায় তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ط

আল্লাহ পাকেরই হাতে হেদায়েত, তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন, সে-ই হেদায়েত লাভ করে আর যাকে হেদায়েত করা তাঁর মর্জি না হয় সে পথভ্রষ্ট হয় এবং তার কোন পথ প্রদর্শক থাকেনা। হেদায়েতের সকল আয়োজন তার ব্যাপারে ব্যর্থ হয়। তখন তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে দিশেহারা অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে থাকে।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ط

"(হে রসূল!) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে আসবে"?

শানে নুযুল

এবনে জরীর কাতাদার (রঃ) সূত্রে লিখেছেনঃ কোরায়শ গোত্রের লোকেরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলোঃ আপনিতো আমাদের আত্মীয়, আপনি ইঙ্গিত করুন যে, কেয়ামত কবে আসবে? এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হামল এবনে আবি কোশায়ের এবং শামুল এবনে যায়েদ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলো, আপনিতো নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবী করেন, তাহলে আমাদেরকে বলুন, কেয়ামত কবে আসবে? আমরা কেয়ামত সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, তারা এ বিষয়ে কেন চিন্তা করেনা যে, যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান তাদের উপর কার্যকর হতে পারে, এভাবে তারা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে পারে। মূলতঃ যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তার উপর কেয়ামত কায়েম হয়ে যায়। এটি ছিল ব্যক্তিগত কেয়ামতের কথা।

আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে সামগ্রিক ভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে কেয়ামত কবে আসবে? যেভাবে কোন ব্যক্তি জানে না তার মৃত্যু কবে আসবে ঠিক তেমনি সারা বিশ্বের মৃত্যু কবে আসবে তা-ও কেউ জানে না। এ বিষয়ের এলম একমাত্র আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে।

তাই কাফেরদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ

(হে রসূল!) আপনাকে তারা কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, কেয়ামত কবে আসবে? আপনি বলুন কেয়ামত কবে হবে তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন আর কেউ নয়, এটি হবে আসমান জমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভয়ংকর ঘটনা, যা তোমাদের নিকট হঠাৎ আসবে। (হে রসূল!) তারা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন আপনি এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন যে, (হে রসূল!) আপনি বলুন কেয়ামত কবে আসবে? এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল কেয়ামত কখন আসবে তার নিদৃষ্ট সময় একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন, আর কেউ নয়। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে কেয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞান'। আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا

নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, জীব্রাঈল (আঃ) যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

متى الساعة

অর্থাৎ কেয়ামত কখন আসবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তিনি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী জানেন না।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ কেয়ামতের সময় মানুষের কাছ থেকে এজন্যে গোপন রাখা হয়েছে যেন মানুষ সর্বদা এ সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, ফলে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হবে।[১]

আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতকে الساعة। বলা হয়েছে। এর কারণ এই, কেয়ামত হটাৎ আসবে অথবা এজন্যে কেয়ামতকে الساعة।বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন মানুষের হিসাব নিকাশ অনতিবিলম্বে হবে। অথবা কেয়ামতের দিনকে الساعة। এ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা- ৮০

জন্যে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন মানুষের জন্যে যত সুদীর্ঘই হোক না কেন আল্লাহ্ পাকের নিকট তা এক ঘন্টার বেশী সময় নয়।

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ

ইমাম কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ পাক কেয়ামতের এলম নিজের কাছেই রেখেছেন, তিনি ব্যতীত এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না, তিনি কোন সৃষ্টিকে এ সম্পর্কে অবগত করেননি। কোন নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা অথবা কোন নবী রসূলকেও তিনি বিষয়টি জানাননি।[১]

ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

অর্থাৎ আসমান জমিনে কেয়ামতের ঘটনা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আসমান ও জমিনবাসীদের নিকট কেয়ামতের বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছে আর সব গোপন বিষয়ই কঠিন হয়। অথবা এর অর্থ হল আসমানের ফেরেশতা এবং জমিনের অধিবাসীদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষা এ সম্পর্কে জানা, অথচ এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। অজানার এই অবগুণ্ঠন সকলেই জন্যেই ভারী এবং কঠিন। অথবা এর অর্থ এই, যেহেতু এটি অত্যন্ত ভয়ংকর বিষয় তাই জ্বীন ফেরেশতা এবং মানব জাতির নিকট কেয়ামতের বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছে।[২]

ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এ আয়াতের দৃষ্টান্ত হলঃ

وَيَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا

অর্থাৎ লোকেরা দুনিয়ার মায়ায় মুগ্ধ অথচ অত্যন্ত কঠিন দিন তাদের সামনে রয়েছে যার চিন্তা তারা ছেড়ে দিয়েছে। কেয়ামতের দিন অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ংকর, কেননা সেদিন আসার পূর্বে প্রাণী মাত্রকেই ধ্বংস হতে হবে। কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে কোরআনে করীমে বিভিন্ন রকম সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ

(সূরা বাকারা)

সেদিন, যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, তার মাতা থেকে, পিতা থেকে এবং তার পত্নী ও সন্তান থেকে। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩৭
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩৮

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ

অর্থাৎ সেদিন একে অপরের জন্যে কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে এক আল্লাহ পাকের। (সূরা ইনফিতার)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ

'যেদিন গোপন বিষয় সমূহ পরীক্ষিত হবে সেদিন তার কোন সামর্থ থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না'। (সূরা তারেক)

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ

(সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে এবং কাফেররা বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম) এমনভিাবে কোরআনে করীমের বহু আয়াতে কেয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে।

لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ط

কেয়ামত ঘটবে অতর্কিত ভাবে

কেয়ামত তোমাদের নিকট অতর্কিতভাবেই সংঘটিত হবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু' ব্যক্তি বিক্রেতা এবং ক্রেতা তাদের মাঝে কাপড় প্রসারিত করবে, বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার পূর্বেই অতর্কিতভাবে কেয়ামত কায়েম হবে।

এমনিভাবে কোন ব্যক্তি তার কূপ ঠিক করতে থাকবে কিন্তু পানি পান করার পূর্বেই কেয়ামত অকস্মাৎ ঘটবে। কোন ব্যক্তি তার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু দুধ পান করার পূর্বে হটাৎ কেয়ামত আসবে। কোন ব্যক্তি খাবারের লোকমা মুখে তুলে দিতে চাইবে কিন্তু খাবার গ্রহণের পূর্বেই কেয়ামত কায়েম হবে। এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামত হটাৎ সংঘটিত হবে যদিও তার আলামত বা চিহ্ন সমূহ বহু পূর্ব থেকে প্রকাশ পেতে থাকবে।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ এমন অবস্থায় শিংগায় ফুক দেয়া হবে যখন লোকেরা পথে-ঘাটে, হাট-বাজারে নিজ নিজ মজলিসে ব্যস্ত থাকবে। এমনকি, ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর কেনা-বেচার ব্যস্ত থাকবে, এমন সময় শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً

'তারা শুধু বিকট শব্দেরই অপেক্ষা করছে'।

তেবরানী হযরত আকাবা এবনে আমর (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের পূর্বে ঢালের সমান কৃষ্ণবর্ণের একটি মেঘখন্ড আকাশের পশ্চিম দিক থেকে উঠবে, এমনকি সমস্ত আসমানে তা ছড়িয়ে পড়বে। এরপর কোন ঘোষক ঘোষণা করবেঃ

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ

'আল্লাহ পাকের আদেশ এসে গেছে, অতঃপর তোমরা তা ত্বরান্বিত করোনা'।

এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, দু' ব্যক্তি তাদের মাঝে কাপড়টা ছড়াবে কিন্তু তা ভাঁজ করার পূর্বেই কেয়ামত চলে আসবে।

হযরত ইসরাফিল (আঃ)-এর শিংগায় ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে কেয়ামতের ঘোষণা হবে। শিংগায় ফুঁক দেয়ার আওয়াজ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ক্রমান্বয়ে তা এত কঠিন হবে যে, পাহাড় পর্যন্ত টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। জমিন ফেটে যাবে, আসমান তুলার মত উড়তে থাকবে। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ আলোবিহীন হয়ে যাবে। সাগরগুলো শুষ্ক হয়ে যাবে। মানুষ জ্বীন সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

(হে রসূল!) তারা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন আপনি এ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। আপনি তাদেরকে বলে দিন কেয়ামতের এলম শুধু আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।[১]

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ
وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛ وَمَا مَسَّنِىَ
السُّوْٓءُ ۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِىْ
خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ
اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ
فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

১। খোলাসতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩১

তরজমা

(১৮৮) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন, এতদ্ব্যতীত আমি আমার নিজের ভাল মন্দেরও মালিক নই, তবে যদি আমি গায়বী বিষয় জেনে নিতে পারতাম তবে অনেক কল্যাণই লাভ করে নিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না, আমিতো শুধু মোমেনদের জন্যে ভয় প্রদর্শক এবং সুসংবাদ পরিবেশক মাত্র।

(১৮৯) তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি একজন থেকে তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার জীবন-সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যেন সে তার নিকট শান্তি পায়, অতঃপর স্বামী যখন স্ত্রীকে ঢেকে নেয়, গর্ভ লঘুভার হয় তা নিয়ে সে চলাফেরা করতে পারে, এরপর যখন তা গুরুভার হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তারা এই বলে আরজী পেশ করে, হে পরওয়ারদেগার! যদি আমাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান কর তবে আমরা অবশ্যই তোমার চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

(১৯০) এরপর আল্লাহ পাক যখন তাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান করেন তখন তারা তাঁরই প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে শরীক করতে যায় কিন্তু তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ পাক তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে পৌত্তলিকদের ভুল ধারণা নিরসন করা হয়েছে যে, "নবীগণের নিকট গায়বী এলম রয়েছে যেভাবে আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন তেমনি নবীগণও সবকিছু সম্পর্কে অবগত। ভাল-মন্দ সব বিষয় নবীগণের এখতিয়ারে রয়েছে, যার ইচ্ছা উপকার করেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষতিগ্রস্ত করেন"। তাদের এ ভুল ধারণার কারণেই তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কেয়ামতের নিদৃষ্ট তারিখ জানতে চেয়েছে, যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে এই ভুল ধারণার নিরসন-কল্পে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এলমে গায়ব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অনু পরমানু সম্পর্কে জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকেরই বৈশিষ্ট্য। এতে কোন সৃষ্টি শরীক নেই, কোন ফেরেশতা বা নবীর নিকট সমগ্র সৃষ্টি জগতের এলম নেই। ঠিক এভাবে ভাল মন্দের অধিকারী হওয়া আল্লাহ পাকেরই বৈশিষ্ট্য। এতে মানুষকে শরীক করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। কেননা শেরকের অন্ধকার দূরীভূত করার লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, আগমন করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন যে, আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের অধিকারী নই"।

একথা সর্বজন-বিদিত ও স্বীকৃত যে, মানুষ যত বড় গুণী-জ্ঞানী বা শক্তিশালীই হোক প্রকৃত অবস্থা এই যে, তার নিজস্ব কোন কিছুই নেই। জ্ঞান-গুণ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ, সম্পদ-সমৃদ্ধি, যোগ্যতা-জনপ্রিয়তা এক কথায় যা কিছু মানুষের কাছে থাকে সবই আল্লাহ পাকের দান। মানুষকে এসব কিছু আল্লাহ পাক দান করেন বলেই সে পায়। অতএব, সে কোন কিছুরই মালিক নয়; বরং মহান দাতা আল্লাহ পাকের দান গ্রহীতা মাত্র। এ সত্যটি কোরআনে করীম আলোচ্য আয়াতে সমগ্র বিশ্বমানবের সম্মুখে তুলে ধরেছে যেন মানুষ নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণায় পতিত না থাকে, বরং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর অনন্ত অসীম দানের জন্য কৃতজ্ঞ হয়।

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের প্রিয় রসূল, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃত, তিনি সমস্ত নবী রসূলগণের দলপতি, তাঁর চেয়ে অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন কোন মানুষ পৃথিবীতে আসেনি এবং কোনদিনও আসবে না, তাঁকে আল্লাহ পাক এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) আপনি বিশ্ববাসীকে জানিযে দিনঃ "আমার ভাল-মন্দ বা মঙ্গল-অমঙ্গলের উপর আমার কোন অধিকার বা ক্ষমতা নেই, আমার সব কিছুই আল্লাহ পাকের দান, আমি যদি গায়বী খবর জানতে পারতাম তবে আমি অনেক মঙ্গল, অনেক কল্যাণ লাভ করতাম, অনেক অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হতাম"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারও নিকট গায়বী বিষয়ের এলম নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট লোকেরা প্রশ্ন করতো, তিনি জবাবের অপেক্ষা করতেন আল্লাহ পাকের দরবার থেকে, জবাব আসলে তিনি তা মানুষকে জানিয়ে দিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! পৃথিবীর কোন্ স্থানটি আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয়? আর কোন্ স্থানটি আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয়? তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে জানিনা, জীব্রাঈল (আঃ) আসুক, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। একটু পরে জীব্রাঈল (আঃ) আসলেন তখন উপরোক্ত কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীব্রাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন। জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, আমিও এই মুহূর্তে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারছিনা, আপনি অনুমতি দিন আমি আল্লাহ পাকের দরবারে এ প্রশ্ন করবো। অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে জবাব নিয়ে আসলেন যে, পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের প্রিয় স্থান হলো মসজিদ আর অপ্রিয় স্থান হলো বাজার। এমনিভাবে বহু ঘটনা রয়েছে যাতে দেখা যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের

তরফ থেকে জবাবের অপেক্ষা করেছেন। যেমন আরেকদিনের ঘটনা। একজন সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! দুনিয়াতে যখন আপনার দীদারের জন্যে মন ব্যাকুল হয় তখন দ্রুত হাযির হই আপনার দরবারে এবং জেয়ারত লাভে ধন্য হই। নয়ন ও মনের শান্তি লাভ করি, কিন্তু বেহেশতে যদি বিনা বাধায় আপনার দরবারের হাযির না হতে পারি, আপনার জেয়ারত লাভে ধন্য না হই তখন বেহেশতের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে, সেখানে কি আপনার জেয়ারত লাভে সক্ষম হব? তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমিক সাহাবীর আবেগ পূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিলেন না; বরং এরশাদ করলেন, অপেক্ষা কর, দেখি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে কি জবাব আসে। একটু পরেই জীব্রাঈল (আঃ) আসলেন পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াত নিয়েঃ

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

“যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুগত হবে, তাদের হাশর আম্বিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দীকগণ; শহীদগণ ও নেককারগণের সঙ্গে”।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সে ব্যক্তি কোথায় যে আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে, বেহেশতে তার সাথে আমার দেখা হবে কি-না। ঐ সাহাবী তখন তাঁর নিকট হাযির হলেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ

المرء مع من احب

অর্থাৎ পৃথিবীতে যার সাথে যার ওঠা বসা ও ভালবাসা, আখেরাতেও তার সাথে হবে তার দেখা। ঐ সাহাবীকে এ বাক্যের মাধ্যমে তিনি যে জবাব দিলেন তা হল- যদি আমার সাথে তোমার মহব্বত থাকে তবে বেহেশতে তোমার সাথে হবে আমার দেখা। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব আসতো। এজন্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

(আর তিনি নিজের ভাবাবেগে কোন কথা বলেন না, তিনি যা কিছু বলেন তা আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়।) আর এজন্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে

দিন যে, আমার নিজের ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমার কোন অধিকার বা ক্ষমতা নেই তথা দুনিয়া বা আখেরাতের কোন কল্যাণ অর্জনের এবং কোন অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে আত্মরক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। যা কিছু আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন তাই কার্যকর হয়। যদি আমি গায়বী খবর জানতাম তবে অধিক পরিমাণে কল্যাণ লাভ করতাম। সকল ক্ষতিকর, অকল্যাণকর বিষয় থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করতাম। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ যদি আমি জানতাম কখন আমার মৃত্যু হবে তবে আমি অনেক ভাল ভাল কাজ করে নিতাম। আর কোন সময়ই আমার কোন ক্ষতি হতোনা। সব বিপদাপদ থেকে নাজাত পেতাম। কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেনঃ যদি আমি গায়বের কথা জানতাম তথা কেয়ামত কবে হবে তা জানতাম তবে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম এবং তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনতে আর তোমরা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করতে না, ফলে বর্তমানে তোমাদের দ্বারা আমার যে কষ্ট হচ্ছে তা হতো না।[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মুনাফেকরা যে অপবাদ আরোপ করেছিল তা দূরীকরণার্থে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অধীর আগ্রহে সে ঘোষণার অপেক্ষা করেছিলেন, সেই ঘটনাও আলোচ্য আয়াতের ঘোষণার জীবন্ত সাক্ষী।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দান করেছেন যে, (হে রসূল!) আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন যে, গায়বী এলম বা অদৃশ্য জ্ঞান আমার নিকট নেই, আল্লাহ পাক যা আমাকে জানিয়ে দেন আমি মানুষকে তা পৌঁছে দেই। আর গায়বী এলম নবুওয়্যতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও নয়। তবে একথা সত্য যে, শরীয়তের বিধান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছেন। আর এটি নবুওয়্যতের দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বটে। তবে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাঁর নবীকে ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন কথা জানিয়ে দিতে পারেন এবং অনেক বিষয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পূর্বাহ্নে জানিয়েছেন। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে إلا ما شاء الله বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন যে, ভবিষ্যতের এলম আমার নিকট নেই তবে আল্লাহ পাক যদি কিছু জানিয়ে দেন তা স্বতন্ত্র কথা।

মূলতঃ এ আয়াত দ্বারা পৌত্তলিকদের একটি ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। তারা বলতো, আপনি যখন নবুওয়্যতের দাবী করছেন তখন অদৃশ্য জ্ঞান বা ভবিষ্যতের জ্ঞান অবশ্যই আপনার আছে, আর যখন আপনার নিকট এল্‌মে গায়ব

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৪০

আছে তথা ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনি জানেন, তখন একথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া যায় যে, আপনি কেয়ামত সম্পর্কেও বিস্তারিত ভাবে জানেন। অতএব, বলুন কেয়ামত কবে হবে? যদি কেয়ামত কবে হবে তা বলতে না পারেন তথা এ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান না থাকে তবে আপনার নবুওয়্যতের দাবীও সত্য নয়।

মূর্খ পৌত্তলিকদের এ প্রশ্নের জবাবেই ঘোষণা করা হয়েছেঃ

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ

(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন আমি গায়ব জানিনা, আর নবীর জন্যে গায়ব জানা জরুরীও নয়। সৃষ্টির ভবিষ্যত কি হবে, পৃথিবীতে অনাগত ভবিষ্যতে কি ঘটবে, একথা জানা তো দূরের কথা আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের ব্যাপারেও জানিনা। আল্লাহ্ পাক যতখানি আমাকে জানিয়ে দেন আমি শুধু ততখানিই জানি। আর যদি আমি গায়ব জানতাম তবে আমার শুধু উপকারই হতো, কখনো কোন ক্ষতি বা অপকার আমাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারতো না কিন্তু মনে রেখ, আমার কাজ হল আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে মানুষকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা এবং তাঁর রহমত ও নেয়ামত সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ আমিতো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ কালবী (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মক্কাবাসী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলত, আপনি আমাদেরকে জিনিষপত্রের মূল্য সম্পর্কে অবহিত করুন, ভবিষ্যতে কোন্ জিনিষের দাম বাড়বে জানিয়ে দিন তাহলে আমরা সস্তা দরে ক্রয় করে অধিক দরে বিক্রয় করে লাভবান হবো। অথবা কখন দুর্ভিক্ষ আসবে তা আমাদেরকে জানিয়ে দিলে আমরা খাদ্য দ্রব্য মওজুদ করব। তার জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় এ মর্মে যে, এসব আল্লাহর নবীর কাজ নয়। আর মুজাহেদ (রঃ) ও এবনে জোরায়েয (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'গায়ব' শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মৃত্যু কবে আসবে তা আমি জানিনা। আর মৃত্যু কবে আসবে এ সংবাদ তোমাদেরকে দেয়া আমার দায়িত্ব নয়। আমার দায়িত্ব হল তোমাদেরকে মন্দ কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা আর ভাল কাজের শুভ পরিণতি সম্পর্কে তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়া।[২]

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২২৫-২৬
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৯
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৬

لِقَوۡمٍ يُؤۡمِنُوۡنَ

অর্থাৎ আমি ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদ দাতা সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা বিশ্বাস করে সে বিষয়ের উপর যা আমি নিয়ে এসেছি তথা পবিত্র কোরআনের উপর, কেননা শুধু মোমেনগণই নবীর তরফ থেকে ভয় প্রদর্শনে উপকৃত হয় যেমন তারাই সুসংবাদের মাধ্যমেও উপকৃত হয়। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনা আল্লাহর নবীর প্রতি, তারা তাঁর সতর্কবাণী শ্রবণ করে সতর্কও হয় না এবং তাঁদের সুসংবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎ কাজে আত্মনিয়োগও করেনা।[১]

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত, হেকমত, নেয়ামত এবং সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের উল্লেখ ছিল। তিনিই আলেমুল গায়ব-তথা অদৃশ্য জ্ঞান বা ভবিষ্যত-জ্ঞান শুধু তাঁরই, একথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এ সূরার শুরুতে হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সূরার সমাপ্তি পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে পুনরায় আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর কথা উল্লেখিত হয়েছে। এতে উদ্দেশ্য হল তৌহীদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের কথা প্রমাণ করা এবং শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহিদের কথা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে আর আলোচ্য আয়াতে বিস্তারিত ভাবে তৌহিদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।[২]

সর্ব প্রথম মানব জাতি সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ

তিনিই সেই আল্লাহ্ পাক, যিনি তোমাদের সকলকে একজন থেকে তথা আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আদি পিতা আদম (আঃ)-এর শান্তির জন্যে তাঁর জীবন-সঙ্গিনী হযরত হাওয়া (আঃ)-কেও আদম (আঃ)-এর বাঁ পাঁজরের হাড় থেকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। এরপর আল্লাহ্ পাকের কুদরতে, তাঁর মর্জিতে পিতা মাতার মাধ্যমে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। যদিও আয়াতের শুরুতে হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সমগ্র বিশ্ব মানবের সৃষ্টি-রহস্য উদঘাটিত এবং চিত্রিত করা হয়েছে যেন মানুষ তার স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে ভুলে না

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৭
২। তফসীরে মাআফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৭২

যায়, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হয়। মানব-সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের অবদানকে স্মরণ করে তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই মানুষের একান্ত করণীয় কাজ।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যখন তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেন তখন তার মা হালকা বোঝা অনুভব করে, এটি সৃষ্টির প্রথম পর্যায়। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ

এ পর্যায়ে মা চলাফেরা করতে পারে কিন্তু যখন সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে গুরুভার হয় তখন পিতা মাতা আল্লাহ্ পাকের দরবারে আগত সন্তানের জন্যে কত কাকুতি-মিনতি করে দোয়া প্রার্থী হয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا

এবং তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যদি আমাদেরকে সুস্থ সবল নিখুঁত সন্তান দান কর, আমরা তোমার চির কৃতজ্ঞ থাকব। এভাবে মানুষ মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর দানের জন্যে চির কৃতজ্ঞ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়।

فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيمَآ اٰتٰهُمَاۚ

যখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সুস্থ, সবল সন্তান দান করলেন, তাদের ফাঁড়া কেটে গেল, মনের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্ পাক পূর্ণ করলেন তখন তারা পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল, শেরক করতে লাগল, আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত নেয়ামতে অন্যকে শরীক করতে লাগল। অমুক ঠাকুর অমুক দেবতা, অমুক পুরোহিতের দান বলে প্রকাশ করতে লাগল এমনকি, মূর্তির নামে সন্তানের নাম রাখতেও দ্বিধাবোধ করলনা। যেমন আরবে সেকালে সন্তানের নাম রাখা হত আবদুল ওজ্জাহ, আবদুস শামস ইত্যাদি।

অথচ মানুষের সৃষ্টির ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা, কুদরত, হেকমত এবং শক্তি কার্যকর হয়েছে। এ ব্যাপারে একমাত্র মহান আল্লাহ্ পাকেরই নিজস্ব অবিমিশ্র অধিকার সংরক্ষিত। কিন্তু আত্মবিস্মৃত মানুষ এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে। যদিও এই শেরকে আল্লাহ্ পাকের কিছু যায় আসে না কেননা,

فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۝

তিনি তাদের এ শেরকের বহু উর্দ্ধে, পবিত্রতম, মহত্তম তাঁর শান, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কারো বন্দেগী বা আনুগত্যের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসে

কুদসীতে এরশাদ হয়েছেঃ সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করে তবুও তাঁর শান এতটুকু বাড়বেনা, পক্ষান্তরে যদি সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয় তবুও তাঁর শান এতটুকু কমবেনা। তাই যারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে, নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে, যেভাবে আলোচ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেরক বর্জন করার এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান অর্জনের আহবান জানান হয়েছে, ঠিক তেমনি সূরা বাকারার শুরুতে বিষয়টিকে বিশেষ ভঙ্গিতে পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ....الايه

কিভাবে তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হও, অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা, আল্লাহ্ পাকই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন (আর এ জীবনও চিরস্থায়ী নয়; বরং নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী)। এরপর আল্লাহ্ পাক তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর পুনরায় জীবন দান করবেন, এরপর তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

একরামা এবং হাসান (রঃ) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আল্লাহ পাক তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেককে তার পিতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার নিকট থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এরপর নিয়মিত ভাবে পিতা-মাতার মাধ্যমে মানব সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ ব্যাখ্যাই হলো সঠিক।

অবশ্য কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতকে সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়; বরং শুধুমাত্র আদম ও হাওয়ার প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ

جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ

অর্থাৎ তারা উভয়ে আল্লাহ পাকের দেয়া বস্তুর মধ্যে অন্যকে শরীক করে। তবে এই শেরক আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে নয়, সন্তানের নামকরণের ব্যাপারে।

এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একটি ঘটনারও উল্লেখ করেছেন।

হযরত সামুরা এবনে জুন্দব (রাঃ)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ, তিরমিজী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, হাওয়া (আঃ)-এর সন্তান জন্ম হবার পর মৃত্যু মুখে পতিত হত। এভাবে কয়েকটি শিশুরই মৃত্যু হল। একবার একটি শিশুর জন্ম হল তখন ইবলিস তাঁর নিকট হাযির হয়ে বললো, তোমার সন্তানতো জীবিত থাকেনা, তুমি তার নাম আবদুল হারেস রাখ তাহলেই শিশুটি জীবিত থাকবে (ফেরেশতাদের মধ্যে ইবলিসের নাম হারেস ছিল তা হাওয়া (আঃ) জানতেন না)। তাই এই নাম রেখে দিলেন।

কালবী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইবলিস হাওয়া (আঃ)-কে বলেছে, আমি যদি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি তবে তোমার সন্তান সঠিকভাবে জন্ম গ্রহণ করবে। তুমি কি আমার নামে তার নাম রাখবে? হাওয়া (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? হাওয়া (আঃ) জানতেন না যে, ইবলিসের কারণে জান্নাত থেকে তাঁদেরকে বহিস্কার করা হয়েছে, তার নাম হারেস ছিল। তাই নবজাতক শিশুর নাম আবদুল হারেস রেখে দিয়েছিলেন।

এবনে যায়েদ বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আঃ)-এর একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করলো। তিনি তাঁর নাম রেখেছেন, আবদুল্লাহ। ইবলিস এসে জিজ্ঞাসা করলো, তার নাম কি রেখেছেন? তাঁরা বললেন আবদুল্লাহ। ইতিপূর্বে হযরত আদম (আঃ)-এর একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। কিছুদিন পর তার মৃত্যু হয়। ইবলিস বললো তোমরা কি মনে কর আল্লাহ তাঁর বন্দাকে তোমাদের নিকট রেখে দেবেন? (কেননা আবদুল্লাহ অর্থ আল্লাহর বন্দা) কিন্তু এমনটি হবে না। যেভাবে ইতিপূর্বে তোমাদের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে ঠিক এমনিভাবে এ শিশুটিরও মৃত্যু হবে। আমি তোমাদেরকে এমন নাম বলি যদি তোমরা তা রাখ তবে সন্তান জীবিত থাকবে। তখন তারা শিশুটির নাম রাখেন আবদুস শামস। অবশ্য আল্লামা বগভী লিখেছেন যে, এ পর্যায়ে পূর্বে বর্ণিত ঘটনা অধিকতর সঠিক।

এসব ঘটনা উল্লেখ করে আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এবং ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন যে, এসব ঘটনা নির্ভরযোগ্য নয়।

এ পর্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন ঃ

جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ

(তারা উভয়ে আল্লাহর শানে শেরক করে)

বাক্যটি দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? কোন কোন তফসীরকারগণ লিখেছেন, এর দ্বারা আদম ও হাওয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যায়ে তফসীরকারগণের সু-চিন্তিত অভিমত এই, এর দ্বারা আদম ও হাওয়া (আঃ) উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা প্রত্যেক নর-নারী তথা প্রত্যেক দম্পতিকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তাবেয়ীও এ মতই পোষণ করেন। হযরত হাসান (রহঃ) ও হযরত কাতাদা (রহঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এ আয়াতে যাদের শেরক করার কথা বলা হয়েছে তারা হলো কোরায়শ গোত্রের পূর্ব পুরুষ কুশাই এবং তার স্ত্রী, তাঁরা উভয়েই আল্লাহ পাকের দরবারে সুস্থ নেককার সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পেশ করেছিল। তাদের চারটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিলো। আবদে মনাফ, আবদে শামস, আবদে কুশাই, আবদে ওয়াব। কিন্তু আবদুল্লাহ কারো নাম রাখা হয়নি। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক সন্তান দান করেছেন অথচ তারা আল্লাহর দানেই শেরক করলো এবং তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতকে

অস্বীকার করলো। তারা একথাও বলেছেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সম্পর্কে যে ঘটনা বর্ণিত হয় এগুলো বনী ইসরাঈলদের মাধ্যমে এসেছে। তাদের বর্ণিত ঘটনাবলী সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

واذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم

অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারারা যদি তোমাদেরকে কোন কথা বলে তবে তোমরা তাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করোনা এবং মিথ্যা জ্ঞানও করোনা, অর্থাৎ নীরবতা পালন কর।[১]

এ সম্পর্কে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, যেহেতু পৌত্তলিকরা এ মিথ্যা দাবী করতো যে, হযরত আদম (আঃ) মূর্তি পূজা করতেন (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। তাই আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

لَئِنْ اٰتَيْتَنَا

অর্থাৎ আদম হাওয়া আল্লাহর দরবারে আরজী পেশ করলেন, যদি আমাদেরকে সুস্থ, সুন্দর সন্তান দেয়া হয় তবে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকবো। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, যখন তাদেরকে সুস্থ সবল সন্তান দেয়া হল, এর পরবর্তী বাক্যটি হল প্রশ্নবোধক তথা جعلا শব্দটির পূর্বে একটি "আলিফ" অক্ষর বসবে। এখন অর্থ হবে এই, তবে কি তারা আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতের মধ্যে শেরক করেছে? যেহেতু পৌত্তলিকরা হযরত আদম (আঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করতো তাই আল্লাহ পাক এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তারা কি আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে শেরক করেছে? এরপর জবাব দিয়েছেনঃ

فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ তারা যে শেরক করে তিনি তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। তিনি পবিত্র, তিনি মহান। এ পৌত্তলিকরা নিজেরা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে এবং হযরত আদম (আঃ)-এর উপর তার দোষারোপ করে।

অথবা

فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭০
খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩৩

এর অর্থ হলো।

جَعَلَ أَوْلَادُهُمَا لَهُ شُرَكَاءَ

আদম হাওয়ার সন্তানরা আল্লাহর সাথে শেরক করেছে।

ইমাম রাজী (রহঃ) এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১]

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ
يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ
بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ
قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

তরজমা

(১৯১) তারা কি এমন বস্তুকে আল্লাহ পাকের শরীক করে যারা কোন কিছুই তৈরী করতে পারেনা; বরং তারা নিজেরাই অন্যের তৈরী।

(১৯২) এবং তারা অন্যকে সাহায্য করতে পারেনা এমনকি, নিজেদেরও সাহায্য করতে পারেনা।

(১৯৩) তোমরা যদি তাদেরকে সৎ পথের দিকে আহবান কর তবে তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না; তোমরা তাদেরকে আহবান কর বা চুপ করে থাক তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮

(১৯৪) আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদেরই ন্যায় বন্দা ব্যতীত আর কিছু নয়। অতএব, তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৯৫) তাদের কি পা আছে যে চলতে পারে, তাদের কি চোখ আছে যে দেখতে পারে? তাদের কি কান আছে যে শ্রবণ করতে পারে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমাদের শরীকদেরকে ডাক এবং আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমাকে অবকাশ দিওনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এক প্রকার শেরকের বর্ণনা ছিল এবং আল্লাহ পাক সর্ব প্রকার শেরক থেকে অনেক উর্দ্ধে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে সামগ্রিকভাবে সর্ব প্রকার শেরক বা পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

اَيُشْرِكُوْنَ مَالَا يَخْلُقُ شَيْئًا

তারা কি আল্লাহ্ পাকের সাথে এমন কিছুকে শরীক করে যা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা; বরং যে মূর্তিদেরকে তারা নিজেরা স্বহস্তে তৈরী করে তাদেরকেই তারা উপাস্য বলে মনে করে, অথচ এ মূর্তিগুলোর পূজারীদের কোন উপকার তারা করতে পারেনা। কেননা, এগুলো সম্পূর্ণ অপারগ, অক্ষম। তাদের কোন প্রকার সাহায্য করা বা কল্যাণ সাধন করা মূর্তিদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। পূজারীদের সাহায্য করাতো দূরের কথা, তাঁরা নিজেরা আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম নয়। তাদের হাত-পা চোখ-কান আছে বটে কিন্তু তাদের জন্যে এসব কিছু কোনভাবেই উপকারী নয় এমনকি, মশা মাছি তাড়ানোর ক্ষমতাও তাদের নেই।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ط

অর্থাৎ যদি তোমরা এই মুশরেকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানাও তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না তথা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে চির শান্তি চির মুক্তি লাভের পথ ধরবে না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ বাক্যটির আরও একটি অর্থ হতে পারে। এ বাক্যে সম্বোধন করা হয়েছে মুশরেকদেরকে অর্থাৎ হে মুশরেকের দল! যদি তোমরা তোমাদের মূর্তিগুলোকে ডাক যেন তারা তোমাদেরকে পথ-নির্দেশ করে তবে তারা তোমাদেরকে পথ নির্দেশ করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ পাক তোমাদের দোয়া কবুল করে থাকেন। কিন্তু মূর্খতাবশতঃ তোমরা যা কিছুকে উপাস্য মনে কর তারা কোন অবস্থাতেই তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না, পারবে না।

سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ

অর্থাৎ তাদেরকে ডাকা না ডাকা সমান, ডাকলেও তোমাদের কোন উপকার হবে না, নীরব থাকলেও যে অবস্থা ডাকলেও সেই একই অবস্থা। হে মুশরেকের দল! আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক, যাদের তোমরা পূজা কর তারাও তোমাদেরই মত সৃষ্টি, অতএব তোমরা তাদেরকে ডাকলে তাদের উচিত তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া, যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও। কিন্তু না, তারা জবাব দিতে পারেনা, কোন দিন পারবে না। আর তোমাদের বিশ্বাসের ভ্রান্ত হওয়ার এবং তোমাদের পথভ্রষ্টতা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে একথাই যথেষ্ট। যেহেতু এ ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট মানুষ তাদের নিজেদের তৈরী মূর্তিকে পূজা করতো, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারার সম্মুখে মাথানত করতো, এমনকি তাদের কাছে আশা করতো, মনের আরজী পেশ করতো অথচ কারো উপকার বা অপকার করার তাদের কোন ক্ষমতা ছিল না, তাই এরশাদ হয়েছে, যদি তোমরা তাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণে সত্যবাদী হও তবে তাদেরকে ডাক, তাদের নিকট আরজী পেশ কর কিন্তু তোমরা যদি সারা জীবন চিৎকার কর তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম হবে না। তাদেরকে ডাকা অথবা নীরব থাকা উভয়ই সমান, এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এখন চিন্তা কর সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে তোমরা কেন বসাও? এটি নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا

শেরক তথা পৌত্তলিকতার বাতুলতা সম্পর্কে আরও একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে এ আয়াতে। তাদের কি পা আছে যা দ্বারা তারা চলতে পারে, তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরতে পারে, তাদের কি চোখ আছে যা দ্বারা তারা দেখতে পারে অথবা তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনতে পারে। দৃশ্যতঃ মূর্তিগুলোর এসব অঙ্গই আছে কিন্তু সবই অচল, সবই অকার্যকর কোন কিছু সক্রিয় নয়; বরং সবই নিষ্ক্রীয়। অতএব, যেহেতু মানুষের এসব অঙ্গই সক্রিয় সে অবশ্যই উত্তম সেই সৃষ্টি থেকে যার সবই নিষ্ক্রীয়। বরং সত্য কথা বলতে গেলে মানুষের সঙ্গে এসবের কোন তুলনাই হয় না। আল্লাহ পাক মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা করেছেন এবং পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনেই আল্লাহ পাক পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

'তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি তোমাদের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব কিছ'। অতএব, মানুষের মর্যাদা সর্বোচ্চে, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মানুষ নিকৃষ্ট সৃষ্টির কাছে মাথা নত করতে পারে না, মানবতার মর্যাদা বিরোধী কাজ হল

পৌত্তলিকতা। শেরক বা পৌত্তলিকতার চেয়ে অযৌক্তিক, অসুন্দর এবং অবমাননাকর কাজ মানুষের জন্যে আর কিছুই নেই।

قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করা হয়েছে, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিন, তোমরা তোমাদের যত ঠাকুর-দেবতা মূর্তি আছে সকলকে ডাক। আমার ক্ষতি সাধনের যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমাকে এক মুহূর্তেরও অবকাশ দিওনা, তোমাদের তথাকথিত উপাস্যদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হও, আমার অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট হও, দেখ আমার কোন ক্ষতি করতে পার কি-না। মনে রেখ, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। তিনিই আমার সাহায্যকারী, তাঁর প্রতিই আমার ভরসা।

অতএব, তিনি ব্যতীত আমি আর কাউকে ভয় করিনা। আমার আশা শুধু তাঁর নিকট, ভয় শুধু তাঁর প্রতি। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক বা উপাসনা কর তারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারেনা, তোমাদেরকে কোন প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষাও করতে পারেনা। এমনকি যদি কেউ এই মূর্তিগুলো ভেঙে দিতে চায় তবে তারা আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম হয় না। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হল এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি সকলের রিযকদাতা, যাঁর কোন শরীক নেই, যিনি এক, অদ্বিতীয়, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। যাঁর নিকট সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে হিসাব দিতে হবে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৯৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৮-৭৯

إِنَّ وَلِـِّۧيَ اللّٰهُ
الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾
وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ۖ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ
وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ
إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ
الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ
فِى الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

তরজমা

(১৯৬) নিশ্চয় আমার অভিভাবক হলেন আল্লাহ পাক, তিনিই এই কিতাব নাযিল করেছেন, তিনিই নেককারদের সহায়তা করে থাকেন।

(১৯৭) আর তোমরা তাঁকে ব্যতীত যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদের কোন সাহায্যই করতে পারেনা, আর তারা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে অক্ষম।

(১৯৮) আর যদি তোমরা তাদেরকে সৎ পথের দিকে ডাক তবে তারা শ্রবণ করবে না। (হে রসূল!) আপনি দেখবেন যে তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পায়না।

(১৯৯) (হে রসূল!) আপনি ক্ষমা ও ঔদার্যের পথ অবলম্বন করুন, সৎ কাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খ লোকদের থেকে পাশ কাটিয়ে চলুন।

(২০০) যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে উত্তেজিত করে তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(২০১) নিশ্চয় যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ খুলে যায়।

(২০২) আর যারা শয়তানের ভাই, শয়তানরা তাদেরকে বিপথে টেনে নিয়ে যায় এবং তাতে তারা কোন ত্রুটি করেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, কাফের মুশরেকরা যে মূর্তিগুলোর পূজা করে তা তাদের পূজারীদের কোন উপকারও করতে পারেনা এবং কারো কোন ক্ষতিও করতে পারেনা। তাই বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা, শুধু তাঁর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করা কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই মানুষের দ্বীন দুনিয়ার উপকার করেন। দ্বীনের উপকার করার লক্ষ্যেই তিনি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। পবিত্র কোরআন হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান বাণী, বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণ এবং চিরমুক্তির মহাসনদ। এতে রয়েছে সর্বকালের মানুষের সর্বপ্রকার হেদায়েত। মানব জীবনকে সুন্দর ও সুশৃংখল করে গড়ে তোলার, সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত করার সঠিক পথ-নির্দেশ করে পবিত্র কোরআন। তাই সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থেই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন।[১]

আলোচ্য আয়াতে আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই নেককারদের সহায়তা করেন।

এ আয়াতে একদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যেন কাফেরদের অন্যায় আচরণে তিনি মনক্ষুন্ন না হন।

দ্বিতীয়তঃ কাফেরদেরকে এ বাক্যের মাধ্যমেই জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে যে, (হে রসূল!) আপনি কাফের মুশরেকদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমার বিরুদ্ধে তোমরা যত ষড়যন্ত্রই কর না কেন এবং যত শক্তিই ব্যয় কর না কেন আমি তাতে ভীত নই। কেননা, স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমার অভিভাবক, তিনিই আমার সহায়ক, তিনিইতো আমার নিকট পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, তিনিই তোমাদের সকল শত্রুতা এবং ষড়যন্ত্র থেকে আমাকে রক্ষা করবেন। অতএব, আমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তিনি তো সর্বদা তাঁর নেক বন্দাদের সহায়তা করে থাকেন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৯৪

শুধু নবীদের ব্যাপারেই যে তাঁর সাহায্য আসে তাই নয়; বরং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "যারা আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনা আল্লাহ পাক তাদের সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দুশমনদের দুশমনী তাদের ক্ষতি করতে পারেনা"। তোমরা যে আমার সাথে শত্রুতা কর তার কারণ তো শুধু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাই। তোমরা মনে রেখ, যিনি আমার প্রতি কোরআন নাযিল করেছেন তিনিই আমার হেফাজতকারী এবং সাহায্যকারী। অতএব, আমি নিশ্চিন্ত, আমি নিঃশঙ্ক।

পরবর্তী বাক্যে সাধারণ নিয়ম ঘোষণা করা হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের শান অনেক উচ্চে, তাঁদের হেফাজত তো আল্লাহ পাক করেনই, এর সঙ্গে সঙ্গে নেককার মুসলমানদের জন্যেও আসে আল্লাহ পাকের সাহায্য। অধিকাংশ সময় দুনিয়াতেই আল্লাহ পাক তাদেরকে বিজয়ী করেন। আর ক্ষেত্র বিশেষে যদি কোন হেকমতের কারণে কোন মোমেন দুনিয়াতে বিজয়ী না-ও হয়, তবুও তার আসল উদ্দেশ্য সফল হয় কেননা, মোমেন মাত্রেরই জীবন-সাধনার উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, আর সে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। এভাবেই মোমেনের জীবন-সাধনা সার্থক হয়।[১]

নেককার হওয়া পূর্বশর্ত

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজের (রঃ) একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ) তাঁর সন্তানদের জন্যে কোন সম্পদ রেখে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলোঃ আপনি তো চলে যাচ্ছেন, আপনার সন্তানদের জন্যে কি রেখে গেলেন? তখন তিনি আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ

পাঠ করে বললেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি নেককারদের সহায়তা করেন, যদি আমার সন্তানগণ নেককার হয় তবে এ আয়াতের ঘোষণা মোতাবেক তারা আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করবে। এমন অবস্থায় আমার পরিত্যক্ত সম্পদের কোন প্রয়োজন তাদের হবে না। অতএব, নেককার হওয়াই হলো আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের পূর্বশর্ত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৪৫
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০০৬

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ

'আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে সক্ষম নয়। এমনকি, তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে অক্ষম'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ মাআজ এবনে আমর এবনুল জমোহ এবং মাআজ এবনে জবল উভয় যুবক মুসলমান হয়েছিলেন। তারা রাত্রিকালে মুশরেকদের মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিতেন। যদি মূর্তিগুলো কাঠের দ্বারা তৈরী হত তবে দরিদ্র বিধবাদের দিতেন সেগুলোকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। তারা এ কর্মসূচী এজন্যে গ্রহণ করেছিলেন যেন মুশরেকরা এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে যে, যাদের সম্মুখে তারা মাথা নত করছে তারা কত অসহায়, কত নিরূপায় যে, তাদের পূজারীদেরকে সাহায্য করাতো দূরের কথা, নিজেদেরকেই রক্ষা করতে তারা অক্ষম।

আমর এবনে জমোহ ছিলেন তার সম্প্রদায়ের নেতা, তার নিকট একটি মূর্তি ছিল, সে তার পূজা করত এবং তাতে খুশবু ব্যবহার করত। উপরোক্ত দু' যুবক ঐ মূর্তির উপর ময়লা ফেলত, একবার উভয় যুবক ঐ মূর্তিকে একটি মৃত কুকুরের দেহের সঙ্গে বেঁধে দেয়, আমর এবনে জমোহ এ দৃশ্য দেখে চিন্তিত হল এবং এরপর সে সঠিক পথের সন্ধান পেল। সে চিন্তা করতে লাগল, যদি এ মূর্তিটি উপাস্য হত তবে মৃত কুকুরের সঙ্গে কূপে পড়ে থাকত না; এরপর আমর এবনুল জমোহ ইসলাম কবুল করলেন এবং খাঁটি মুসলমান হলেন। ওহোদের যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১]

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ط

যদি তাদেরকে কোন কথা বলার জন্যে ডাক তবে তারা কিছুই শ্রবণ করেনা। তাদেরকে তোমরা দেখবে যে, তারা চেয়ে আছে কিন্তু তারা কিছুই দেখেনা। মুশরেকরা তাদের মূর্তিগুলোকে মানুষের আকৃতি দিয়ে রেখেছিলো, যারাই সেগুলোর দিকে দেখত, তারা উপলব্ধি করত যে, মূর্তিগুলো তাদের দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তাদের চোখ কান, শুধু লোক দেখানোর জন্যেই ছিল, পাথরের চোখের দৃষ্টি শক্তি কোথায়? হযরত হাসান বসরী (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটি মুশরেকদের উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছেঃ অর্থাৎ (হে রসূল!) যদি আপনি এই মুশরেকদেরকে হেদায়েতের দিকে ডাকেন তবে তারা কিছুই শ্রবণ করেনা, আপনি লক্ষ্য করবেন যে, তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা মনের চোখ দিয়ে কিছুই দেখেনা।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০ পৃষ্ঠা-৫৭-৫৮
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৪৬

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুশরেকদের দেবতার নিন্দাবাদ রয়েছে, অতি স্বাভাবিকভাবেই এতে তাদের উত্তেজিত হবার এবং উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তাদের তরফ থেকে অন্যায় আচরণের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে, (হে রসূল!) কাফেরদের উত্তেজনার জবাবে আপনি উত্তেজিত হবেন না, তাদের অন্যায় আচরণের প্রতি-উত্তরে অন্যায় আচরণ না করে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সদুপদেশ দিতে থাকার আদেশও দেয়া হয়েছে। এমন মূর্খ লোকদেরকে পাশ কাটিয়ে চলাই শ্রেয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যদি ঘটনাক্রমে তাদের অন্যায় আচরণের কারণে আপনারও ক্রোধ আসে এবং ইবলিস শয়তান আপনার উচ্চ মর্যাদার বরখেলাফ এবং আপনার মহান আদর্শের বিরোধী কোন আচরণ করতে প্ররোচনা দেয় তবে এমন সময় সঙ্গে সঙ্গে আপনি সতর্ক হবেন এবং মহান আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করবেন।

একটি পরিপূর্ণ হেদায়েত নামা

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে চরিত্র মাধুর্যের এক পরিপূর্ণ হেদায়েতনামা রয়েছে। জীবন-সংগ্রামে যদি মানুষ এই কোরআনী হেদায়েতনামা মেনে চলে তবে জীবন-সাধনার সার্থকতা এবং সাফল্য সুনিশ্চিত হবে। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেকদের অন্যায় আচরণ, নৈতিক দুর্বলতা এবং পথভ্রষ্টতার বিবরণ দেয়ার পর আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র-মাধুর্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো এমন যে, এ কারণে আল্লাহ পাক তাঁকে মহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী"।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। অনেক তফসীরকার বলেছেন, عفو বলা হয় এমন কাজকে যা কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত সহজে সমাপ্ত হয়। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে এই, (হে রসূল) আপনি গ্রহণ করুন সেই জিনিষ যা মানুষ সহজে করতে পারে। অর্থাৎ শরীয়তের বিধানের উপরে আমল

করার ব্যাপারে আপনি সর্বোচ্চ মানের দাবী করবেন না, বরং মানুষের পক্ষে যা সহজ তাই গ্রহণ করুন। এ পর্যায়ে একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। নামাযের প্রকৃত তাৎপর্য হল, বন্দা সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দন্ডায়মান হবে এবং হামদ ও ছানার পর সরাসরি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নিজের কাকুতি- মিনতি পেশ করবে। কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হয়, ঐ সময় মনের যে একাগ্রতা এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি যে ভয়-ভীতি হওয়া একান্ত জরুরী তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ নামাজীর মধ্যে এ অবস্থা কয়জনের হয় তা নিদৃষ্ট করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, (হে রসূল!) আপনি মানুষের নিকট থেকে সর্বোচ্চ মানের এবাদত দাবী করবেন না; বরং যা সহজে অর্জিত হয় তাই গ্রহণ করবেন। আর এ নীতি অন্যান্য এবাদতের বেলায়ও গ্রহণযোগ্য হবে।

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকেও আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে যোবায়ের (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) প্রমুখ প্রখ্যাত তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

عفو শব্দটি ক্ষমা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তফসীরকারগণের একদল আলোচ্য আয়াতে শব্দটির এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, (হে রসূল!) আপনি পাপী-তাপী মানুষকে ক্ষমা করুন। এ আয়াতের তফসীরে এবনে মরদবিয়া হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ)-এর সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ওহোদের যুদ্ধে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য হযরত হামজা (রাঃ)-কে শহীদ করা হয় এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে তাঁর মৃতদেহের অবমাননা করা হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলেন, "যারা হামজা (রাঃ)-এর সঙ্গে এ ব্যবহার করেছে আমি তাদের সত্তর জনের সঙ্গে এ ব্যবহার করব"। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলা হয়, (হে রসূল!) এমনি প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার শান এবং মর্যাদার বরখেলাফ কাজ। অতএব, আপনি ক্ষমা ও ঔদার্যের নীতি গ্রহণ করুন।

আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় অন্য একখানি হাদীস থেকে যা হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ (রঃ) সংকলন

করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে চরিত্র-মাধুর্যের তা'লিম দিয়েছেন তা হলো, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল, যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সাথে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করুন এবং সহজ আমল করুন। যেমন যদি কেউ কোন ওজর-আপত্তি বা অসুবিধার কথা পেশ করে তবে সে ওজর কবুল করুন, ক্ষমা ও ঔদার্যের নীতি গ্রহণ করুন, মানুষের অবস্থার অনুসন্ধান করবেন না। মানুষকে এমন কাজের নির্দেশ দেবেন না, যা করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ عفو শব্দটির অর্থ হলো পাপিষ্ঠ বা অপরাধীকে মাফ করা। ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ উয়াইনাহ এবনে হাসীন এবনে হোজায়ফা তার ভ্রাতঃস্পুত্র হোর এবনে তাঈসের নিকট অবস্থান করেন, হোর ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর নৈকট্য-ধন্য ব্যক্তি। যারা পবিত্র কোরআন পাঠে পারদর্শী হতেন, তারা খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর মজলিসের বিশিষ্ট ব্যক্তি মনোনীত হতেন, সে ব্যক্তি যুবক হোক বা বৃদ্ধ। উয়াইনা তার ভ্রাতঃস্পুত্র হোরকে বললো, আমার জন্যে খলীফাতুল মুসলেমীনের সঙ্গে সাক্ষাত করার ব্যবস্থা কর। সে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট এর জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি অনুমতি দিলেন। উয়াইনা তাঁর নিকট হাযির হল এবং বললো, হে এবনে খাত্তাব! তুমি আমাদেরকে অধিক পরিমাণে টাকা-পয়সাও দাওনা এবং আমাদের মাঝে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মীমাংসাও করনা। অর্থাৎ অর্থ সম্পদের বিতরণেও জুলুম কর, মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসায়ও তুমি জালেম হও। হযরত ওমর (রাঃ) একথা শ্রবণ করে এত রাগান্বিত হলেন যে, হয়ত তার প্রতি আক্রমণ করবেন বা তার প্রতি শাস্তির আদেশ দেবেন, তখন হাসান বললেন, হে আমিরুল মোমেনীন! আল্লাহ পাক তাঁর পয়গম্বরকে একথা বলেছেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

তুমি ক্ষমা পরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। আর এ ব্যক্তি মূর্খ। হযরত ওমর (রাঃ) আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই

আয়াতের অর্থ মোতাবেক বিরত থাকতেন, এটি তাঁর অভ্যাস ছিল, যেন তিনি আয়াত শোনা মাত্র আয়াতের উপর আমল করলেন।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, (কেয়ামতের দিন) যখন বন্দা হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হবে তখন একজন ঘোষক এই ঘোষণা করবে, যার সওয়াব আল্লাহ পাকের দায়িত্বে রয়েছে সে দণ্ডায়মান হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করুক। তখন লোকেরা বলবে, আল্লাহ পাকের দায়িত্বে কার সওয়াব থাকতে পারে? তখন সেই ঘোষক বলবে, যারা (দুনিয়াতে) মানুষকে ক্ষমা করেছে তাদের সওয়াব আল্লাহ পাকের দায়িত্বে রয়েছে। এ ঘোষণা শ্রবণ করে হাজার হাজার লোক দণ্ডায়মান হবে এবং বে-হিসাব জান্নাতে যাবে। (তেবরানী)

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করেন, এ আয়াতের অর্থ কি? জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, আমার জানা নেই, আল্লাহ পাকের দরবারে জিজ্ঞাসা করে বলবো। কিছুক্ষণ পর জিব্রাঈল (আঃ) প্রত্যাবর্তন করে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে আদেশ করেছেনঃ যে তোমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সে বন্ধন সুদৃঢ় কর, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দিও, যে তোমার প্রতি জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর। (এবনে মরদবিয়া)

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চায় যে (জান্নাতে) তার ইমারত উচ্চ হোক এবং তার মর্তবা বুলন্দ হোক তার কর্তব্য হল, যে তার হক্ব বিনষ্ট করে তাকে ক্ষমা করা। আর যে তার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করে সে যেন তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি, তারা ছিন্ন করে, আমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি, তারা আমার সাথে মন্দ আচরণ করে। আমি তাদের ব্যাপারে অনেক কিছু সহ্য করি তারা আমার ব্যাপারে মূর্খতার পরিচয় দেয় (তারা কোন কিছু সহ্য করে না)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যদি তুমি এমনই হও যা তুমি বর্ণনা করলে, তবে তুমি তাদের উপর অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করছো, যতদিন তুমি তাদের উপর এ ব্যবহার অব্যাহত রাখবে ততদিন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং কালবী (রঃ), আলোচ্য আয়াতের এ বাক্যের অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, সেই সম্পদ নিয়ে নাও যা তোমার পরিবারবর্গের প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত রয়েছে যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

(হে রসূল!) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহর রাহে কি দান করবে? আপনি বলুন, তোমার পরিবারবর্গের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা সম্পদ রয়েছে তা দান করবে। আলোচ্য আয়াতেও عفو শব্দটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর যখন যাকাত ফরজ হয় তখন এ প্রথা বাতিল হয়।[১]

যায়েদ এবনে আসলাম বর্ণনা করেন, এ বাক্যটির অর্থ হল মুশরেকদের সাথে ক্ষমা ও ঔদার্যের নীতি অবলম্বন করুন। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ তেরটি বছর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ নীতিই অবলম্বন করেছেন। হিজরতের পর জেহাদের আদেশ হয় এমনকি, মক্কা বিজয়ের দিনে যখন কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে সেই কাফেররা একত্রিত হয় যারা আজীবন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে চরম কষ্ট দিয়েছে, তাদের সকলকে তিনি সেদিন ক্ষমা করলেন এবং ঘোষণা করলেনঃ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে নির্দেশ দান করেছেন তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এভাবে হয়েছে–

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

অর্থাৎ একদিকে মানুষকে ক্ষমা করতে হবে, অন্যদিকে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশও দিতে হবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

من رأى منكم منكرا

তোমাদের মধ্যে যে কোন মন্দ কাজ দেখে তার কর্তব্য হল শক্তি দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করা, যদি সে শক্তি না থাকে তবে অন্তত মৌখিক প্রতিবাদ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৬-৪৭
তফসীরে কবীর খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৯৬

করা, যদি এ শক্তিও না থাকে তবে অন্তরে মন্দকে মন্দ জানা এবং ঘৃণা করা। (মুসলিম শরীফ)

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! হয়তো তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। অন্যথায় অধিক সম্ভাবনা আছে যে, আল্লাহ্ পাক আযাব প্রেরণ করবেন আর তখন তোমরা দোয়া করলে তা কবুল হবে না। (তিরমিজী)

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

আর মূর্খ লোকদের থেকে পাশ কাটিয়ে যাও অর্থাৎ মূর্খ লোকেরা যদি তোমাদের সঙ্গে মন্দ কথা বলে তবে তোমরাও তাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করোনা। যেমন সূরা ফোরকানে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

"যখন মূর্খ লোকেরা আল্লাহর নেককার বন্দাকে মূর্খতা-প্রসূত কোন কথা বলে তখন তারা বলে সালাম অর্থাৎ তারা মূর্খ লোকের সঙ্গে কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় না"।

ইমাম জাফর আস সাদেক (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চরিত্র মাধুর্যের আদেশ দিয়েছেন, কোরআন করীমে এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াত খানি সর্বাধিক অর্থবহ। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

"আমি চরিত্র মাধুর্যের পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্যেই প্রেরিত হয়েছি"।[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মন্দ কথা কলতেন না এবং মন্দ কথা পছন্দও করতেন না, বাজারে চিৎকার দিতেন না। কারো মন্দ আচরণের জবাবে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং মাফ করে দিতেন।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৪৮

শানে নুযুল

এবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো–

وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

অর্থাৎ "মূর্খদের থেকে পাশ কাটিয়ে চলো" তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরজ করলেনঃ ক্রোধের সময় মাফ করার কি পন্থা হবে? তখন নাযিল হলো–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ

যদি কারো মন্দ আচরণের কারণে আপনার উত্তেজনা আসে আর এমন সময় শয়তান আপনার দ্বারা আপনার উচ্চতম মর্যাদা এবং মহত্তম আর্দশ বিরোধী কাজ করাতে চায়, তবে আপনি সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হবেন এবং আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, আল্লাহ পাক শয়তানের প্ররোচনা এবং ওয়াস ওয়াসা দূরীভূত করবেন, আল্লাহ পাক আপনার হেফাজতকারী। অতএব, শয়তানের ধোকাবাজী, প্ররোচনা আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। তিনি আপনার সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং ইবলিস শয়তানের প্ররোচনা থেকে যে আপনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তা-ও তিনি জানেন। আর কিভাবে আপনার কাজ সহজ ও সম্ভব হবে, তা-ও তিনি জানেন। অথবা এর অর্থ হলো (হে রসূল!) যারা আপনাকে কষ্ট দেয় তাদের কথা আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন এবং তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। আপনাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি আল্লাহর পাকের তরফ থেকেই তারা ভোগ করবে। আপনার প্রতিশোধ নেয়ার এবং শয়তানের অনুকরণের কোন প্রয়োজন নেই।[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ

নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে, যখন শয়তানের আক্রমণ তাদের উপর হয় তখন তারা আল্লাহ পাকের স্মরণে মগ্ন হয়, এমন অবস্থায় তাদের অন্তরের চক্ষু খুলে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৪৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৪৭-৪৮

যায়। ফলে শয়তানের আক্রমণ থেকে তারা রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে, যারা শয়তানের ভাই তথা যারা পরহেযগার নয় তারা শয়তানের প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট হয়, শয়তান তার ভাই বন্ধুদেরকে টেনে নিয়ে যায় এবং অন্যায় কাজে তারা কোন প্রকার ত্রুটি করেনা।

শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার পন্থা

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শয়তানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, আলোচ্য আয়াতে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষা করার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে, যারা মোত্তাকী পরহেযগার, যারা একথা সর্বক্ষণ মনে রাখে যে, আমাকে অবশ্যই একদিন সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে হাযির হতে হবে এবং আমার প্রতিটি কর্মের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে, যদি সৎ কাজ করি তবে পুরস্কার সুনিশ্চিত আর যদি মন্দ কাজ করি তবে শাস্তি অবধারিত, তাদের অবস্থা এই, যখন শয়তান তাদের উপর আক্রমণ করে তথা কোন মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয় তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা সতর্ক হয়, আল্লাহ পাকের স্মরণে মশগুল হয়, তারা উপলব্ধি করে যে, এটি শয়তানের প্ররোচনা, ক্ষণিকের মধ্যেই গাফলতের পর্দা সরে যার, ভাল-মন্দের পরিণাম তাদের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে মন্দ আচরণ তথা অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার করে।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ

পক্ষান্তরে, যারা পরহেযগার নয় তাদেরকে আলোচ্য আয়াতে 'শয়তানের ভাই' বলা হয়েছে, শয়তান তাদেরকে অন্যায়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদের দ্বারা অন্যায় হতেই থাকে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, যারা পরহেযগার তারা হোচট খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয় এবং অন্যায় থেকে তৎক্ষণাত বিরত হয়। তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, যারা মোত্তাকী, পরহেযগার তারা ক্ষণিকের মধ্যেই উপলব্ধি করে যে, এটি পাপকার্য। তাই অনতিবিলম্বে তাদের অন্তরের চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, যারা শয়তানের বন্ধু, শয়তান তাদেরকে অন্যায় কাজে প্ররোচনা দেয় এবং তাদেরকে শয়তান মন্দ ও ঘৃণ্য কাজে টেনে নিয়ে যায়, তারা অন্যায় কাজে মত্ত এবং মুগ্ধ হয়ে

থাকে, ফলে মন্দ কাজ থেকে বিরত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মানুষ যেমন মন্দ কাজ থেকে বিরত হয় না শয়তানও তার অপকর্ম পরিত্যাগ করেনা।[১]

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا
اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ
مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ
الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَاذْكُر رَّبَّكَ
فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ
الْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾ السجدة

তরজমা

(২০৩) আর যখন তাদের নিকট আপনি কোন নিদর্শন উপস্থিত না করেন তখন তারা বলে, নিজের তরফ থেকে কোন নিদর্শন কেন নির্বাচন কর না? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে যে আদেশ আসে আমি শুধু তাই মেনে চলি। এই কোরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন স্বরূপ, যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্যে এটি হলো হেদায়েত এবং রহমত।

(২০৪) আর যখন পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয় তখন মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ করে থাকে। হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

(২০৫) আর স্মরণ কর তোমার প্রতিপালককে মনে মনে, কাকুতি-মিনতি করে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সকাল সন্ধ্যায় এবং গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

(২০৬) নিশ্চয় যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্য-ধন্য হয়েছে তারা কখনও তাঁর এবাদতে অহংকার করেনা, তাঁর পবিত্র মহিমা স্মরণ করে থাকে এবং শুধু তাঁকেই সেজদা করে থাকে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০৯

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের কথা ছিল। আর এ আয়াতে কাফেরদের একটি সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তাদের ইচ্ছা মাফিক বিশেষ মোজেযা দাবী করতো। তারা বলতো তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে অমুক মোজেযা কেন আননা? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ শয়তান, জ্বীন এবং মানুষ পথভ্রষ্টতা এবং অন্যায় অনাচারে এতটুকু ক্রটি করে না। আর এ আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিজেদের পছন্দ মোতাবেক বিশেষ মোজেযা দাবী করতো। এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন বনী ইসরাঈলরা বলেছিল–

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا

(তারা বললো, যে পর্যন্ত আমাদের জন্যে নির্ঝরণী প্রবাহিত না করবে সে পর্যন্ত আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না) ঠিক এভাবে আলোচ্য আয়াতে তারা বলেছে, কেন আমাদের জন্য কোন মোজেযা বাছাই কর না?[২]

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা প্রকাশ করতেন না তখন তারা বলত, আমাদের ফরমায়েশ কেন মঞ্জুর করলেন না? তাদের একথার জবাবেই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেনঃ (হে রসূল!) আপনি তাদের সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিন যে, আমার নিজের তরফ থেকে কোন কিছু গড়ে তোলা এবং আল্লাহ পাকের নামে প্রচার করা বা কোন মোজেযা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এসব আমার কাজ নয়। আমার কাজ হলো আল্লাহ প্রাকের হুকুম পালন করা। তিনি যা আদেশ দেন তা মেনে চলা এবং দুনিয়ার মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়া, আমি আল্লাহর ওহীর অনুসারী। এই কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে, এতে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে হেদায়েত এবং রহমত।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮১
২। তফসীরে কবীর খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১০১

لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ

অবশ্য তা সে ব্যক্তির জন্যে যে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে, শুধু তারাই পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারে।

قَالُوۡا لَوۡلَا اجۡتَبَيۡتَهَا ؕ

তারা বললো, কেন আপনি নিজে মোজেযা তৈরী করেন না? এ বাক্যটির অর্থ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেররা তাঁর তরফ থেকে কোন মোজেযা তৈরী করে পেশ করার জন্যে আবদার করতো। অথচ মোজেযা তথা অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করা আদৌ নবীর কাজ নয়। নবীর কাজ হলো আল্লাহ পাকের বাণী মানুষকে পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রমাণ স্বরূপ কোন মোজেযা প্রকাশ করে দিতেন। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

শানে নুযুল

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, মক্কাবাসী শুধু জেদ এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের পছন্দসই মোজেযার আবদার করতো। যখন সে মোজেযা প্রকাশে বিলম্ব হতো তখন তারা বলতো আপনি কেন একটা মোজেযা তৈরী করে দেন না? কাফেরদের এ অন্যায় আবদারের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

قُلۡ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوۡحٰۤى اِلَىَّ مِنۡ رَّبِّىۡ ۚ

অর্থাৎ আমার কাজ হলো আল্লাহ্ পাকের আদেশ মেনে চলা।

রসূলের দায়িত্ব

আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিকে অনুসরণ করাই রসূলের দায়িত্ব। এখানে উল্লেখ্য, রেসালতের প্রমাণ হিসেবে সমস্ত নবী রসূলগণকে আল্লাহ পাক অনেক মোজেযা দান করেছেন। বিশেষতঃ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও ওয়াসাল্লামকে অন্য সকল নবীগণের চেয়ে অধিক সংখ্যক এবং অধিক বিস্ময়কর মোজেযা দান করা হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অসংখ্য মোজেযার বিবরণ দিয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাম সুয়ুতী (রঃ) যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর রচিত "খাসায়েসে কোবরা" দু' খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অসংখ্য মোজেয়া থাকা সত্ত্বেও শুধু জেদের বশীভূত হয়ে কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নতুন মোজেযার দাবী করতো।

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝

অর্থাৎ-তোমরা মোজেযা দাবী করছো কিন্তু মোজেযা তোমাদের সম্মুখেই রয়েছে, তোমরা তা দেখ না, আর তা হলো পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের চেয়ে উন্নত মোজেযা আর কিছুই হতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার। পবিত্র কোরআন হলো নূর, পবিত্র কোরআন হলো হেদায়েতের উৎস এবং রহমতের আকর। এটি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা। পবিত্র কোরআনের অনুসরণে চির শান্তি ও চির মুক্তির পথ পাওয়া যায়। আল্লাহর রহমত এবং দানে ধন্য হওয়া যায়। অথচ তোমরা এই কোরআনকে বিশ্বাস কর না এবং এর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হও। মোমেনগণ পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করে তার বিধান মেনে চলে এবং দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সফলকাম হয়।

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا

যখন পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয় তখন মনযোগ শ্রবণ কর এবং নীরব থাক।

পবিত্র কোরআনের আদব

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনকে জ্ঞান ভাণ্ডার, রহমত এবং হেদায়েত বলেছেন।

আর এ আয়াতে পবিত্র কোরআনের আদব শিক্ষা দিচ্ছেন। যখন পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক, কেননা পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহ পাকের কালাম। পবিত্র কোরআন যখন পাঠ করা হয় তখন যদি মনযোগ সহকারে শ্রবণ না করা হয় তবে পাক কালামের অনাদর প্রকাশ পায়, আর তা পবিত্র কোরআনের অমূল্য সম্পদ থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ হয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, যদি কোন কাফের মুশরেক ও পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আদব রক্ষা করে তা শ্রবণ করে তবে আল্লাহ পাকের রহমত হলে তার অন্তর আলোকিত হতে পারে এবং ইসলাম কবুল করে আল্লাহর ওলীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যটি হলো ঃ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۝

"হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রহমত ও দয়া লাভের পন্থা হলো পবিত্র কোরআন পূর্ণ আদব ও মহব্বত সহকারে শ্রবণ করা।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, এ সূরার শুরুতে পবিত্র কোরআনের বিধান মেনে চলার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে তা মেনে চল, আর সূরার শেষ পর্যায়ে এসে পুনরায় পবিত্র কোরআনের বিশেষ আদব শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, মনযোগ সহকারে তোমরা পবিত্র কোরআন শ্রবণ কর এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার সময় নীরবতা পালন কর।

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ ইসলামের প্রথম যুগের লোকেরা নামাযের অবস্থায় কথা বলতেন। এমন অবস্থায় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে এমন বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। এতে আদেশ হলো নামাযে ইমাম যখন তেলাওয়াত করেন তখন মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ আমরা নামাযরত অবস্থায় একে অন্যকে সালাম দিতাম, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত জুমআর খোতবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

অন্য একদল তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে। কেননা যখন কোরআন শরীফ পাঠ করা হতো তখন তারা বলতো ঃ

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

(তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করোনা, পবিত্র কোরআন শ্রবণ করার সময় তোমরা কলরব কর, হয়তো মুসলমানদের উপর এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে) তখন এ আয়াত নাযিল হয় এ মর্মে যে, হে কোরায়েশ! যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন তখন তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরবতা পালন কর। যারা আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে এ মত পোষণ করেন তারা বলেন, আলোচ্য আয়াতের এটিই যে শানে নুযুল তার দলিল হলো, পূর্ববর্তী আয়াতেও কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে আর এ আয়াতেও তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাছাড়া আরো একটি কথা আছে তা হলো আয়াতের শেষ বাক্যটি হলো ঃ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

(হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে) মুসলমানগণ পূর্বেই দয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত। কাজেই আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছে যে, যদি তোমরা মনযোগ সহকারে পবিত্র কোরআন শ্রবণ কর তবে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরকারগণের মতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে নামাযে ইমামের পেছনে কেরাত পাঠের ব্যাপারে অর্থাৎ মোকতাদীর জন্যে এ আদেশ জারী হয়েছে। মোকতাদীর জন্য ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করা জায়েয নয়; বরং মোকতাদীর কর্তব্য হলো ইমাম যে কেরাত পাঠ করেন তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নীরব থাকা। এ মত পোষণ করেছেন এবনে জরীর, হাফেজ এবনে কাসীর (রঃ)। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে, কেউ কেউ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায রত অবস্থায় কেরাত পাঠ করেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ এই কোরআন তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে জ্ঞান ভান্ডার এবং হেদায়েত ও রহমত। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যখন পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা আদব এবং মহব্বতের সঙ্গে তা শ্রবণ কর এবং নীরব থাক যাতে করে তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হয়। খবরদার! কাফেররা যা করে তোমাদের দ্বারা যেন এমন অন্যায় কাজ না হয়। এখানে এ

বিষয়টি বিশেষভাবে উলেখ্য, নামাযের সময় মোকতাদীর নীরব থাকা একান্ত জরুরী। যেমন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস যা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইমামতো শুধু এজন্যেই বানানো হয়েছে যেন তার একতেদা করা হয়। অতএব, যখন ইমাম আল্লাহু আকবর বলে তোমরাও তাই বল আর যখন ইমাম কেরাত পাঠ করে তখন তোমরা নীরব থাক। এই হাদীস মসনদে আহমদেও সংকলিত হয়েছে। মসনদে সংকলিত হাদীসের ভাষা হলো ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ........

"যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াও তখন তোমাদের একজন ইমাম হবে। আর ইমাম যখন কেরাত পাঠ করবে তখন তোমরা নীরব থাকবে"।

বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে যেভাবে পবিত্র কোরআন পাঠ করার সময় নীরবতা পালনের আদেশ রয়েছে ঠিক তেমনি হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআন পাঠের সময় নীরব থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, এ আয়াত নামাযের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোগাফফল (রাঃ), সাঈদ এবনুল মোসাইয়্যেব (রঃ) এবং আবুল আলীয়া (রঃ), জুহ্‌রী (রঃ), যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ), শাবী (রঃ) এবং ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) যাহ্‌হাক (রঃ), কাতাদা (রঃ) ও সুদ্দী (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত নামাযের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।[১]

মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নীরব থাকার মধ্যে পার্থক্য

আলোচ্য আয়াতে দু'টি আদেশ রয়েছে–

১. পবিত্র কোরআন মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা।

২. পবিত্র কোরআন পাঠ করার সময় নীরব থাকা।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৩-৮৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৫০

سَمْعٌ অর্থ শ্রবণ করা, তা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়ও হতে পারে। কিন্তু استماع বলা হয় কান পেতে শ্রবণ করাকে যা শুধু শ্রবণের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। অতএব, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো যখন ইমাম নামাযে পবিত্র কোরআন পাঠ করে তখন মোকতাদীর কর্তব্য হলো পূর্ণ মনযোগ সহকারে আল্লাহ্ পাকের কালাম শ্রবণ করা।

এমনিভাবে انصات। অর্থ হলো চুপ থাকা তথা নীরবতা পালন করা। কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়; বরং যে কথা বলে তার প্রতি আদব এবং সম্মান প্রদর্শন-কল্পে নীরব থাকা। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, কোন ব্যক্তি তার গৃহে একাকী নীরবে বসে আছে কিন্তু এ অবস্থাকে انصات। বলা হবে না, বরং বলা হবে سكوت বা صموت কেননা, "ইনসাত" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো এমন নীরবতা যা কোন ব্যক্তির কথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন-কল্পে অবলম্বন করা হয়।

এ পর্যায়ে শেখ জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রঃ)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

তিনি বলেছেন "ইনসাতের" সম্পর্ক রসনার সঙ্গে এবং "এস্তেমায়ের" সম্পর্ক কানের সঙ্গে। আয়াতের অর্থ হলো যখন নামাযে কোরআন পাঠ করা হয় তখন কর্ণ দ্বারা শ্রবণ কর আর রসনার মাধ্যমে নীরবতা পালন কর। ইমামের আওয়াজ শ্রবণ কর বা না কর। এজন্যে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, যে নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করা হয় আর যে নামাযে অনুচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করা হয় উভয় নামাযেই ইমামের পেছনে মোকতাদীর কেরাত পাঠ করা নিষিদ্ধ। কেননা আলোচ্য আয়াত দ্বারা মোকতাদীর মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নীরব থাকা অবশ্য কর্তব্য প্রমাণিত হয়।

হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ) বলেছেন, যখন কোন নসীহতকারী নসীহত করেন তখন নীরব থাকার আদেশ রয়েছে। কালবী (রঃ) বলেন, নামাযে জান্নাত এবং দোযখের আলোচনা শ্রবণ করে লোকেরা চিৎকার দিত তথা জান্নাতের জন্য দোয়া করতো এবং দোযখ থেকে রক্ষা পাওয়ার ফরিয়াদ করতো।

তফসীরকারগণের এক দলের বক্তব্য হলো ইমামের পেছনে মোকতাদীর কেরাত পাঠ না করার আদেশ রয়েছে এ আয়াতে। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মেকদাদ (রাঃ) মানুষকে নামাযের সময় ইমামের পেছনে কোরআন শরীফ পাঠ করতে শ্রবণ করেন। নামায শেষে তিনি বলেন, তোমরা এখনও এ সত্য উপলব্ধি

করোনি যে, যখন পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা কান পেতে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক, যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (রঃ), জুহরী (রঃ) এবং ইমাম নখয়ী (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াত ইমামের পেছনে মোকতাদীর কেরাত পাঠ করার ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। বায়হাকী (রঃ) লিখেছেন যে, ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আলোচ্য আয়াত নামায সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) মুজাহেদের সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযে পবিত্র কোরআন পাঠ করছিলেন যখন তিনি একজন আনসারী যুবককে কোরআন শরীফ পাঠ করতে শ্রবণ করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً

"আর তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি মিনতি করে, ভীত হয়ে অনুচ্চস্বরে, সকাল সন্ধ্যায় এবং গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা"।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অশ্রুসজল নয়নে যে হাযিরী দেয় এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কাকুতি-মিনতি করে সে-ই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়।

জিকরে এলাহীর গুরুত্ব

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাকের এরশাদ হলোঃ আমি আমার বন্দার সাথে তেমন ব্যবহারই করি, যেমন সে আমার সম্পর্কে ধারণা করে। আর যখন সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে সেভাবেই মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ করে তবে আমি তার চেয়ে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি। যদি বন্দা আমার দিকে অগ্রসর হয় অর্ধ হাত তবে আমি অগ্রসর হই পূর্ণ এক হাত। আর যদি সে অগ্রসর হয় এক হাত তবে আমি তার দিকে অগ্রসর হই দু' হাত। যদি সে আমার দিকে অগ্রসর হয় পদব্রজে তবে আমি তার দিকে অগ্রসর হই দ্রুতবেগে। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিজী, নেসায়ী)

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে আল্লাহর জিকরে মশগুল হতে হবে। কেননা, আল্লাহর জিকরের মাধ্যমেই আল্লাহর ভালবাসা ও নৈকট্য লাভ করা যায়।

মূলতঃ এ কারণেই পবিত্র কোরআনে জিকর সম্পর্কে এত বেশী তাগিদ করা হয়েছে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহর জিকর করতে থাক অধিক পরিমাণে এবং সকাল বিকাল তাঁর তসবীহ পাঠ করতে থাক"।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

"(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন। আর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু স্বীয় প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করুন"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর নৈকট্য লাভের পন্থা নির্দেশ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম পন্থা হলো জিকর। দ্বিতীয়ত আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা, শুধু তাঁর সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হওয়া, তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকা।

মূলতঃ এভাবেই মানুষ অতি মহান মানুষে পরিণত হয়, মানুষ আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়। সবার উপরে এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়। এজন্যেই আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জিকরের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

একবার একজন সাহাবী তাঁর খেদমতে আরজ করলোন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! শরীয়তের হুকুমতো অনেকই রয়েছে। তবে আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন যাকে আমি সার্বক্ষণিক কর্মসূচী স্বরূপ গ্রহণ করতে পারি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ সর্বদা যেন তুমি আল্লাহর জিকরে মশগুল থাক।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়া অভিশপ্ত আর দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত) তবে আল্লাহর জিকর ও যা কিছু তাঁর নিকটবর্তী হয় আলেম ও তালেবে এলম। অর্থাৎ আল্লাহর জিকরে যে মশগুল হয়, এ জিকর অব্যাহত রাখার জন্য যে সব পানাহার, বাসস্থান প্রভৃতি জিনিষ পত্রের প্রয়োজন হয় সেগুলো ব্যতীত আর আলেম ও জ্ঞানের অন্বেষণকারী তালেবে এলম ব্যতীত আর সবই এই হাদীসের আওতায় পড়ে। এজন্যে নাজাত লাভের সহজ পথ হলো আল্লাহর জিকরে মশগুল হওয়া, মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং দ্বীনি এলম হাসিল করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা।.

আরও একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) সহ একদল সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর জিকরে মশগুল ছিলেন। এমন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের মাঝে আগমন করলে তাঁরা নির্বাক হয়ে গেলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা কি করছিলে? তারা আরজ করলেন, আমরা আল্লাহর জিকরে মশগুল ছিলাম। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি লক্ষ্য করছিলাম আল্লাহর রহমত তোমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল। তখন আমার মন চাইছিল যে, আমিও তোমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করি।

এরপর তিনি আরো এরশাদ করলেনঃ আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন যাদের সঙ্গে উপবিষ্ট হবার আদেশ আমার প্রতি হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের এরশাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তুমি ফজরের নামায এবং আসরের নামাযের পর কিছুক্ষণ আমার স্মরণে মশগুল থাক, তাহলে এর মধ্যকার সময়ের জন্যে আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট হবো।

জিকরে এলাহীর আদব

১. আল্লাহর জিকরের আদব হলো তা উচ্চস্বরে হবে না, বরং অনুচ্চ স্বরে হবে।

২. কাঁদ কাঁদ অবস্থায় হবে।

৩. আল্লাহ পাকের দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাযির হবে।

৪. বিশেষতঃ সকাল-সন্ধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আল্লাহর জিকরে মশগুল হবে।

৫. কোন সময়েই আল্লাহ পাকের জিকর থেকে গাফেল হবে না।

ایك لحظه زكوے يار دورى = در مذهب عاشقان حرام است

এক মুহূর্তের জন্যে দরবারে এলাহী থেকে দূরে থাকা আল্লাহর প্রেমিকদের দৃষ্টিতে হারাম বা নিষিদ্ধ।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে জিকরের অর্থ হলো নামাযে পবিত্র কোরআন পাঠ করা। এ ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতের অর্থ হবে, যে নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পড়া হয়না সে নামাযে তোমরা অনুচ্চস্বরে মনে মনে পবিত্র কোরআন পাঠ কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা মধ্যম স্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ কর, একেবারে উচ্চস্বরেও নয় আবার একেবারে নিম্নস্বরেও নয়। এ পর্যায়ে তিনি হযরত কাতাদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ একরাতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত নিম্নস্বরে নামায আদায় করছেন, এরপর তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর দিকে গমন করলেন। দেখলেন তিনি অতি উচ্চস্বরে নামায আদায় করছেন।

যখন উভয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন, তখন হযরত আবু বকরকে (রাঃ) বলেছেন, আমি রাত্রে আপনার বাসস্থানের দিকে গিয়েছিলাম। আপনি অত্যন্ত নিম্নস্বরে নামায আদায় করছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি যাঁর নিকট দোয়া করছিলাম তাঁকেই শুনাচ্ছিলাম (অর্থাৎ তিনি আমার কথা শুনছিলেন)। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেনঃ আমি আপনার বাসস্থানের দিকে গমন করছিলাম। আপনি অত্যন্ত উচ্চস্বরে নামায আদায় করেছিলেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি তন্দ্রাহত লোকদেরকে জাগ্রত করি এবং শয়তানকে পলায়নে বাধ্য করি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে আবু বকর! আপনার আওয়াজ একটু উঁচু করুন আর হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ আওয়াজ কিছুটা নিচু করুন। (আবু দাউদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলা কখনও উচ্চস্বরে আর কখনও অনুচ্চ স্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আবি কোয়েশ বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র কোরআন পাঠের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি উচ্চ স্বরে তেলাওয়াত করতেন না অনুচ্চ স্বরে? তখন উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ তিনি উভয় অবস্থায় তেলাওয়াত করতেন। অর্থাৎ কখনও নিম্ন স্বরে আবার কখনও উচ্চস্বরে। তখন আমি বললামঃ আল্লাহর শোকর যে, তিনি সব কাজেই একটু প্রশস্ততা রেখেছেন।[১] (তিরমিজী)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৫৭-৫৮

পবিত্র কোরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে

রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের নামাযে পবিত্র কোরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম একাধিক মত পোষণ করেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, পবিত্র কোরআন উচ্চস্বরে পাঠ করা জরুরী তথা নিম্নস্বরে পাঠ করা মাকরুহ। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াসাল্লাম যখন স্বগৃহে তেলাওয়াত করতেন তখন এতখানি আওয়াজ হতো যে বাহির থেকে তা শ্রবণ করা সম্ভব হত। বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে হানী (রাঃ) তাঁর বাড়ীর ছাদ থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কেরাত শ্রবণ করেছেন।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, পবিত্র কোরআন পাঠকারীর ইচ্ছা যে, উচ্চস্বরে পাঠ করুক অথবা অনুচ্চস্বরে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও উচ্চস্বরে কখনও অনুচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন।

ইমাম তাহাবী (রঃ) লিখেছেন, হযরত উম্মে হানী এবং হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। পবিত্র কোরআন পাঠ করার এ বর্ণনায় কিন্তু একথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি সর্বদাই উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নামাজী ইচ্ছা করলে নিম্ন স্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে অথবা উচ্চস্বরে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। যারা এ মত পোষণ করেন তারা পুনরায় দু' দলে বিভক্ত। এক দলের মতে, নিম্নস্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ করা উত্তম কেননা, হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন পাঠকারীর অবস্থা হলো প্রকাশ্যে সদকা দাতার ন্যায়, আর নিম্নস্বরে পবিত্র কোরআন পাঠকারীর অবস্থা হলো গোপনে সদকা দাতার ন্যায়। আর একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে, প্রকাশ্যে সদকাহ দেয়ার চেয়ে গোপনে সদকাহ দেয়া উত্তম।

কেননা, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকা দাও তা ভাল আর যদি তোমরা তা গোপন কর এবং দরিদ্র লোকদেরকে দান কর তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম"।

আ'মাশ বর্ণনা করেন, আমি ইব্রাহীম (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থী হলো। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআন সরিয়ে রাখলেন এবং বললেনঃ এ ব্যক্তি যেন দেখতে না পারে যে আমি সর্বদা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছি। আবুল আলিয়া বর্ণনা করেন, আমি সাহাবায়ে কেরামের নিকট বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বললো, রাত্রে আমি পবিত্র কোরআনের এতখানি তেলাওয়াত করেছি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তোমার নসীবে এতখানি তেলাওয়াতই ছিল।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করাই উত্তম। এ মতের পক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে (তিনি বলেন), হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তোমাকে দাউদের সুর সমূহের মধ্য থেকে একটি সূর প্রদান করা হয়েছে।

আবু দাউদ ও নেসায়ী শরীফে সংকলিত, হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নিজেদের সুন্দর আওয়াজ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে সাজাও অর্থাৎ মধুর কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত কর যেন শ্রোতার কাছে পছন্দনীয় হয়।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) সহ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ লিখেছেন, যদি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতকারী নিজের সম্পর্কে এই আশঙ্কা করে যে, উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করলে তার মধ্যে রিয়া তথা লোক দেখানোর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হবে অথবা তার ভেতর অহংকার সৃষ্টি হবে তবে চুপিসারে তেলাওয়াত করাই উত্তম। আর যদি রিয়া বা লোক দেখানোর আশঙ্কা না থাকে তবে উচ্চ স্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ করাই উত্তম। উচ্চস্বরে পাঠ করলে অন্যরাও উপকৃত হয়। আর যে পাঠ করে

তার অন্তর জাগ্রত হয়। নিদ্রা পলায়নরত হয়। যারা নিদ্রিত, তন্দ্রাহত থাকে তারাও জাগ্রত হয়। এসব উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ করাই উত্তম মনে হয়। এজন্যে পবিত্র কোরআন দেখে পড়াই উত্তম। যদি শ্রোতাদের সংখ্যা অধিক হয় এমন অবস্থায়ও উচ্চস্বরে পাঠ করাই উত্তম। অবশ্য অনেক বেশী চিৎকার করে নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলে পবিত্র কোরআন পাঠ করা সঠিক নয়।

ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) হযরত ইমাম মালেক (রঃ)-এর সূত্রে আবু সোহায়েলের পিতার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) পবিত্র কোরআন এতখানি আওয়াজ করে পাঠ করতেন যে, আমি আবু জোহায়েমের ঘরের নিকট থেকে তা শ্রবণ করতাম। এজন্যে ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলেছেন, যে নামাযে পবিত্র কোরআন আওয়াজ দিয়ে পড়ার বিধান রয়েছে সে নামাযে উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ করা উচিত। কিন্তু পবিত্র কোরআন পাঠ করার সময় অতি উচ্চস্বরে পাঠ করে নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলা উচিত নয়।

তাউসের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সবচেয়ে ভাল আওয়াজে কোরআন পাঠকারী অথবা সবচেয়ে ভাল ক্বারী কে? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ সে ব্যক্তি, যখন তোমরা তার নিকট পবিত্র কোরআন শ্রবণ কর তখন এ সত্য উপলব্ধি কর যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ পাককে ভয় করে। দারেমী তাউসের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, পবিত্র কোরআন সবচেয়ে বেশী ভাল পাঠকারী সে ব্যক্তি যে পবিত্র কোরআন পাঠ করার সময় আল্লাহ পাককে সবচেয়ে বেশী ভয় করে।[১]

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۩

অর্থাৎ যারা আপনার প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছে তারা কখনও তাঁর এবাদতের ব্যাপারে অহংকার করেনা। তারা তাঁর পবিত্র মহিমা স্মরণ করে, তাঁর পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করে এবং শুধু তাঁকেই সেজদা করে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে- الَّذِينَ। অর্থাৎ "যারা" বলে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যাদেরকে তারা হলেন ফেরেশতাগণ, আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং নেককার বন্দাগণ। এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৫৯-৬০

ধন্য হওয়ার তাৎপর্য হলো দরবারে এলাহীতে পছন্দনীয় হওয়া। অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রিয় এবং পছন্দনীয় তারা অহংকার করেনা। আল্লাহ পাকের এবাদতের ব্যাপারে নিজেকে বড় মনে করেনা, বরং আল্লাহ পাকের এবাদতের মাধ্যমেই নিজের উন্নতি সাধন করে এবং শুধু আল্লাহ পাককেই সেজদা করে এবং শুধু তাঁরই এবাদত করে, অন্য কাউকে তাঁর এবাদতে শরীক করেনা।

মে'দান এবনে তালহা বর্ণনা করেন, আমি হযরত সওবান (রাঃ)-এর সঙ্গে মোলাকাত করি। তাঁকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আজাদ করেছিলেন, আমি আরজ করলাম আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার কারণে আমি জান্নাতে যেতে পারি। কিন্তু তিনি নীরব হলেন। আমি দ্বিতীয়বার দরখাস্ত করলাম তিনি তখনও নীরব হলেন। আমি তৃতীয়বার প্রশ্ন করলাম তখন তিনি বললেনঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এই প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে সেজদা করতে থাক। তুমি আল্লাহকে যে সেজদাই করবে আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে তোমার একটি মর্তবা উচ্চ করবেন আর একটি গুনাহ দূরীভূত করবেন।

হযরত মে'দান (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি এরপর হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং তাঁর নিকটও এ প্রশ্ন করি। তিনিও এ জবাবই দেন যা হযরত সওবান (রাঃ) দিয়েছেন। (মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সেজদার অবস্থায় বন্দা তার প্রতিপালকের সর্বাধিক নৈকট-ধন্য হয়। অতএব, তোমরা (সেজদা অবস্থায়) অধিক পরিমাণে দোয়া কর। (মুসলিম)

আলোচ্য আয়াত খানি সেজদার আয়াত। এমন আয়াত তেলাওয়াত করার সঙ্গে সঙ্গে সেজদা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন আদম সন্তান সেজদার আয়াত পাঠ করে সেজদা করে তখন শয়তান ক্রন্দনরত অবস্থায় উক্ত স্থানটি ত্যাগ করে এবং বলে, হায় আক্ষেপ! আদম সন্তানদেরকে সেজদার আদেশ দেয়া হয়েছে তারা সেজদা করেছে এবং তাদের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা হয়েছে। আর আমাকেও সেজদার আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি সেজদা করতে অস্বীকার করেছি, তাই আমার জন্যে দোযখের ব্যবস্থা হয়েছে। (মুসলিম)

হযরত রবীয়া এবনে কা'ব বর্ণনা করেন, আমি রাত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকতাম, তাঁর অজুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনের আয়োজন করতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাও। আমি আরজ করলাম আমি জান্নাতে আল্লাহর রসূলের নিকটে থাকতে চাই। তিনি এরশাদ করলেনঃ এছাড়া তুমি অন্য কিছু চাও। আমি আরজ করলাম আমারতো এটিই আরজী। তখন তিনি এরশাদ করলেন, অধিক পরিমাণে সেজদা করে তোমার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর অর্থাৎ তুমি অধিক পরিমাণে সেজদা করতে থাক যেন জান্নাতে তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারি।[১]

این سخن را نیست هرگز اختسام = ختم کن والله اعلم بالسلام

"একথার শেষ নেই কোন অবস্থাতেই, অতএব তুমি এখানেই শেষ কর। মূলতঃ আল্লাহ পাককেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৬২-৬৩

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা আনফাল

মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ, আয়াত-৭৫, রুকু-১০

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّعَشْرُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۭ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۠ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ① اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ
وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ②
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③ اُولٰۗىِٕكَ
هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ
كَرِيْمٌ ④

তরজমা

(১) (হে রসূল!) লোকেরা আপনাকে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ পাক ও রসূলেরই। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখ এবং আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধি-নিষেধ মেনে চল, যদি তোমরা মোমেন হও।

(২) মোমেনতো শুধু তারাই, আল্লাহ্ পাকের নামে যাদের প্রাণ কেঁপে ওঠে, যখন আল্লাহ্ পাকের স্মরণ করা হয়, আর যখন তাঁর আয়াত সমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে।

(৩) যারা নামায সঠিকভাবে আদায় করে এবং আমার প্রদত্ত রিয্ক থেকে ব্যয় করে।

(৪) তারাই প্রকৃত মোমেন, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের উম্মতদের অবস্থা এবং তাদের মোকাবেলায় আম্বিয়ায়ে কেরামের বিজয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাফল্যের বিবরণ স্থান পেয়েছে। বিশেষতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধে যে সাহায্য করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম জেহাদ। এ জেহাদে আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে বিজয় দান করেছেন।

যেহেতু এ সূরায় বদরের যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে তাই এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ভাবে এর নেপথ্য ঘটনা বর্ণনা করা সমীচিন মনে হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ ১৩টি বছর দ্বীন ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু মক্কাবাসী শুধু যে ইসলাম গ্রহণ করেনি তাই নয়, শুধু যে তাঁর বিরোধিতা করেছে তা-ও নয়, বরং তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম জুলুম-অত্যাচার করে। জুলুম-অত্যাচারের ইতিহাসে এমন জুলুমের ঘটনা বিরল। এতদসত্ত্বেও মুসলমানগণ জালেমদের মোকাবেলা করেননি, বরং ধৈর্য ধারণ করেছেন। কোরআনে করীমের বহু আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ কঠিন মুহূর্তে সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

(সূরা মুজ্জাম্মেল)

(হে রসূল!) তারা যা বলে তাতে আপনি সবর অবলম্বন করুন এবং সৌজন্য সহকারে তাদের থেকে দূরে থাকুন। যেমন সূরা তোয়হায় এরশাদ হয়েছেঃ

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

"(হে রসূল!) কাফেররা যা বলে তার উপর সবর অবলম্বন করুন এবং আপনার প্রতিপালকের হামদের তসবীহ পাঠ করুন সকাল এবং সন্ধ্যায়"।

বস্তুতঃ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সবর ও ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, অবশেষে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে সাহাবায়ে কেরামকে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে করে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করতে হয়। তাঁরা হিজরত করেন নির্যাতীত-উৎপীড়িত অবস্থায়, নিঃস্ব হৃতসর্বস্ব হয়ে। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম ঈমানী শক্তির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যেহেতু দুশমনকে মোকাবেলার অনুমতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পাওয়া যায়নি, তাই জালেম দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ অস্ত্রধারণ করেননি, অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত অবস্থায়ই ১৩ বছরের সুদীর্ঘ জীবন যাপন করেছেন।

হিজরতের পর মজলুম মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক জালেম দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দান করে ঘোষণা করলেনঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে, আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম"। (সূরা হজ্জ)

দ্বিতীয় হিজরীতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন যে, মক্কার মুশরেকদের এক বিরাট বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মালপত্র নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছে। শত্রুর অর্থবল ভেঙে দেয়া এ মুহূর্তে একান্ত জরুরী তাই ৩১৩ জন সঙ্গী নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হলেন। আবু সুফিয়ান এ খবর পেয়ে মক্কায় সাহায্যের জন্যে লোক পাঠায়। আবু জেহেলের নেতৃত্বে ১০০০ সৈন্যের এক বাহিনী মদীনা মোনাওয়্যারার দিকে অগ্রসর হয়। আবু সুফিয়ান পথ পরিবর্তন করে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। ফলে মুসলমানদের সঙ্গে মদীনা শরীফ থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে বদর নামক স্থান আবু জেহেলের নেতৃত্বাধীন সৈন্যের মোকাবেলা হয়।

মুসলমানদের নিকট মাত্র দু'টি অশ্ব ছিল এবং প্রতি নয়জনের জন্যে একখানা তরবারি ছিল। আর ১০০০ অশ্বারোহী কাফের মুসলমানদের ৩১৩ জনের মোকাবেলায় উপস্থিত ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ দানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বাধীন সাহাবায়ে কেরামকে বিজয় দান করলেন এবং কুফর ও নাফরমানীর বিষ দাঁত চিরতরে ভেঙে দিলেন। কাফেরদের ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হলো আর ৭০ জন বন্দী হলো।

শানে নুযুল

তিরমিজী, এবনে মাজা, মসনদে আহমদ, মুসতাদরাক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) থেকে 'আনফাল' শব্দের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, এ আয়াত আমাদের বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য হয়েছিল। আল্লাহ পাক এ আয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আমাদের হাত থেকে নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সোপর্দ করেন। তিনি বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তা সমানভাবে বিতরণ করে দেন। ঘটনাটি ছিল এই, আমরা সকলে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদর রণাঙ্গণে উপস্থিত হই। উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়।

অবশেষে আল্লাহ পাক দুশমনদেরকে পরাজিত করেন। তখন আমাদের লোকজন তিনভাগে বিভক্ত হয়। একদল দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করেন যেন দুশমন ফিরে না আসতে পারে। আর কিছু লোক দুশমনের পরিত্যক্ত সম্পদ একত্রিত করতে থাকেন। আর কিছু লোক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চারিপার্শ্বে একত্রিত থাকেন যেন কোন আত্মগোপনকারী দুশমন তাঁর উপর অতর্কিতে হামলা না করে বসে। রাতে যখন সবাই নিজ নিজ স্থানে পৌঁছেন তখন যাঁরা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ একত্রিত করেছিলেন তাঁরা বললেন, এ সম্পদ আমাদের কেননা, আমরাই এগুলো একত্রিত করেছি। এতে আর কারো অংশ নেই। যাঁরা দুশমনের পিছু ধাওয়া করেছিলেন তাঁরা বললেন, তোমরা আমাদের চেয়ে এই সম্পদের অধিকতর হক্বদার নও কেননা, আমরা দুশমনকে ধাওয়া করেছি বলেই তোমরা এসব দ্রব্য-সামগ্রী একত্রিত করতে পেরেছ।

আর যাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চারিপার্শ্বে তাঁর হেফাজতের জন্য একত্রিত ছিলেন তাঁরা বললেনঃ আমরা ইচ্ছা করলে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ একত্রিত করতে পারতাম। কিন্তু আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছি। অতএব, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের আমরাও অধিকারী। বিভিন্ন মত পোষণকারীদের এসব কথার বিবরণ যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। হযরত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেন যে, এই সম্পদ আল্লাহ পাকের, এছাড়া এর কোন মালিক নেই। তবে আল্লাহর রসূল যাকে দান করেন। তাই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে গনিমতের মাল সমান ভাবে বিতরণ করে দিলেন। এতে সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। পূর্বে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার কারণে তাঁরা অনুতপ্ত হলেন।[১]

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط

(হে রসূল!) তারা আপনার নিকট গনিমতের মাল তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এ সম্পদের মালিকানা আল্লাহ পাকের, আর তা ব্যয় করার অধিকার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের, যিনি আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক মানুষের মধ্যে তা বিতরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অধিকার আল্লাহ পাক মানুষের হাত থেকে নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। আর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করেছেন।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ

অর্থাৎ- আল্লাহকে ভয় কর, পরস্পরের মতভেদ পরিহার কর আর এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে থাক।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ

অর্থাৎ- তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মেনে চল, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে বিধান দেয়া হয়েছে তার বাস্তবায়ন কর, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঈমানের দাবী হল আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি বিধান অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা। আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুলের আরও বিবরণ রয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০২
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০২৩-২৪

(২) এবনে আবি শায়বা, ইমাম আহমদ (রহঃ), আবদ এবনে হোমায়েদ এবং এবনে মরদবিয়া হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, (তিনি বলেন) বদরের যুদ্ধের দিন আমার ভাই উমায়ের শহীদ হন। আমি সাঈদ এবনে আসকে হত্যা করে তার তরবারীটি নিলাম। তরবারীটিকে 'জুলকাতফা' বলা হত। এরপর আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলাম, আজ মুশরেকদের তরফ থেকে আল্লাহ পাক আমার মনকে শান্ত করেছেন। এ তরবারীটি আমাকে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হিসেবে দান করেছেন। আর আমি সে ব্যক্তি যাকে আপনি জানেন (অর্থাৎ-আমার বীরত্ব ও ঈমানের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে আপনি ওয়াকেফহাল, এজন্যে এই তরবারীটির আমি হক্বদার)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ তরবারীটি আমারও নয় তোমারও নয়, অতএব তা রেখে দাও। আমি রেখে দিলাম। আমি ভাবলাম, হয়তো তিনি তরবারী এমন কাউকে দেবেন যার অবদান আমার মত হবে না। তাই আমি এই ধারণা করে একটু ইতঃস্তত করেছিলাম।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তরবারীটি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের মধ্যে রেখে দাও। একথা শ্রবণ করে আমার মনে যে ব্যথা হল, আমার ভাইয়ের শাহাদাতের কারণে এবং এ দুশমন থেকে পাওয়া সম্পদ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে জমা দেয়ার কারণে তা আল্লাহ পাকই জানেন। আমি যখন তরবারীটি রাখছিলাম তখন আমার প্রবৃত্তি পুনরায় আমাকে মন্দ বললো। তাই পুনঃ আরজ করলাম আমাকেই তরবারীটি দান করুন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি রাগ করলেন। আমি সরে এলাম। একটু পরেই সূরায়ে আনফাল নাযিল হল। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যাও, তোমার তরবারী নিয়ে নাও। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন আগমন করলেন এবং এরশাদ করলেন, তুমি আমার নিকট তরবারীটি চেয়েছিলে তখন তা আমার ছিল না, এখন তা আমার হয়েছে। এই তলোয়ার তোমার জন্যে।

(৩) ইমাম বোখারী (রহঃ) লিখেছেন, সা'দ এবনে যোবায়েরের বর্ণনা এই, তিনি এবং একজন আনসারী ব্যক্তি তাঁরা উভয়ে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বা গনিমতের মাল সংগ্রহের জন্য বের হন। তাঁরা দুজনেই একটি তরবারি পড়ে থাকতে দেখেন এবং উভয়েই তা নেয়ার চেষ্টা করেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, এটি আমার, ঐ আনসারী সাহাবীও বলেন, এটি আমার, আমি দেব না। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলে তাঁরা উভয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তরবারীটি তোমারও নয়

আনসারীরও নয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এরপর দশ পারার প্রথম আয়াত-

وَاعْلَمُوْاۤ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ

নাযিল হলে আলোচ্য আয়াতের হুকুম বাতিল হয়।

(৪) এবনে জরীর, এবনে মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আনফাল তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অধিকার একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই ছিল, এর মধ্যে কারো কোন এখতিয়ার ছিল না। মুজাহেদগণ যা পেতেন তা এনে জমা দিতেন। একটি ছুরি পর্যন্ত যদি কেউ রাখতো তবে তাকে চুরি মনে করা হতো। লোকেরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করলো যে, হে আল্লাহর রসূল! যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে আমাদেরকেও কিছু দান করুন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

یَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ মালে গনিমত তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আল্লাহর, যা আমি আমার রসূলের অধিকারে দিয়ে দিয়েছি। এতে তোমাদের কোন কিছু নেই। তোমরা আল্লাহর পাককে ভয় করতে থাক এবং পরস্পরের সদ্ভাব বজায় রাখ। এরপর-

وَاعْلَمُوْاۤ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ

নাযিল হয়। তখন যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজনের জন্যে এবং মিসকীনদের জন্যে এবং আল্লাহর রাহে হিজরতকারীদের জন্য নিদৃষ্ট হয়। আর বাকী চার অংশ অন্যদের জন্যে নিদৃষ্ট হয়।

মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী লিখেছেনঃ যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মালে গনিমত তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ সমানভাবে বিতরণ করেছিলেন তখন সাদ এবনে মাআজ (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যে অশ্বারোহী জাতির হেফাজতে নিয়োজিত, তাকে আপনি এতখানি দিচ্ছেন যতখানি একজন দুর্বল ব্যক্তিকে দেয়া হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমার মাতা তোমার জন্যে ক্রন্দন করুক (তুমি কি একথাও উপলব্ধি কর না যে, তোমাদের বিজয় অর্জিত হয় দুর্বলদের বরকত এবং দোয়ার কারণে)। এরপর

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, যে কোন যুদ্ধরত কাফেরকে হত্যা করে তার নিকট থেকে পাওয়া সম্পদ সে ব্যক্তিরই। আর যে কোন কাফেরকে বন্দী করে সে বন্দী তারই।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কাফেরকে হত্যাকারী ব্যক্তিকে নিহত কাফেররের সম্পদ দিয়ে দিতেন।[১]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য

প্রকৃত মোমেন সেসব লোক যাদের সম্মুখে যখন আল্লাহ পাকের জিকর হয় তখন তাদের প্রাণ কেঁপে উঠে, আল্লাহ্ পাকের কালাম শ্রবণ করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা ভরসা করে শুধু এক আল্লাহ পাকের প্রতি। যারা নিয়মিত নামায কায়েম করে, তারা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ধন-সম্পদ সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে থাকে, এরাই হলো প্রকৃত মোমেন। তাদের জন্যেই রয়েছে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে উচ্চ মর্তবা, মাগফেরাত এবং উত্তম রিয্ক।

এ আয়াদের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

অর্থাৎ- তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের জন্য পূর্ব শর্ত হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য।

আলোচ্য আয়াতে একথাটির বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। প্রথম কথা হলো প্রকৃত মোমেন সে ব্যক্তি যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে, আল্লাহ পাকের জিকর হওয়া মাত্র তার অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠবে। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯-২০
তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১১৫
খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪১

'নিশ্চয় যারা থাকে তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত'। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

অর্থাৎ- যারা তাদের নামাযে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ ভয় দু' প্রকার (১) আযাবের ভয়ে (২) শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের ভয়।

আযাবের ভয় অবাধ্য নাফরমানদের জন্যে আর আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের ভয় সবার অন্তরেই আছে, এমনকি নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা হোক অথবা নবী রসূল– সবার অন্তরে এ ভয় রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী। আর মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয় তাকে স্বাভাবিক ভাবেই ভয় করে। দ্বিতীয়তঃ যখন প্রকৃত মোমেনদের নিকট আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

ঈমানের তাৎপর্য

এখন প্রশ্ন ঈমানের তাৎপর্য কি? হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ঈমান হলো আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা স্বীকার করা।

ইমাম জুহরী (রঃ) বলেন, আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান মোতাবেক আমল করার নামই ঈমান।

রুবাই এবনে আনাস বর্ণনা করেন, এ আয়াতে ঈমানের অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় করা।

প্রখ্যত তফসীরকার এবনে জরীর বর্ণনা করেন, তিনটি কথাকে একত্রিত করার মাধ্যমেই ঈমানের ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি মনে প্রাণে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এ বিশ্বাসের কথা মুখে স্বীকার করা এবং কার্যাবলীর মাধ্যমে এই ঈমানের প্রমাণ উপস্থাপন করা। আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা। আর আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভয় যত বৃদ্ধি পাবে তা তাঁর প্রতি ঈমান বৃদ্ধিরই নিদর্শন হবে।

প্রকৃত ঈমানদারের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো ঈমানদারগণ শুধু আল্লাহ্ পাকের প্রতিই ভরসা করে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছেই তারা কিছু আশা করেনা। এ পর্যন্ত যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়া হলো এসবই মানব মনের অবস্থা। সবই অন্তরের ব্যাপার। অবশিষ্ট দু'টি বৈশিষ্ট্যে হলো আমল সংক্রান্ত অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পায় নামাযের মাধ্যমে। যারা প্রকৃত মোমেন, তারা সঠিকভাবে নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যয় করে। এরমধ্যে যাকাত, সদকা, খয়রাত এবং জেহাদ ও মসজিদের জন্যে ব্যয়, এমনিভাবে দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারের ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত।

যাদের মধ্যে এ গুণাবলী পাওয়া যাবে তারাই প্রকৃত মোমেন, তারাই উন্নত আদর্শের অনুসারী।[১]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ তারাই প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি, যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয় আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্যের কারণে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা কোন পাপ কার্যের ইচ্ছা করে, যখন তাদেরকে এ ব্যাপারে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা এ কাজ করোনা, তখন তারা পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে। এমন অবস্থায়–

ذُكِرَ اللَّهُ

বাক্যটির অর্থ হবে যখন আল্লাহ্ পাকের আযাব সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

অর্থাৎ- যখন তাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন পবিত্র কোরআনের বরকত সমূহ নাযিল হয় এবং ঈমানের দলিল সমূহ উদ্ভাসিত হয়। ফলে অন্তরে একীন আরো সুদৃঢ় হয় এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়।

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۝

অর্থাৎ তারা তাদের যাবতীয় কাজ আল্লাহ্ পাকের উপরই সোপর্দ করে, তাদের সকল আশা আল্লাহ্ পাকের নিকট এবং আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কাউকে তারা ভয় করে না।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَٰوةَ

অর্থাৎ নামাযের যাবতীয় হক্ব তারা আদায় করে তথা তারা সঠিক ভাবে নামায আদায় করে এবং তারা আল্লাহর রাহে দান করে তথা শারীরিক ও আর্থিক এবাদতে মশগুল হয়।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১১৭-২০

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলঃ আপনি কি মোমেন? তিনি বলেছিলেন, যদি তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয় এই যে, আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর রসূলগণের প্রতি আমার ঈমান আছে কি-না তবে আমি বলবোঃ অবশ্যই আছে এবং নিশ্চয় আমি মোমেন। কিন্তু যদি তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই হয় যে, আলোচ্য আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে আমি তাদের অনুরূপ কি-না তা হলে আমি বলবো আমি তা জানি না। হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্দেশ্যে হলো, ঈমানতো আল্লাহর রহমতে আছে কিন্তু পরিপূর্ণ ঈমান এবং এখলাস ও উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত মোমেনের যে রূপ আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এ পর্যায়ে যে মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে তাতে আমি সফল হয়েছি কি-না তা জানি না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যে মুনাফেক নয় সে অবশ্যই মোমেন।[১]

হারেস এবনে মালেক (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ হারেস সকাল কিভাবে অতিবাহিত হলো?

হারেস বললেনঃ প্রকৃত মোমেন হিসেবেই সকাল অতিবাহিত হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ ভাল করে বুঝে শুনে কথা বল। প্রত্যেকটি জিনিসেরই তাৎপর্য থাকে। তোমার ঈমানের তাৎপর্য কি?

হারেস বললেনঃ দুনিয়ার মহব্বত থেকে আমি বিমুখ হয়েছি, রাত্রিকালে জাগ্রত থেকে আল্লাহর এবাদত করি আর আমার অবস্থা এই, যেন আমার সম্মুখে আল্লাহর আরশ উম্মুক্ত রয়েছে এবং যেন জান্নাতবাসীগণকে আমি পরস্পর সাক্ষাত করতে দেখি এবং দোযখীদেরকে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে হারেস! তুমি ঈমানের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছ এবং তার সত্যিকার মর্তবা পেয়েছ। এর উপর কায়েম থাকার চেষ্টা কর। একথাটি তিনি তিনবার এরশাদ করেছেন।[২]

لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ

তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চ মর্তবা সমূহ এবং আল্লাহ পাক তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন আর তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতে উত্তম রিয্ক ও এমন অনন্ত অসীম নেয়ামত সমূহ যা কোন চোখ দেখেনি, যে সম্পর্কে কোন কান শোনেনি এমনকি, কোন অন্তর এ সম্পর্কে চিন্তাও করেনি।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১-২২
২। তফসীরে রুহুল মাআন খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৬৭

তফসীরকারগণ লিখেছেন, মোমেনের আমল হিসেবেই জান্নাতে বিভিন্ন মর্তবার পার্থক্য হবে। হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে ১০০টি মর্তবা রয়েছে। একটি মর্তবা আরেকটি মর্তবার মধ্যে পার্থক্য হবে এমন যেমন আসমান জমিনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সর্বোচ্চ মর্তবা হবে ফেরদাউসের। ফেরদাউসের থেকেই জান্নাতের চারটি নহর বের হয়। ফেরদাউসের উপর রয়েছে আরশ, তোমরা দোয়া করার সময় আল্লাহ পাকের দরবারে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে দোয়া করো।[১]

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٥ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا
يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى
الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ
لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٧
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨

তরজমা

(৫) (হে রসূল!) যেভাবে আপনার প্রতিপালক আপনাকে ন্যায্য কর্তব্য সম্পাদনে আপনার গৃহ থেকে বের করেছিলেন অথচ মোমেনদের একদল তা পছন্দ করে নাই।

(৬) সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় যেন তারা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে এবং তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে।

(৭) আর সে সময়কে স্মরণ কর যখন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, দু' দলের একদল তোমাদের আয়ত্বাধীন হবে, অথচ তোমরা চেয়েছিলে নিষ্কন্টক দলটি তোমাদের হোক। আর আল্লাহ পাকের অভিপ্রায় এই যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪

(৮) কাফেররা যত অসন্তুষ্ট হোক না কেন, তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরায় বদরের যুদ্ধের সাফল্যের কথা এবং এ পর্যায়ে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহের উল্লেখ রয়েছে। সূরার শুরুতে সংক্ষিপ্তভাবে এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্যের বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ে যে গায়বী মদদ লাভ হয়েছে তার আলোচনা রয়েছে যাতে করে মহান আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য করে মুসলমানগণ আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বাহ্যিক উপকরণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আল্লাহ্ পাকের অন্তহীন নেয়ামতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

শানে নুযুল

বদরের যুদ্ধ মুসলমানের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনন্য-সাধরণ দয়ার এক জীবন্ত নির্দশন। এ ঘটনা শুধু মুসলিম জাতির জীবনেই যে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ঘটনা। মানব জাতির ইতিহাস বদরের যুদ্ধের দিন থেকে পরিবর্তন হয়। অসত্য, অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচারের অবসান ঘটতে শুরু করে বদরের যুদ্ধের দিন থেকে। জর্জরিত মানবতা ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের দিন থেকে নবপ্রাণ লাভ করতে শুরু করে। ঘটনার বিবরণ এই, মক্কার পৌত্তলিকদের একটি কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছিল। আবু সুফিয়ান ছিল কাফেলার নেতা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ খবর পেয়ে সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেনঃ মক্কার কোরায়শদের এ বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে আসছে তার মোকাবেলা করা আমাদের কর্তব্য। কেননা, দুশমন শক্তিশালী হলে তার মোকাবেলা করাও কঠিন হয়। অতএব, দুশমনের অর্থবল হ্রাসের চেষ্টা একান্ত জরুরী। এদিকে আবু সুফিয়ান এ সংবাদ পেল যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তার মোকাবেলায় অগ্রসর হচ্ছেন। তাই সে জমজম এবনে আমর গাফফারী নামক এক ব্যক্তিকে মক্কায় দ্রুত প্রেরণ করলো এ সংবাদ দিয়ে যে, হে মক্কাবাসী! তোমাদের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্যে অতি সত্বর রওয়ানা হও। এ সংবাদ পেয়ে আবু জেহেল ১০০০ অশ্বারোহীর এক বিরাট দল নিয়ে রওয়ানা হলো। কিন্তু আবু সুফিয়ান পথ পরিবর্তন করে আত্মরক্ষা করলো।

অন্যদিকে, আবু জেহেল তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে বদরের ময়দানে হাযির হলো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন ওয়াদী জাফরান নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। এখানে জীব্রাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে আসলেন এবং আবু জেহেলের সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে তাঁকে অবগত করলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ একদিকে আবু জেহেল সহস্র অশ্বারোহী নিয়ে হাযির হয়েছে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে, অন্যদিকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীনে বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছে। তোমরা কোন্ দলের সঙ্গে লড়াই করবে?

এ প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য দেখা দেয়। তাদের মধ্যে কিছু লোক বলেন, আমরা সংখ্যায় কম, নিরস্ত্র-প্রায়, যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। এমন অবস্থায় রণ-সম্ভারে সজ্জিত সমগ্র বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা না করে বাণিজ্য কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযান করাই শ্রেয়। একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যথিত হলেন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মেকদাদ (রাঃ) ও হযরত সা'দ এবনে মাআয (রাঃ) বক্তব্য পেশ করলেন এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রতিজ্ঞা করলেন।

এ পর্যায়ে একথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পূর্বাহ্নে একথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন বাণিজ্য কাফেলা অথবা আবু জেহেলের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর যে কোন একটিকে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের করতলগত করে দেবেন তথা তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত।

অতএব, মুসলমানগণ কোন্টি চান? এ প্রশ্নেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর পর বক্তব্য রাখেন হযরত সা'দ এবনে মাআয (রাঃ)। তিনি আরজ করেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ্ পাক আপনাকে যে আদেশ দিয়েছেন আপনি তার উপর আমল করুন। আল্লাহর শপথ! যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দেন তবে আমরা তাই করবো, আমাদের একটি লোকও পেছনে পড়ে থাকবে না। আমরা দুশমনের মোকাবেলা করতে আদৌ অপ্রস্তুত নই, যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দেব। দুশমনের মোকাবেলায় আমরা অটল অবিচল থাকব। হয়তো আল্লাহ পাক আমাদের মাধ্যমে এমন কিছু দেখাবেন যার দ্বারা আপনার নয়ন-মন শান্তি পাবে। আপনি আল্লাহ্ পাকের নামে আগ্রসর হোন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হলেন।

কয়েকজন মুসলমানের এ ধারণা ছিল-যেহেতু আমরা যুদ্ধের জন্যের প্রস্তুত নই, তাই আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য-কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযান করাই লাভজনক ব্যাপার। পক্ষান্তরে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অভিপ্রায় ছিল মানবতার দুশমনের মোকাবেলা করা। কেননা, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার মোকাবেলা করলে সম্পদ লাভ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু মুসলিম জাতির জীবনে যে অবিস্মরণীয় বিজয় বদরের রণাঙ্গনে অর্জিত হয়েছিল তা হতো না। পৃথিবীর ইতিহাসে যে নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে তা-ও হতো না। শত্রুর বিষ দাঁত ভেঙে দিয়ে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে প্রয়াস চলেছে তা চলতো না। ঐ মুহূর্তে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

যেভাবে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বিতরণের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য হওয়ায় পূর্ববর্তী আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিক তেমনি বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে যে মতানৈক্য হয়েছিলো সে সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص

(হে রসূল!) যেভাবে লোকেরা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বিতরণের ব্যাপারে মতভেদ করেছিলো, এমনিভাবে আপনাকে যখন আল্লাহ পাক আপনার ঘর থেকে বের করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত করেছেন তখন আপনার বের হওয়ার ব্যাপারেও তারা মতভেদ করেছে। তারা যুদ্ধকে এমনভাবে ভয় করছিলো যেন তাদেরকে কেউ মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। (হে রসূল!) তারা এ সত্য বিষয়ে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন, যখন তাদের নিকট বিরাট বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রদত্ত সুসংবাদ দ্বারা একথা জানানো হয়েছিলো যে, মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত এবং কাফেরদের পরাজয় অবধারিত আর তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং সাহায্যেই হয়। আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অবশ্যই কার্যকর হয়। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির খেলাফ হয় না কোন অবস্থাতেই।

"আনফাল" বা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। যেভাবে সম্পদকে সমানভাবে বিতরণ করা কিছু লোক অপছন্দ করেছে, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক যখন (হে রসূল!) আপনাকে ঘর থেকে বের করে বদরের রণাঙ্গনে পৌঁছিয়েছেন তখনও কিছু লোক এ কাজকে অপছন্দ করেছে। যেভাবে বদরের রণাঙ্গনে দুশমনের মোকাবেলার মাধ্যমে আল্লাহ পাক

মুসলমানদেরকে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন এবং বদরের যুদ্ধ মানব জাতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে রয়েছে ঠিক তেমনি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ সমানভাবে বিতরণের যে নীতি আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন তার বাস্তবায়নেই রয়েছে মুসলিম জাতির কল্যাণ। মুসলিম জাতির কাজই হলো আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। আর মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ পাকের সাহায্যই যথেষ্ট। মুসলমানদের ভরসা একমাত্র আল্লাহ পাকের প্রতিই। তাই আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেকই হবে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা।

আর আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমেই হবে মুসলমানদের অবস্থান এবং প্রস্থান যেমন বদরের রণাঙ্গনে গমনের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে দান করেছেন বিরাট সাফল্য, ঐতিহাসিক বিজয়।

يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ۞

"(হে রসূল!) যারা আপনার সাথে বিতর্ক করে," অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে গমন করে দুশমনের মোকাবেলার ব্যাপারে যারা ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, আলোচ্য বাক্য দ্বারা তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, এমন বিষয়ে মতবিরোধ করা সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্তবা ও শানের খেলাফ। তফসীরকারগণ লিখেছেন, যারা এসব ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন তাঁরা বিরোধিতার জন্যে তা করেননি, বরং পরিস্থিতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তারা এমন মত পোষণ করেছেন যা আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই তিনি তাঁদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ

অর্থাৎ মোমেনদের একটি দল এ মত পছন্দ করেননি বলে মন্তব্য করেছেন। যেহেতু বিজয় শুধু আল্লাহ পাকের সাহায্যেই লাভ হয়, তোমাদের শক্তিতে নয়। তাই নিরস্ত্র-প্রায় হওয়া, অল্প সংখ্যক হওয়া তোমাদের বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৪-০৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪-২৫

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ

আর তোমরা সে সময়কে স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ পাক এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে, দু' দলের একদল তোমাদের করতলগত হবে (আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক দল অথবা আবু জেহেলের সামরিক দল)।

আর তোমরা এ আশা করছিলে যে, নিষ্কন্টক বাণিজ্যিক দল তোমাদের হাতে আসুক। অথচ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছিল সত্য দ্বীন ইসলামের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে কার্যতঃ প্রমাণ করবেন এবং কাফেরদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবেন। সত্যকে সত্য এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রমাণ করবেন যদিও পাপিষ্ঠরা তা অপছন্দ করে।

এবনে জরীর, এবনে মুনজের হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক কাফেরদের দু'দলের এক দলকে মুসলমানদের করতলগত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মুসলমানদের কিছু লোক আকাঙ্ক্ষা করছিল যে, বাণিজ্যিক দল আয়ত্বে আসুক। কেননা, তাদের মোকাবেলা করা সহজ হবে আর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলের নেতৃত্বাধীন সামরিক দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিলেন।

وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের অভিপ্রায় হলো সত্যকে প্রকাশ করা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করা, তোমাদেরকে জেহাদের হুকুম দেয়ার মাধ্যমে অথবা ফেরেশতাদেরকে তোমাদের সাহায্য করার আদেশ প্রদানের মাধ্যমে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক সত্য দ্বীনকে বিজয়ী করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার বাস্তবায়ন করা যেন কাফেরদের মূলোৎপাটন করা হয়।

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা চেয়েছিলে নিষ্কন্টক, নির্ঝঞ্ঝাট বাণিজ্যিক দলের মোকাবেলা করে অর্থ সম্পদের মালিক হবে কিন্তু আল্লাহ্ পাকের মর্জি হলো দ্বীন ইসলাম যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, অবাধ্য কাফেরদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হয় এবং তোমরা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্যমণ্ডিত হও। অবশেষে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর হয় এবং মুসলিম জাতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। ইসলামের ইতিহাসে তথা মানবতার ইতিহাসে নব যুগের সূচনা হয়, সত্যের জয় হয় এবং মিথ্যা ও বাতিল পরাজয় বরণ করে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ

অর্থাৎ যেভাবে তোমরা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের ব্যাপারে মতভেদ করেছিলে, এরপর আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত গনিমত তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আল্লাহর রসূলের হাতে দিয়েছিলেন। তিনিই তোমাদের মধ্যে সমানভাবে সে সম্পদ বিতরণ করে দিয়েছিলেন আর এ পন্থাই ছিল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। (হে রসূল!) ঠিক এভাবে দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে আল্লাহ পাক আপনাকে যখন মদীনা মোনাওয়্যারা থেকে বের করেছিলেন তখনও কিছু লোক এ কর্মসূচীকে পছন্দ করেনি এবং এ ব্যাপারে মতভেদ করেছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাদের মদীনা মোনাওয়্যারা থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে সফল করেছেন অথচ কিছু সংখ্যক মোমেন এ কর্মসূচীতে সন্তুষ্ট ছিল না, এতদসত্ত্বেও তাদেরকে এ অভিযানে শরীক হতে হয়েছে। ঠিক এভাবে যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিল এবং তোমাদের সাথে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছিল অথচ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অভিমতের সত্যতা তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত বদরের যুদ্ধের জন্যে বের হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।[১]

বদরের যুদ্ধের আরো কিছু বিবরণ

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা মদীনা শরীফে ছিলাম। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি খবর পেয়েছি যে, আবু সুফিয়ান তার কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছে, আমরা কি তার পথ রোধ করার জন্যে বের হবো? এ সম্পর্কে তোমাদের কি অভিমত? হয়তো এ কর্মসূচীর মাধ্যমে তোমরা কিছু অর্থ সম্পদ লাভ করতে পার। তখন আমরা আরজ করলাম, আমাদের এ অভিযানে বের হওয়া উচিত। এরপর আমরা বের হলাম এবং দু' একদিন পথ অতিক্রম করলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬৯

আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় এরশাদ করলেনঃ তোমরা যে কাফেলার মোকাবেলায় বের হয়েছ এ খবর তারা পেয়ে গেছে। এখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমাদের কি অভিমত?

তখন কিছু লোক এ অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, আমরা এত বড় বাহিনীর সঙ্গে কিভাবে লড়বো? আমরাতো বাণিজ্য কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়েছি। এরপর তিনি পুনরায় এ প্রশ্ন করলেন। লোকেরা একই জবাব দিল। তখন হযরত মেকদাদ এবন আমর (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! এ পর্যায়ে আমরা এমন কথা বলবো না যা মূসা (আঃ)-এর উম্মত তাঁকে বলেছিলো যে, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক দুশমনের সঙ্গে লড়াই কর। আমরা এখানে বসে আছি। আমরা আনসারগণ এ আকাঙ্ক্ষা করেছি যে, যদি আমরাও তাই বলতাম যা হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলেছেন তবে তা এ কাফেলার অনেক সম্পদ লাভের চেয়েও অধিকতর পছন্দনীয় হতো। তখন আলোচ্য আয়াত كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ নাযিল হয়।[১]

বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন ভোরে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কাতারবন্দী করেছিলেন। তাঁর নিকট একটি ছোট তীর ছিল। তিনি তা দ্বারা ইঙ্গিত করেছিলেন কাউকে একটু অগ্রসর হওয়ার এবং কাউকে একটু পিছিয়ে যাওয়ার। অবশেষে যখন কাতারবন্দীর কাজ সুসম্পন্ন হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসলামের পতাকা দান করলেন হযরত মাসআব এবনে ওমায়ের (রাঃ)-কে। হযরত মাসআব (রাঃ) নির্দিষ্ট স্থানে পতাকা রাখার জন্যে অগ্রসর হলেন। এরই মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাতারগুলো সঠিক করার কাজ তদারক করলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দিলেন, যখন দুশমন নিকটে আসবে তখন তীর নিক্ষেপ করবে এবং দুশমন যখন আরো নিকটতর হবে তখন তরবারী ব্যবহার করবে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন একটি ভাষণ দিলেন। তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের হামদ বর্ণনা করলেন। এরপর লোকদেরকে যুদ্ধে সুদৃঢ়, অটল-অবিচল থাকার নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহর রাহে জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে অনুপ্রাণিত করলেন।

অন্যদিকে কাফেররাও তৈরী হলো। ইবলিস শয়তান মানব রূপ ধারণ করে তাদের সঙ্গে ছিল। সর্ব প্রথম আমের হাজরমী নামক এক ব্যক্তি মুসলমানদের উপর

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭১

আক্রমণ করলো। তার মোকাবেলায় আসলেন মাহ্জা এবনে আয়েশ। তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর আজাদ করা গোলাম। আমের মাহ্জাকে শহীদ করলো। আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম হারেসা এবনে ছোরাকা শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁকে হাইয়ান এবনে আরকা শহীদ করেছে। এদিকে ওতবা এবনে রবীয়া তার ভাই শায়বা এবং পুত্র অলিদকে নিয়ে রণাঙ্গনে এসেছে। তাদের মোকাবেলায় তিনজন আনসারী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে রাওয়াহা (রাঃ), আওজ (রাঃ) এবং মা'আজ (রাঃ) মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের মোকাবেলায় আসলেন। কিন্তু ওতবা বললো, আমরা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবো না। আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হলে আমাদের মত কোরায়শী সর্দার হতে হবে। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন, ওবায়দা এবনে হারেস দণ্ডায়মান হও। হামজা (রাঃ) দণ্ডায়মান হও, আলী (রাঃ) দণ্ডায়মান হও। হযরত হামজা (রাঃ) শায়বাকে মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করলেন।

হযরত আলী (রাঃ) ওলিদকে কোন সুযোগই দিলেন না। তাকেও ক্ষণিকের মধ্যে হত্যা করলেন। অবশ্য ওবায়দা (রাঃ) এবং ওতবার মধ্যে কিছুক্ষণ তরবারীর লড়াই চললো। উভয়ে আহত হলো। এ অবস্থা দেখে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হামজা (রাঃ) এসে ওতবাকে শেষ করলেন। কোরায়শ তাদের লাশ উঠিয়ে নিয়ে গেল। এবনে এসহাক বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জন্য নিদৃষ্ট স্থানে চলে আসলেন। তখন তৃতীয় কোন ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে ছিল না। এরপর তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে জেহাদে বিজয়ের জন্যে দোয়া করতে থাকেন। দোয়াতে তিনি যে কথাটি বলছিলেন তাহলো, "হে আল্লাহ! যদি মোমেনদের এই দল আজ ধ্বংস হয়ে যায় তবে আর দুনিয়াতে তোমার বন্দেগী হবে না"।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আর আপনি এভাবে ফরিয়াদ করবেন না, আল্লাহ পাক আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবং তেবরানী হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার পবিত্র সত্ত্বা সব কিছুর উর্দ্ধে, আপনাকে পরামর্শ দেয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই। তাই আমি একটি আরজী পেশ করি। আল্লাহ পাককে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা এর চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। হযরত

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এবনে রওয়াহা! আমি আল্লাহ্ পাককে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবো যদিও কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না।

এবনে সা'দ (রাঃ) এবং এবনে জরীর (রঃ) হযরত আলীর (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, বদরের দিনে কিছুক্ষণ লড়াই করার পর আমি দ্রুতবেগে এসেছি যেন দেখতে পারি যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি অবস্থায় আছেন। আমি দেখলাম তিনি সেজদারত অবস্থায় আছেন এবং ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম বলছেন। আমি এরপর পুনরায় রণাঙ্গনে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সেজদারত অবস্থায় দেখলাম। তিনি ঐ শব্দগুলোই বার বার বলছেন। এরপর আল্লাহ্ পাক বিজয় দান করলেন। বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীস সংকলন করেছেন, তাতে আরো একটি কথা রয়েছে যে, “এরপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চেহারা ফেরালেন, তখন এমন মনে হচ্ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক যেন চন্দ্র”।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

কাফেররা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন, আল্লাহ্ পাক সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে ইচ্ছা করেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হক্ব হলো দ্বীন ইসলাম আর বাতিল হলো শেরক। যারা দ্বীন ইসলামের সৈনিক তাদেরকে বিজয় দানের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক হক্ব বা সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর শেরক পন্থীদেরকে পরাজিত করে বাতিলকে বাতিল বলে প্রমাণিত করেছেন। এভাবে বাতিলপন্থীদেরকে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জি কার্যকর হয়েছে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১২৮

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ
رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ
إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ
أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَ
يُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ
الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

তরজমা

(৯) স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য লাভের জন্যে ফরিয়াদ করেছিলে। তখন তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসতে থাকবে।

(১০) আর আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা শুধু এজন্যে করেছেন যেন তা হয় তোমাদের জন্যে সুসংবাদ এবং তোমাদের মন যেন নিশ্চিন্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে সাহায্যতো শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই আসে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

(১১) স্মরণ কর সে সময়কে যখন তিনি তোমাদের সান্ত্বনার জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্যে ও তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্যে এবং তোমাদের সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে, আর তোমাদের পা অবিচলিত রাখার প্রয়োজনে তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন।

তফসীরুল কোরআন

মুসলিম জাতির জীবনে বদরের যুদ্ধ ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। জাতীয় জীবনের ইতিহাসে বাতিল-পন্থীদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, প্রথম জেহাদ। ইতিপূর্বে

এমন ঘটনা আর কোনদিন ঘটেনি, আর প্রথম জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের রণাঙ্গনে উপস্থিতি। একদিকে জনবল এবং অস্ত্রবল বলতে নামমাত্র, অন্যদিকে শক্তি-সামর্থ্য ও সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী উপস্থিত। এছাড়া আরো কথা আছে, কাফেররা পূর্ব থেকেই যুদ্ধের অনুকূল স্থান দখল করে নিয়েছে। পানি তাদের এলাকায় রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, মুসলমানদের অবস্থান ছিল একটু নিচু এলাকায়, সেখানে রয়েছে শুধু বালু, যার উপর চলাফেরা করা অত্যন্ত কঠিন। এক পা এগিয়ে গেলে দু'পা পিছিয়ে আসতে হয়। এর পাশাপাশি ধূলা বালির ঝড়, পানির অভাব, লোকবলের স্বল্পতা, আর অস্ত্রশস্ত্রের দুর্বলতা তো আছেই। এই সঙ্গে রসদের অভাবও কম কষ্টদায়ক ছিল না। এ কারণে মুসলমানদের মন বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক। আর ইবলিস শয়তান এই সুযোগে মুসলমানদের মন আহত করার জন্যে বলতে শুরু করে, তোমরা যদি সত্যিই সত্যের সাধক, সত্য পথের পথিক এবং সত্যের বাহক হয়ে থাক, তোমরা যদি আল্লাহর প্রিয় এবং পছন্দনীয় বন্দা হয়ে থাক, তবে তোমরা আজ এত বিপদের সম্মুখীন কেন?

কিন্তু যা সত্য তা হলো, আল্লাহ পাকের কুদরতের খেলা কেউ বুঝতে পারে না, আল্লাহ পাক যাকে রক্ষা করতে চান কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না। সর্বত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিই কার্যকর হয়। কোন উপকরণ ব্যতীতই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করেন। এ জ্বলন্ত সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায় ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের দিন। আল্লাহ পাক মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র-প্রায় মুসলমানদের অবস্থা মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন করে দেন। আসমান থেকে বারি বর্ষণের মাধ্যমে পরিবেশে অভূতপূর্ব পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

১. বৃষ্টির কারণে বালি বসে যায়,

২. মাটি শক্ত হওয়ায় চলা-ফেরার অসুবিধা দূর হয়,

৩. পানির অভাব দূর হয়,

৪. ধূলা-বালির ঝড়ও বন্ধ হয়,

৫. বৃষ্টির কারণে কাফেরদের এলাকা পিচ্ছিল হয়ে যায়। কাঁদা মাটিতে তাদের চলাফেরা কঠিন হয়ে পড়ে।

৬. এর পাশাপাশি আল্লাহ পাক ক্ষণিকের জন্য মুসলমানদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন। যখন তন্দ্রা শেষ হলো, চোখ খুললো, মনের অবস্থায় পরিবর্তন দেখা দিল। মনের ভয়-ভীতি-দুশ্চিন্তা হটাৎ দূরীভূত হলো, মনোজগতে এলো ইনকিলাব, নবোদ্যম, নতুন উদ্দীপনায় মুসলমানদের হৃদয় উদ্বেলিত হলো। এভাবে আল্লাহ পাক

মুসলিম জাতিকে সাহায্য করলেন। অধিক সংখ্যক কাফেরদেরকে অল্প সংখ্যক মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করতে হলো। সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, মর্জি এবং তাঁর দান। এ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যা বদরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক দিনে বাস্তবায়িত হয়। আর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্যে আসমান থেকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে ফেরেশতাগণ নাযিল হলেন। আলোচ্য আয়াত সমূহে একথাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ

শানে নুযুল

এবনে আবি শায়বা, আহমদ, মুসলিম এবং তিরমিজী (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দেখলেন, কাফেরদের সংখ্যা এক হাজার, আর নিজের সাথীদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন তাদের সংখ্যা ৩১৯ জন। তখন তিনি কেবলামুখী হয়ে হস্তদ্বয় প্রসারিত করে স্বীয় প্রতিপালককে ডাকতে লাগলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! তোমার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমাকে দান কর। হে আল্লাহ! যদি মুসলমানদের এ দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে আর তোমার বন্দেগী করা হবে না'। এভাবে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করছিলেন। এমনকি, তাঁর কাঁধ মোবারক থেকে এক সময় চাদরখানিও পড়ে যায়। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে চাদরটি তাঁর কাঁধ মোবারকে তুলে দেন এবং পেছন থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরেন এবং আরজ করেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এবার মুনাজাত শেষ করুন। আল্লাহ পাককে আপনি অনেক ডেকেছেন, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

অর্থাৎ সেই সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করলেন এবং বললেনঃ আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা একের পর এক আসতে থাকবে।

ইমাম বায়হাকী লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাকিম এবনে হাজাম (রাঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম তাইমীর (রাঃ) সূত্রে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি রয়েছে। এতে এ

কথাও রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তন্দ্রাহত ছিলেন। তাঁর মাথা মোবারকে একটা ধাক্কার মত লাগলো, তিনি যেন জাগ্রত হলেন এবং এরশাদ করলেনঃ হে আবু বকর! (রাঃ) এই হলো জীব্রাঈল, যিনি মাথার উপরে হলুদ বর্ণের আমামা বেঁধে তাঁর অশ্বের লাগাম ধরে আসমান জমিনের মধ্যখানে বর্তমান ছিলেন। এরপর পৃথিবীতে অবতরণ করে আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। এরপর অশ্বারোহী অবস্থায় পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং আমাকে বলেছিলেনঃ আপনি যখন আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন তখনই আল্লাহ পাকের সাহায্য পৌঁছে গেছে।

এবনে এসহাক এবং এবনুল মুনজেরের বর্ণনায় হাদীসের যে ভাষা রয়েছে তার অর্থ হলো, জিব্রাঈল অশ্বারোহী অবস্থায় লাগাম ধরে অগ্রসর হচ্ছেন। আর ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদরের দিন বলেছেন, এই হলো জীব্রাঈল, যিনি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন।

أَنِّى مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

অর্থাৎ- নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসতে থাকবে।

আল্লাহর সাহায্য

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে কাফেরদের মোকাবেলায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার কথা ঘোষণা করেছেন এবং এ আয়াতেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া কবুল হওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

مُرْدِفِيْنَ

এ শব্দটির অর্থ হলো একের পর এক, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন একজন ফেরেশতার পেছনে আরেকজন ফেরেশতা। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো একাধারে, কাতাদা (রঃ) একথাও বলেছেন যে, আল্লাহ পাক যুদ্ধের শুরুতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। এরপর তিনি তিন হাজার এবং এরপর পাঁচ হাজার করে দিয়েছেন। তেবরানী হযরত রোফা এবনে রাফে (রাঃ)-এর সূত্রে এবং এবনে জরীর ও এবনুল মুনজের (রঃ) এবনে মরদবিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর

নবীর এবং মুসলমানদের সাহায্য করেছেন এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডান পার্শ্বে জিব্রাঈল (আঃ) সহ পাঁচশ' ফেরেশতা ছিলেন এবং তাঁর বাম পার্শ্বে মিকাঈল (আঃ) সহ পাঁচশ' ফেরেশতা ছিলেন।[১]

ফেরেশতাগণ কি লড়াই করেছেন?

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের মধ্যে একদল বলেছেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডান পার্শ্বে পাঁচশ' ফেরেশতাসহ ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং হযরত মিকাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাম পার্শ্বে ছিলেন পাঁচশ' ফেরেশতা সহ। আর তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। ফেরেশতাগণ সাদা পোষাকে পুরুষের বেশে জেহাদে শরীক হয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের দিন তাঁরা লড়াই করেছেন, তবে আহযাব এবং হোনায়েনের যুদ্ধে তাঁরা লড়াই করেননি। বদরের যুদ্ধের দিন আবু জেহেল হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ আমরা এক প্রকার শব্দ শুনেছি কিন্তু কোন ব্যক্তিকে দেখিনি, এ শব্দ কোথা থেকে এসেছে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ এ শব্দ শ্রুত হয়েছে ফেরেশতাদের তরফ থেকে। তখন আবু জেহেল বলেছিল, তাহলে ফেরেশতারা আমাদেরকে পরাজিত করেছে, তোমরা নও।

বর্ণিত আছে, একজন মুসলমান একজন কাফেরের উপর আঘাত হানার জন্য তাকে ধাওয়া করছিলেন। এরই মধ্যে তিনি বেত্রাঘাতের শব্দ শ্রবণ করলেন। তিনি ঐ মুশরেককে দেখলেন সে ধরাশায়ী হয়েছে। বেত্রাঘাতের কারণে তার চেহারা ফেটে গেছে। ঐ ব্যক্তি ছিলেন একজন আনসারী সাহাবী। তিনি যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনা বর্ণনা করলেন তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি ঠিক বলেছ, এ ছিল তোমাদের প্রতি আসমানী সাহায্য। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন ফেরেশতাগণ উপস্থিত ছিলেন তবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। হাজার হাজার ফেরেশতা অবতরণের যে কথা রয়েছে তা মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, কেননা একজন ফেরেশতা সারা পৃথিবী ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬

হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে একাই ধ্বংস করেছিলেন। ঠিক এমনিভাবে সামুদ জাতি এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য একাধিক ফেরেশতার প্রয়োজন হয়নি।[১]

এবনে আবি হাতেম শা'বীর সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানতে পেরেছেন যে, কোরজ মহারবী (বদরের যুদ্ধের দিন) মুশরেকদেরকে সাহায্য করতে চায়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যথিত হলেন। এ সময় আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেনঃ

اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ

"তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট হবে না যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন"? এরই মধ্যে কোরজ মহারবী পৌত্তলিকদের পরাজয়ের খবর পেল। তাই সে ফিরে গেল। কোরায়শদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

আবু ইয়ালা এবং হাকেম বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন আমি কূপের নিকট ছিলাম, সেখানে এত দ্রুত বাতাস প্রবাহিত হলো, যা ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখিনি। এরপর আবার বাতাস আসলো। এরপর পুনরায় বাতাস আসলো। প্রথম বাতাস জীব্রাঈল (আঃ)-এর আগমনের কারণে ছিল, যিনি এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে এসেছিলেন। আর দ্বিতীয় বার যে বাতাস আসছিল তা মিকাঈল (আঃ)-এর আগমনের কারণে ছিল। তিনিও এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে অবতরণ করেছিলেন।

আর তৃতীয়বার যে বাতাস এসেছিল তা হযরত ইসরাফিল (আঃ)-এর আগমনের কারণে ছিল। যিনি এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাঁ দিকে এসে অবতরণ করেছিলেন।[২]

বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতরণ

ইমাম আহমদ বাজ্জার এবং হাকেম (রঃ) বিশুদ্ধ সূত্রের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন হযরত রসূলুল্লাহ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৩০
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার এবং আবু বকর (রাঃ)-এর মধ্যে একজনের সঙ্গে বলেছেনঃ তোমাদের সঙ্গে জিব্রাঈল (আঃ) আছেন। অন্য জনের সঙ্গে বলেছেনঃ তোমাদের সঙ্গে মিকাঈল (আঃ) আছেন। আর ঈসরাফিল (আঃ) একজন মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতা। তিনি রণাঙ্গণে থাকেন তবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করেন না। আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেনঃ আমরা বদরের যুদ্ধের দিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায আদায় করছিলাম। নামায রত অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। আমরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি এরশাদ করলেনঃ এই মাত্র জিব্রাঈল (আঃ) আমার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি দুশমনকে পশ্চাদ্ধাবন করে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে মুচকি হাসলেন, আমিও তাঁর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলাম।

এবনে সাদ এবং আবুশ শেখ হযরত আতীয়্যা এবনে কায়েসের সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধ থেকে অবসর পেলেন তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি লাল বর্ণের অশ্বে আরোহণ করে যুদ্ধাস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ পাক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন যেন আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার নিকট থাকি। আপনি এখন সন্তুষ্ট হয়েছেন? তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি এখন সন্তুষ্ট। এরপর জিব্রাঈল (আঃ) চলে গেলেন। বদরের যুদ্ধে কোন কোন ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করেও অংশ গ্রহণ করেছেন। ইব্রাহীম হারেসী বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান এবনে হারেস বলেছেনঃ আমরা বদরের যুদ্ধের দিন সাদা কালো বর্ণের অশ্বের উপর আরোহী অবস্থায় আসমান জমিনের মধ্যখানে কিছু লোক দেখেছি যাদের বর্ণ ছিল গৌড়।

মোহাম্মদ এবনে আমর আসলামী এবং এবনে আসাকের বর্ণনা করেন, হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) বলেছেন, আমি বদরের যুদ্ধে দু' ব্যক্তিকে দেখেছি, একজন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডানে ছিলেন, অন্যজন বামে। এরপর তাঁর পেছনে তৃতীয় ব্যক্তি আসলেন। এরপর তাঁর সম্মুখে চতুর্থ ব্যক্তি আসলেন।

মোহাম্মদ এবনে আমর আসলামী বর্ণনা করেন, ইব্রাহীম গাফফারী বলেছেনঃ আমি এবং আমার চাচার পুত্র বদরের রণাঙ্গণে পানির কূপের কাছে ছিলাম। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথীদের সংখ্যা স্বল্পতা এবং কোরায়শদের অনেক সংখ্যক লোক দেখে আমরা বললাম এ দু'দলের মধ্যে লড়াই হবে। আমরা হযরত

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীদেরকে টার্গেট করবো (অর্থাৎ আমরা সরাসরি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীদের উপর আক্রমণ করবো)। আমি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথীদের বাম দিকে লক্ষ্য করলাম যে, কোরায়েশদের চার ভাগের এক ভাগ লোক হবে। আমরা বাম দিকে ঘোরাফেরা করছিলাম। এমন সময় লক্ষ্য করলাম একটা মেঘমালা দেখা যাচ্ছে এবং সে মেঘমালা থেকে কিছু মানুষ এবং অস্ত্রশস্ত্রের শব্দ শ্রুত হচ্ছে। এক ব্যক্তি তার অশ্বকে বলছিলঃ "হাইজুম, এগিয়ে চল"। এ ব্যক্তিটি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডান দিকে এসে অবতরণ করলো। এভাবে আরেক দল লোক উপর থেকে আসলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথী হলো। এখন সাহাবাদের সংখ্যা কোরায়শদের দ্বিগুণ হয়ে গেল। আমার চাচার পুত্র মারা গেল, আমি রয়ে গেলাম এবং মুসলমান হলাম। আর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলাম।

এবনে এসহাক, এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে একজন গাফফারী ব্যক্তির এবং বায়হাকী সায়েব এবনে হারসীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গাফফারী এবং সায়েব বলছিলেন, আল্লাহর শপথ! আমাকে কেউ বন্দী করেনি। ঘটনা এই, যখন কোরায়শ পরাজিত হল এবং পলায়ন করলো, তখন আমিও তাদের সঙ্গে পলায়ন করলাম। আমাকে একজন দীর্ঘকায় গৌরবর্ণের ব্যক্তি পাকড়াও করলো, এ ব্যক্তি অশ্বারোহী ছিল, আসমান জমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল, সে আমাকে বেধে দিয়েছিলো। এমন সময় আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) সেখানে আসলেন এবং আমাকে বাধা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এ ব্যক্তিকে বেধে রেখেছে? কিন্তু কেউ আমাকে গ্রেফতার করার দাবী করেনি। অবশেষে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আমাকে পেশ করা হল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমাকে কে বেধে রেখেছিলো? আমি আসল কথা বলতে চাইনি। সেজন্যে বললাম, আমি জানি না। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমাকে একজন ফেরেশতা গ্রেফতার করেছে।

ইমাম আহমদ, এবনে সাঈদ এবং এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এবং বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল ইয়াসার (রাঃ) আব্বাস (রাঃ)-কে গ্রেফতার করেছেন। আবুল ইয়াসার হালকা দেহ বিশিষ্ট বেঁটে মানুষ ছিলেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন সুদীর্ঘ দেহের অধিকারী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবুল ইয়াসার (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি তাঁকে কিভাবে গ্রেফতার করলে? আবুল ইয়াসার (রাঃ)

বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তাঁকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে অন্য একজন লোক আমাকে সাহায্য করেছেন যার আকৃতি এমন ছিল যে, তা আমি ইতিপূর্বে কোনদিন দেখিনি, পরেও দেখিনি। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমাকে সাহায্য করেছিলেন একজন বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতা। এবনে এসহাক এবং এসহাক এবনে রাহবিয়া বর্ণনা করেন, হযরত আবু উসাইদ সাইদী (রাঃ) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলেন, যদি আমি এখন বদরে থাকতাম এবং আমার নয়ন যুগল বহাল থাকতো তবে আমি সেই ঘাঁটিটি তোমাদের দেখিয়ে দিতাম যেখান থেকে ফেরেশতাগণ বের হয়ে এসেছিলেন। তাদের আগমনের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ বদরের যুদ্ধের দিনে ফেরেশতাদের বিশেষ নিদর্শন ছিল তাদের সাদা "আমামা" যা তারা পেছনে কিছু অংশ ছেড়ে রেখেছিলেন আর খায়বরের দিন ফেরেশতাদের বিশেষ নিদর্শন ছিল লাল আমামা।

এবনে এসহাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তবে তাতে বাড়তি এতটুকু ছিল যে, জীব্রাইল (আঃ)-এর পাগড়ী ছিল হলুদ বর্ণের।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ

অর্থাৎ-ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য করার কারণ হল, আল্লাহ পাক মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। মুসলমানদেরকে পূর্বাহ্নেই এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর মুসলমানদের সংখ্যা অল্প ও অস্ত্র-শস্ত্র কম হবার কারণে তাঁদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যদিও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তবুও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে ব্যাকুলতা ছিল। এজন্যে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে সারা রাত দোয়া করতে থাকেন, তাঁর অবস্থা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আরজ করেছিলেন-

رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى

হে পরওয়ারদেগার! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করতে তা আমাকে দেখিয়ে দাও। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি একথা বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন,

অবশ্যই বিশ্বাস করি তবে আমার মনকে আমি সান্ত্বনা দিতে চাই। ঠিক এ অবস্থাই ছিল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। তাই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে বদরের যুদ্ধের সাফল্যের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে দোয়া করেছিলেন। তাঁর ব্যাকুলতার কারণ এই, তিনি ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং কুফর ও শেরককে উৎখাত করতে ছিলেন অত্যন্ত উদগ্রীব।

আর তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন যে, আল্লাহ পাকের কারো এবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। কেউ তাঁর এবাদত করুক বা না করুক তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না।

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط

(আর সাহায্যতো শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই আসে) নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব বিজ্ঞানময়। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করেন, কেননা তিনি পরাক্রমশালী। তবে কাকে কখন কিভাবে সাহায্য করবেন তা তিনিই সিদ্ধান্ত করেন কেননা, তিনি অতীব বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তই হয় হেকমতপূর্ণ।

বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া শেষ করার পর স্বয়ং যুদ্ধে শরীক হন এবং দুশমনের সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করেন। তাঁর সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁরা কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকেন। এরপর লোকদেরকে জেহাদে উৎসাহিত করেন, এরপর তাঁরা নিজেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এবনে সাদ ফরিয়াবী বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ বদরের দিন যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে চলে আসেন। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আড়ালে থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করি। সেদিন তিনি সবচেয়ে বেশী যুদ্ধরত ছিলেন। আমাদের কেউ মুশরেকদের এত নিকটে ছিলাম না যতটা নিকটে ছিলেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

ইমাম আহমদ (রঃ)-এর বর্ণনায় আরো রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, বদরের যুদ্ধের দৃশ্য এখনও আমার সম্মুখে। আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করেছিলাম।

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ

অর্থাৎ- যখন আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তন্দ্রাহত করেন এবং তন্দ্রা শেষ হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেনঃ সু-সংবাদ, জীব্রাঈল (আঃ) আমাদের সাহায্যার্থে স্বয়ং আসছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, যুদ্ধের সময় তন্দ্রাহত হওয়া আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে দান স্বরূপ হয়, যেন যোদ্ধার মনে শান্তি এবং সান্ত্বনা থাকে। আর নামাযে যে তন্দ্রা আসে তা হয় শয়তানের তরফ থেকে।

আবদ এবনে হোমায়েদ হযরত কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তন্দ্রা হলো আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ শান্তি। মুসলমানদের জীবনে যুদ্ধরত অবস্থায় তন্দ্রাহত হওয়ার ঘটনা দু'বার ঘটেছে। একবার বদরের যুদ্ধে আরেকবার ওহোদের যুদ্ধে।[১]

মূলত এটি ছিল আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ দান যে, তন্দ্রার কারণে দুশমনের অধিক সংখ্যক হওয়া এবং তাদের সংখ্যা কম হওয়ার যে উপলব্ধি তা আল্লাহ্ পাক দূর করে দিয়েছেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত মেকদাদ (রাঃ) ব্যতীত কারো নিকট কোন সওয়ারী ছিল না। আমরা যুদ্ধের (পূর্ব রাত্রে) নিদ্রিত হয়েছিলাম কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত একটি বৃক্ষের নীচে নামায আদায় করেছিলেন এবং সাফল্যের জন্যে দোয়া করেছিলেন।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ

আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন যেন তোমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পার এবং শয়তানের প্ররোচনা দূর করা যায়। কেননা কাফেররা পানি নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। মুসলমানদের অজু গোসলের অসুবিধা হচ্ছিল। শয়তান এসে এই প্ররোচনা দিতে লাগলো যে, যদি তোমরা আল্লাহর প্রিয় এবং পছন্দনীয় হতে তবে কি তোমাদের পানির এত কষ্ট হতো? তোমরা অজুর বদলে তৈয়ম্মুম করে নামায আদায় করছো, পবিত্রতা অর্জন করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি নাযিল করেন। ফলে পানির কষ্ট দূর হলো। দ্বিতীয়তঃ বালুর উপর চলাফেরা করা কষ্টকর ছিল, বৃষ্টিপাতের কারণে বালু জমে গেল। ফলে চলা ফেরার কষ্ট দূর হলো। তৃতীয়তঃ শয়তানের প্ররোচনাও দূর হলো। এরই মধ্যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হাজার হাজার ফেরেশতা অবতরণ করলেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯-৫২

وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ

যেন তোমাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ পাকের দয়া মায়ার উপর আস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

অর্থাৎ বৃষ্টির কারণে বালু জমে গেল, ফলে চলাফেরার যে কষ্ট ইতিপূর্বে ছিল তা দূর হলো। অথবা এর অর্থ হলো তোমাদের মনোবল বৃদ্ধি পেল, রণাঙ্গনে দুশমনের মোকাবেলায় অটল অবিচল থাকার সুযোগ হলো। এসবই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর পাকের দান।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا
الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا
تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ
أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ
جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

তরজমা

(১২) এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দান করেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। অতএব, তোমরা মোমেনদেরকে অবিচলিত রাখ, আর যারা কাফের আমি তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিচ্ছি। অতএব, তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং তাদের প্রতিটি অঙ্গ-সন্ধী কেটে দাও।

(১৩) তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, যে কেউ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে বিরোধিতা করে আল্লাহ পাক তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকেন।

(১৪) অতএব, তোমরা তা ভোগ কর, আর নিশ্চয় কাফেরদের জন্যে দোযখের আযাব অবধারিত রয়েছে।

(১৫) হে মোমেনগণ! তোমরা যখন রণক্ষেত্রে কাফেরদের সম্মুখীন হও তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করোনা।

(১৬) আর যে কেউ সেদিন রণকৌশল অথবা স্ব-সৈন্যে মিলনের উদ্দেশ্য ব্যতীত তাদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে তবে সে আল্লাহ্‌র গযব নিয়ে ফিরে, তার ঠিকানা হলো দোযখ, আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা!

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেও বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। তোমরা মোমেনদের মনোবল অটুট রাখ এবং আল্লাহর দুশমনের প্রতি আঘাত কর। মোমেনদের সাথে মিলে জেহাদে শরীক হও। এর দ্বারা বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি এবং দুশমনের মনে আমি ভয় সৃষ্টি করে দেব। আর তোমরা মোমেনদের মনোবল সৃষ্টির ব্যাপারে সাহায্য কর। যেভাবে ইবলিস মানুষের মনে ওয়াস ওয়াসা বা প্ররোচনা দিতে পারে, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, এলহামের মাধ্যেমে তারা মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করতে পারেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইবলিস শয়তান কেনানা গোত্রের সর্দার ছোরাকা এবনে মালেক মাদলাজী নামক এক ব্যক্তির রূপ ধারণ করে তার দলবল সহ কাফেরদের সাহায্য করার নিমিত্তে বদরের রণাঙ্গণে হাযির হয়েছিলো। সে আবু জেহেলের নিকট গমন করে তাকে বিজয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে উত্তেজিত করেছিল। ছোরাকা রূপ ধারণকারী ইবলিস আবু জেহেলকে বলেছিলঃ আমি ও আমার সম্প্রদায় তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছি। কাফেররা ইবলিসের দলবল দেখে উৎসাহিত হয়েছিলো। তার পাশাপাশি আল্লাহ পাক মোমেনদের সাহায্যার্থে ফেরেশতা পাঠিয়ে মোমেনদের মনোবল অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাফেরদের ঘাড়ে আঘাত

করার হুকুম দিয়েছিলেন এবং তাদের হাতের আঙ্গুল গুলোর উপর আঘাত করে হানাদারের হাতগুলো অকার্যকর করে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।

পবিত্র কোরআনে এ হেদায়েত কত হেকমতপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। একটি আদেশ হলো–

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ

অর্থাৎ- তাদের ঘাড়ে আঘাত কর, যেন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর একটি আদেশ হলা–

وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

অর্থাৎ তাদের আঙ্গুল গুলো কেটে দাও তথা তাদের হাতকে বেকার করে দাও। এ নির্দেশ অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ। যখন তরবারি দ্বারা যুদ্ধ হতো, সে যুগের ন্যায় বর্তমান যুগে যখন ট্যাংক, বোমারু বিমান এবং মিসাইল দ্বারা যুদ্ধ হয়, এ যুগেও তা সমভাবে তাৎপর্যবহ।[১]

اَنِّىْ مَعَكُمْ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি মুসলমানদের সাহায্য করার ব্যাপারে তোমাদের সাথেই রয়েছি, অতএব তোমরা তাদের মনোবল বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ কর, যেন তারা জেহাদে অটল অবিচল থাকে। আর কাফেরদের অন্তরে আমি মুসলমানদের ভয় ঢেলে দেব অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যাও দ্বিগুণ, চর্তুগুণ দেখিয়ে কাফেরদের অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করবো। এটিই হবে আমার পক্ষ থেকে সাহায্য।

আবু নাঈম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আবু ইয়াসার (রাঃ) আপনাকে কিভাবে গ্রেফতার করলেন? আপনি ইচ্ছা করলে তাকে আপনার মুঠোর ভেতর নিয়ে নিতে পারতেন। তখন তিনি বললেনঃ আমার প্রিয়পুত্র! এমন কথা বলোনা, কেননা তখন তাকে পাহাড়ের মত মনে হচ্ছিল। বস্তুতঃ এভাবে আল্লাহ পাক কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের ভয় সৃষ্টি করেছিলেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২২
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৭৭
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৬

فَثَبِّتُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا ط

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত এ দায়িত্ব ফেরেশতাগণ তিনটি পন্থায় পালন করেছেন-

১. মুসলমানদের দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে,

২. মুসলমানের দল বড় করে,

৩. মুসলমানদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ মানুষের আকৃতি ধারণ করে কাতারবন্দী হয়ে মুসলমানদের আগে থাকতেন এবং বলতেন, তোমাদের জন্যে সুসংবাদ, আল্লাহ পাক অবশ্যই তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন, এভাবে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন। ফেরেশতাগণ শুধু যে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যে এবং মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়ে কাফেরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্যে এসেছিলেন তাই নয়, বরং তারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ

অর্থাৎ- কাফেরদের ঘাড়ে আঘাত কর। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এবনে আম্বারী বলেছেনঃ ফেরেশতাগণ জানতেন না যে, মানুষকে কিভাবে হত্যা করতে হয়। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاضْرِبُوْا

"তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত কর"।

وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

"এবং তাদের আঙ্গুল সমূহ কেটে দাও"।

বায়হাকী হযরত রবী এবনে আনাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কাফেরদের ঘাড় এবং আঙ্গুল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হওয়ার চিহ্ন দেখলে লোকেরা বুঝতে পারতো কে তাদেরকে হত্যা করেছে।

হযরত সাহাল এবনে হানিফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, বদরের দিন আমাদের কেউ তরবারি দ্বারা কোন কাফেরের দিকে ইশারা করতো, তরবারি পৌঁছার পূর্বেই লোকটিকে ধরাশায়ী অবস্থায় দেখতো।

এবনে সাদ হোয়াইতব এবনে আব্দুল ওজ্জার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধের সময় আমি মুশরেকদের সঙ্গে ছিলাম। আমি একটি দলকে দেখেছি যারা আসমান জমিনের মাঝখানে ছিল, যারা হত্যাও করেছিল এবং বন্দীও করেছিল।

মোহাম্মদ এবনে ওমর আসলামী এবং বায়হাকী লিখেছেন, আবু বোরদা এবনে দিনার (রাঃ) বলেছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তিনটি মাথা নিয়ে হাযির হলাম এবং আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি এর দু'টিকে হত্যা করেছি, আমি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি গৌর বর্ণের দীর্ঘকায় ছিলেন, এই তৃতীয় ব্যক্তিকে তিনিই হত্যা করেছেন। আমি জানি না এ ব্যক্তি কে ছিলেন। আমি তৃতীয় মাথাটিও নিয়ে এসেছি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এ ব্যক্তিকে অমুক ফেরেশতা হত্যা করেছেন।

এবনে সাদ একরামার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন দেখা যেতো কারো কারো মাথা উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যেত না যে, কে হত্যা করেছে। কারো কারো হাত কেটে পড়ে যেত কিন্তু দেখা যেতো না কে হাত কেটে দিল।

এবনে এসহাক, বায়হাকী হযরত আবু ওয়াকেদের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আমি এক মুশরেককে ধাওয়া করছিলাম কিন্তু আমার তরবারি পৌঁছার পূর্বেই তার মাথা কেটে পড়ে গেল। আমি বুঝলাম যে, অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে।

বায়হাকী হযরত খারেজা এবনে ইব্রাহীমের সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বদরের দিন কোন্ ফেরেশতা "এগিয়ে চল হাইজুম" বলেছিলেন? জিব্রাইল (আঃ) জবাবে বললেন, আমি আসমানের সকল অধিবাসীকে চিনি না। এবনে এসহাকের বর্ণনা হলো, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আজাদ করা গোলাম হযরত আবু রাফে বলেছেনঃ আমি আব্বাস এবনে আবদুল মোত্তালিবের গোলাম ছিলাম। ইসলাম আমাদের পরিবারে প্রবেশ করেছিল। উম্মুল ফজল মুসলমান হয়েছিলেন, আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আব্বাস স্বজাতিকে ভয় করেছিলেন, কেননা তিনি সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর অনেক টাকা-পয়সা মানুষ ঋণ হিসেবে নিয়েছিল, এজন্যে তিনি স্বীয় ঈমান গোপন করে রেখেছিলেন।

আল্লাহর দুশমন আবু লাহাব বদরের যুদ্ধে শরীক হয় নাই। তার স্থলে সে আস এবনে হিমাশকে পাঠিয়েছিল। যখন সে বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের কথা শুনলো তখন আল্লাহ পাক তাকে অপমানিত করলেন এবং আমরা নিজেদের মধ্যে শক্তি এবং সম্মান

অর্জন করলাম। আমি একজন দুর্বল মানুষ ছিলাম, তীর তৈরী করা আমার কাজ ছিল। একদিন আমি তীর তৈরী করছিলাম, আমি যে কক্ষে ছিলাম ঠিক তার সম্মুখেই আবু লাহাব এসে বসেছিল, একটু পরেই সেখানে আসলো আবু সুফিয়ান। তখন আবু লাহাব জিজ্ঞাসা করলো, হে ভ্রাতঃষ্পুত্র! কি হয়েছিল? আবু সুফিয়ান বললো কিছুই নয় আল্লাহর শপথ! মোকাবেলা হয়েছে, আমরা আমাদের বক্ষ এগিয়ে দিয়েছি, ইচ্ছা করলে তারা হত্যা করতে পারে অথবা বন্দী করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! মানুষ মনঃক্ষুন্ন হয়নি, আমাদের মোকাবেলা হয়েছে এমন লোকদের সঙ্গে যাদের বর্ণ ছিল গৌর, যারা সাদা কালো বর্ণের অশ্বে আরোহী ছিল এবং আসমান জমিনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। আল্লাহর শপথ! তাদের সম্পর্কে কোন ধারণা করা যায় না এবং তাদের সামনে কোন জিনিস টিকতেও পারে না। হযরত আবু রাফে (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এসব কথা শ্রবণ করে বললাম তারা ছিলেন ফেরেশতা, আবু লাহাব তখন আমার মুখের ওপর সজোরে চাপড় মারলো, আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সে আমাকে মাটির উপর নিক্ষেপ করলো। এরপর আমাকে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগলো, আমি দুর্বল মানুষ ছিলাম। উম্মুল ফজল এ অবস্থা দেখে একটি ঘরোয়া জিনিস দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো। ফলে তার মাথা ফেটে গেল। উম্মুল ফজল বললেন, আজকে এখানে তার মনিব নেই বলে তুমি তাকে দুর্বল মনে করেছ। এরপর আবু লাহাব সেখান থেকে অপমানিত হয়ে চলে গেল। মাত্র সাতটি রাত অতিবাহিত হওয়ার পরই সে "আদসা" রোগে আক্রান্ত হলো, এভাবে তার জীবনের অবসান ঘটলো।

এবনে জরীর লিখেছেনঃ আদসা হলো এক প্রকার ফোঁড়া, এটি একটি সংক্রামক ব্যাধি, এ রোগ যার হয় তার কাছে যে যায় সেও এ রোগে আক্রান্ত হয়। মানব দেহে ঐ ফোঁড়ার কারণে পঁচে দুর্গন্ধ হয়। কোন লোক কাছে আসে না, আসতে পারে না। এজন্যে আবু লাহাবের লাশ তিন দিন পড়েছিল, কেউ তার কাছে যায়নি এবং তাকে দাফন করার ইচ্ছাও যেন কারো ছিল না। অবশেষে বদনাম হওয়ার আশঙ্কায় তার পরিবারের লোকেরা একটি গর্ত করে লাঠির সাহায্যে তাকে ঐ গর্তে নিক্ষেপ করে এবং দূর থেকে পাথর মেরে লাশটিকে মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন করে।[১]

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪-৫৬

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে ঘোষিত শাস্তির কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ কাফেরদের ব্যাপারে যে শাস্তির কথা পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে তার কারণ হলো, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাই এটিই তাদের শাস্তি। কেননা, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তাদের কঠোর কঠিন শাস্তি অবধারিত।

فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাকের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে দুনিয়ার শাস্তির পর আখেরাতে কাফেরদের যে শাস্তি হবে সে সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ

অর্থাৎ- হে মুশরেকরা! হত্যা এবং বন্দী হওয়ার শাস্তি আপাতত দুনিয়াতে ভোগ কর। আর নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ আখেরাতে কাফেরদের জন্যে দোযখের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। দুনিয়ার শাস্তির কারণে আখেরাতের শাস্তি বাতিল হবে না। কেননা, কাফেরদের আসল শাস্তিতো আখেরাতেই হবে। দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির একটি নমুনা মাত্র।

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক কাফেরদের নাফরমানী এবং শত্রুতার বিবরণ দিয়ে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের তরফ থেকে সাহায্য প্রার্থনার উল্লেখ করেছেন। এরপর মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক কিভাবে সাহায্য করেছেন তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। একদিকে দাম্ভিক কাফেরদের দল যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, অন্যদিকে বিনয়ের প্রতীক মোমেনগণ মহান আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত হয়ে তাঁর সাহায্যের জন্যে ফরিয়াদ করছেন। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া কবুল করে দাম্ভিক কাফেরদের মোকাবেলায় মোমেনগণকে বিজয় দান করেছেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং দম্ভ ও অহংকারের প্রতীক কাফেরদেরকে পরাজিত ও অপমানিত করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করলেন, বদরের জেহাদে যারা শরীক হয়েছেন তাদের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তারা মুসলমানদের মধ্যে উত্তম।

জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ যে ফেরেশতাগণ বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছেন আমরা তাদেরকে ফেরেশতাদের মধ্যে উত্তম মনে করি।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কাফেরদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে শাস্তি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে তাতো আছেই কিন্তু তাদের আসল শাস্তি হবে আখেরাত। পক্ষান্তরে মোমেনদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

"তোমাদের উপর দুনিয়াতে যে বিপদাপদ আসে তা তোমাদের কৃতকর্মের পরিণামই"।

হযরত আলী (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে আলী! আমি তোমাকে এ আয়াতের তফসীর বলছি। এ আয়াতের অর্থ হলো যে রোগ-তাপ বা কোন কষ্ট দুনিয়াতে তোমরা ভোগ কর তা তোমাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই হয়। আল্লাহ পাক আখেরাতে এর শাস্তি দেবেন না। (তিরমিজী)

হাকেম একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কাফেলার পিছু ধাওয়া করা আপনার জন্যে জরুরী। হযরত আব্বাস (রাঃ) তখন বন্দী হিসেবে ছিলেন। তিনি ডাক দিয়ে বললেন, একথা ঠিক নয়, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ কেন? তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দু'দলের মধ্য থেকে আপনাকে এক দলের উপর

১। খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫০

বিজয় দান করেন। আর তা তিনি করেছেন এবংআপনার বিজয় অর্জিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলের ওপর বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি আপনাকে দেয়া হয়নি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি ঠিক বলেছ।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ফেরেশতাদেরকে এ আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন মোমেনদের মনোবল অটুট রাখে এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে সহযোগিতা করে। আর মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, জেহাদে অবিচল থাক, পিছপা হয়োনা, দুশমনদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করোনা। জেহাদ থেকে পলায়ন হারাম, শুধু দু'টি পন্থায় জেহাদ থেকে পিছপা হওয়ার অনুমতি রয়েছে–

১. যখন দুশমনদের প্রতারণা করার লক্ষ্যে রণাঙ্গন থেকে সরে যাওয়া হয়, পরে পেছন থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবোদ্যমে দুশমনের প্রতি আঘাত হানা হয়।

২. জেহাদ থেকে পলায়ন উদ্দেশ্য না হয়, বরং নিজেদের কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং আপনজনদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যদি রণাঙ্গন থেকে সরে আসতে হয় তবে এর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু জেহাদ থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে যদি কেউ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে তবে তা অত্যন্ত বড় গুনাহ্।

এরশাদ হয়েছেঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ

ইসলামের জঙ্গী আইন

আলোচ্য আয়াতে ইসলামের জঙ্গী আইন ঘোষণা করা হয়েছে। রণাঙ্গন থেকে কোন মুজাহেদের পলায়ন বা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন হারাম। তাই আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা যখন রণাঙ্গনে কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করোনা তথা জেহাদ থেকে পলায়ন করো না।

অতএব, ইসলামের জঙ্গী আইন হলো, মুসলমান যখন কাফেরদের মোকাবেলা করবে তখন জেহাদ থেকে পিছপা হওয়া হারাম বা অবৈধ। তবে দু'টি পন্থায় এর অনুমতি রয়েছেঃ

اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ

অর্থাৎ যদি রণকৌশল হিসেবে কেউ পলায়ন করে তথা প্রকৃত অবস্থায় পলায়ন নয়, বরং যুদ্ধের একটি কৌশল হিসেবে রণাঙ্গন থেকে সরে এসে দুশমনকে গাফলতের অবস্থায় রাখা এবং পুনরায় হামলা করার উদ্দেশ্যে পিছপা হওয়া অবৈধ নয়।

اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ

অর্থাৎ নিজেদের দলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নবোদ্যমে হামলা করার উদ্দেশ্যে রণাঙ্গন থেকে পলায়ন অবৈধ নয়।

কিন্তু এ দু'টি পন্থা ব্যতীত যদি কেউ রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করে–

فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

তবে সে আল্লাহর গজব নিয়ে ফেরে, তার ঠিকানা হলো দোযখ, আর তা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা। এ আয়াত সমূহ বদরের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়। তখন এ বিধানই কার্যকর হয় যে, দুশমনের সংখ্যা যতই হোক মুসলমানের জন্যে রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করা বৈধ নয়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন, আর কাফেরদের সংখ্যা ছিল ১,০০০ অর্থাৎ কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের ৩ গুণের চেয়েও বেশী। পরবর্তীতে এ বিধানে কিছুটা তরমীম করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ

এখন আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য জেহাদের বিধান সহজ করে দিলেন, তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে যদি তোমাদের একশ' জন অবিচল থাকে তবে কাফেরদের দু'শ জনের উপর তারা প্রাধান্য বিস্তার করবে। এ আয়াতের তাৎপর্য হলো- মুসলমানদের মোকাবেলায় কাফেরদের সংখ্যা যদি দ্বিগুণ হয় তবে বিজয়ের আশা করা যায়। এমন অবস্থায় রণাঙ্গন থেকে পলায়ন বৈধ নয়। তবে যদি দুশমনের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশী হয় তবে রণাঙ্গন ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবেলা থেকে পলায়ন করে তাকে পলায়নকারী বলা যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি দু'জনের মোকাবেলা থেকে পলায়ন করে তাকে পলায়নকারী বলা যায় এবং এ পলায়ন কবীরা গুনাহ। এ আদেশ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আমাদের চার ইমামের মতে এটি শরীয়তের বিধান, যে পর্যন্ত দুশমনের সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে

অধিক না হয় সে পর্যন্ত রণাঙ্গন থেকে পলায়ন হারাম এবং কবীরা গুনাহ। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীস যা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাতটি কাজকে মানুষের জন্যে ধ্বংসাত্মক বলেছেন, তন্মধ্যে রণাঙ্গন থেকে পলায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তিরমিজী এবং আবু দাউদ শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সেখানে আমাদের দল পরাজিত হয়। আমরা কোনভাবে আত্মরক্ষা করে মদীনা শরীফে এসে আত্মগোপন করি। পরস্পরের মধ্যে আমরা এ আলোচনা করি যে, এ পলায়নের কারণে আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। কেননা, আমাদের দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশের বরখেলাফ কাজ হয়েছে। অবশেষে আমরা তাঁর দরবারে হাযির হয়ে আরজ করি, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা পলাতক। তিনি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার স্থলে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করলেনঃ

بل انتم العكارون وانا فئتكم

অর্থাৎ- তোমরা পলায়নকারী নও; বরং যুদ্ধের দ্রব্য-সম্ভার অর্জন করে দ্বিতীয়বার হামলাকারী। আর আমি তোমাদের জন্যে সাহায্যকারী।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর একথা দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তাদের যুদ্ধ থেকে পলায়ন এবং মদীনা শরীফে আত্মগোপন সে দু'টি পন্থার এক পন্থা, যা গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয় অত্যন্ত বেশী ছিল, যে কারণে তিনি রণক্ষেত্র থেকে পিছপা হওয়ার কারণে অত্যন্ত বেশী ভীত হয়েছেন এবং নিজেকে অপরাধী হিসেবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করেছেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৫৩-৫৪
খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫০-৫১

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ
وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ
مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ
مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ
وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ
عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾

তরজমা

(১৭) বস্তুতঃ তোমরা তাদেরকে হত্যা কর নাই, বরং আল্লাহ পাকই তাদেরকে হত্যা করেছেন। (হে রসূল!) আপনি যখন মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ পাকই নিক্ষেপ করেছিলেন। আর তা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মোমেনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(১৮) এ-তো হয়ে গেল, অধিকন্তু একথা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেবেন।

(১৯) যদি তোমরা মীমাংসা চাও তবে তা তোমাদের নিকট এসে গেছে, আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্যে ভাল। আর যদি তোমরা পুনরায় তাই কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব। (মনে রেখো) তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক ঈমানদারদের সঙ্গে রয়েছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে গায়বী সাহায্য এসেছিল তার কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আরেকটি গায়বী সাহায্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শানে নুযুল

বদরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কিছু লোক বলতে লাগলো যে, আমি অমুক কাফেরকে হত্যা করেছি, অন্য আরেকজন বললো, আমিও অমুককে হত্যা করেছি। তখন এ আয়াত নাযিল হলো।[১]

এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অর্জিত ঐতিহাসিক বিজয় শুধু আল্লাহ পাকের দয়া এবং মেহেরবানীতেই হয়েছে। যদিও প্রকাশ্য দৃষ্টিতে তোমরাই যুদ্ধ করেছ কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় আল্লাহ পাকের গায়বী শক্তিই কার্যকর হয়েছে। অতএব "আমি অমুককে মেরেছি"– এমনটি বলার কোন সুযোগ নেই।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এবং উমবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে সা'লাবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন মুনাজাতের সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! যদি মোমেনদের এ দল ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে আর তোমার এবাদত হবে না"। এরপর জীব্রাঈল (আঃ) হাযির হয়ে বললেন, এক মুষ্টি কাঁকর হাতে নিয়ে–

شَاهَتِ الْوُجُوْهُ

বলে শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাই করলেন।

আল্লাহ পাকের কুদরতের খেলা কে বুঝবে? নিক্ষিপ্ত কাঁকরগুলো প্রতিটি কাফেরের চোখে পড়ে। তখন তারা চোখ রগড়াতে শুরু করে। এ অবস্থায় মুসলমানগণ বীর বিক্রমে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কোরায়শ সর্দারদের মধ্যে যার মৃত্যু হওয়া আল্লাহর মঞ্জুরী ছিল সে নিহত হয়, আর যার বন্দী হওয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল সে বন্দী হয়। তেবরানী এবং আবুশ্ শেখ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, আমাকে এক মুষ্টি কাঁকর এনে দাও। হযরত আলী (রাঃ) তাই করলেন। ফলে প্রত্যেক কাফেরের চোখে কাঁকরগুলো আঘাত করলো।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড–৫, পৃষ্ঠা-৬১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১৬

আবুশ্ শেখ, আবু নাঈম এবং এবনে মরদবিয়া বর্ণনা করেছেন, হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেন, আমি বদরের যুদ্ধের দিন আসমান থেকে কিছু কাঁকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার শব্দ শ্রবণ করি। মনে হয় কাঁকরগুলো কোন তস্তরীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যখন মুসলমানগণ কাতারবন্দী হয়ে গেল তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ কাঁকরগুলো মুশরেকদের চেহারায় নিক্ষেপ করলেন, পরিণামে তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো।

আলোচ্য আয়াতে সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কাঁকর আপনিই নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু এক মুষ্টি কাঁকরের এমন শক্তি ছিল না যে, তা প্রতিটি কাফেরের চোখে আঘাত হানবে।

অতএব, এ সত্য উপলব্ধি করতে আদৌ কোন প্রকার বিলম্ব হয় না যে, এর পেছনে কারো অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। আর ঐ অদৃশ্য শক্তি হলো স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের।

অতএব, কাঁকর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকই নিক্ষেপ করেছেন।

এখানে আরো একটি কথা এই, শুধু কাঁকর নিক্ষেপই নয়, বরং মুসলমানদের নগণ্য সংখ্যক হওয়া, অপ্রস্তুত হওয়া এবং নিরস্ত্র-প্রায় হওয়া সত্ত্বেও বদরের রণাঙ্গণে দুর্ধর্ষ কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করা নিতান্ত আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতএব, এ অবিস্মরণীয় বিজয়ের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞ থাকা মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য।

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ط

"আল্লাহ পাক যা কিছু করেছেন তা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মোমেনগণকে উত্তম বিনিময় দানের লক্ষ্যেই করেছেন"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, মূলতঃ এ বাক্যে একটি সন্দেহের জবাব রয়েছে যে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সমস্ত কাফেরদেরকে ধ্বংস করতে পারেন। এমন অবস্থায় মোমেনদের জেহাদে অংশগ্রহণ এবং তাদের সাহায্যে ফেরেশতা প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল? এ সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আমি যা কিছু করেছি তা দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই করেছি। আর মানুষ এবং ফেরেশতা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার কারণে যেন ঈমানদারগণ সওয়াব, বিজয়, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। যদি আল্লাহ পাক নিজের শক্তিতে সকল কাফেরকে ধ্বংস করতেন অথবা একজন

ফেরেশতার বিকট চিৎকারের মাধ্যমে তাদেরকে মেরে ফেলতেন এবং কোন পৌত্তলিক পৃথিবীতে অবশিষ্ট না থাকতো তবে ভবিষ্যতে কোন কাফের ঈমান আনয়নের সুযোগ লাভ করতো না। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে যারা জীবিত ছিল তাদের অনেকেই পরে ইসলাম কবুল করেছে এবং ঈমানের নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে। এতদ্ব্যতীত মোমেনগণ জেহাদ ও শাহাদাতের সওয়াব পেয়েছেন। যারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন, তারা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ লাভ করেছেন এবং ফেরেশতাগণও উচ্চ মর্তবা লাভ করেছেন।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি বদর ও ওহোদ যুদ্ধে শরীক হয়েছে, সে অবশ্যই দোযখে যাবে না। ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত হাফসা (রাঃ) বলেছেনঃ আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে ও হোদায়বিয়ার ঘটনায় শরীক হয়েছে ইনশা আল্লাহ সে দোযখে যাবে না। হযরত হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ পাক কি একথা এরশাদ করেননি−

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

(আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে দোযখে অবতরণ করবে না) তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি আল্লাহর এ ফরমান শ্রবণ করোনি−

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

অতঃপর আমি নাজাত দেব সে সব লোককে যারা পরহেযগারী অবলম্বন করেছে। ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, বদরের দিন হযরত যায়েদ এবনে হারেসা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর মাতা তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি অবগত আছেন যে, হারেসার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল, যদি সে এখন জান্নাতে থাকে তবে আমি সবর করবো এবং সওয়াবের আশা করবো আর এছাড়া যদি অন্য কিছু হয় তবে বলুন আমি কি করবো?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ জান্নাত কি শুধু একটি? জান্নাততো অনেক, আর সে জান্নাতুল ফেরদাউসে আছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি এরশাদ করেছেনঃ তোমার পুত্র জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চতম স্থানে আছে।

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের দোয়া এবং ফরিয়াদ শ্রবণকারী"।

عَلِيمٌ

"তিনি তাদের নিয়্যত এবং সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত"।

ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেবেন"।

অর্থাৎ মোমেনদের প্রতি আল্লাহ পাকের এ অদৃশ্য সাহায্য এবং অসাধারণ দয়ামায়া শুধু বদরের যুদ্ধেই শেষ হয়ে যায়নি, তথা বদরের যুদ্ধেরই এটি বৈশিষ্ট্য ছিল না, বরং ভবিষ্যতেও এমনিভাবে আল্লাহ পাক কাফেরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবেন। মুসলিম জাতির জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ প্রতিশ্রুতি সর্বকালেই প্রতিফলিত হতে পারে, যদি মুসলমানগণ তার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করে।

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ

বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আবু জেহেল কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে এ দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ! আমাদের এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে যে সত্য দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত, তাকে তুমি বিজয় দান কর। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ

তোমরা বিজয় কামনা করছিলে, সে বিজয় এসে গেছে, আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। যদি এর দ্বারা তোমাদের শিক্ষা হয় এবং তোমরা মুসলমানদের মোকাবেলা থেকে বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম। কিন্তু তোমাদের এ অপমানজনক পরাজয় থেকেও যদি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ না কর এবং

তোমাদের চেতনা ফিরে না আসে আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্পর্ধা দেখাও তবে আল্লাহ পাক পুনরায় ঐ ব্যবস্থা করবেন এবং তোমাদের সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন তা তোমাদের জন্যে উপকারী হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক মোমেনদের সাথে রয়েছেন।[১]

বদরের যুদ্ধে বিজয়ের আরো একটি বিবরণ

হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, বদরের দিন যখন আমরা কাতারবন্দী হয়েছিলাম তখন আমি দেখলাম, আমার ডানে বামে দু'জন অল্প বয়স্ক যুবক, আমি চিন্তা করলাম যে, যদি আমার দু'দিকে দু'জন শক্তিশালী ব্যক্তি থাকতো তবে আমাকে সাহায্য করতে পারতো। তখন ঐ সময়ই একজন যুবক আমাকে বললো, আপনি কি আবু জেহেলকে চেনেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ তবে হে ভ্রাতঃষ্পুত্র, তার কাছে তোমাদের কি কাজ? সে বললো আমরা জানতে পেরেছি যে, এ লোকটি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়। শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি আমি তাকে দেখি তবে সে আমার সম্মুখ থেকে যেতে পারবে না। আমাদের উভয়ের মধ্যে যার মৃত্যু ঘণিয়ে এসেছে সে মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

দ্বিতীয় যুবকও আমার নিকট এমন কথা বলে। আমি ঐ যুবকদেরকে বললামঃ তোমরা যার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলে সে তো এ ব্যক্তিই। তখন তারা একথা শ্রবণ করা মাত্রই উভয়ে তরবারী নিয়ে আবু জেহেলের উপর দ্রুত গতিতে আক্রমণ করলো এবং তাকে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় করে দিল। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমেত হাযির হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা উভয়ের তাকে হত্যা করেছ? এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলের অস্ত্র-শস্ত্র এবং তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মালপত্র মাআজ এবনে আমর এবনে জমুহকে দান করলেন। এ দুজন হলো মাআজ এবনে আমর এবং মাআজ এবনে আফরা।

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশারদ করেছেনঃ "কেউ দেখে আসুক আবু জেহেল কি অবস্থায় আছে"?

নির্দেশ মোতাবেক হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) গমন করলেন এবং দেখলেন যে, আফরার দু' পুত্র তাকে মেরেছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৪১-৪২
তফসীরে কুরর্তবী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৮৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১৮

(রাঃ) তার দাঁড়ি ধরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুই কি আবু জেহেল? আবু জেহেল বললো যে ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়, অথবা সে বলেছে যে ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করেছ তার চেয়ে বড় কেউ আছে কি?

ইমাম আহমদ (রঃ) মসনদে আবু জেহেল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বলেছেঃ হে বকরীর রাখাল! তুমি অনেক উচ্চ চূড়ায় আরোহন করেছ অর্থাৎ আমার বক্ষে চড়ে বসেছ, যা পর্বতের ন্যায় উঁচু। এরপর আমি তার মস্তক কর্তন করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করে আরজ করলাম, এ হলো আল্লাহর দুশমন আবু জেহেলের মাথা। তখন তিনি এরশাদ করলেন, শপথ সেই আল্লাহর পাকের, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আমিও আরজ করলাম জ্বী-হ্যাঁ, শপথ সেই আল্লাহর পাকের যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। এরপর আবু জেহেলের মাথা তাঁর সম্মুখে রাখলাম। তখন তিনি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তখন সেজদায় পড়ে গেলেন। আর তৃতীয় বর্ণনায় রয়েছে তিনি দু' রাকাআত শোকরানা নামায আদায় করলেন।

এবনে আবেদ কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক উম্মতেরই একজন ফেরাউন হয়, এ উম্মতের ফেরাউন হলো আবু জেহেল। তার প্রতি আল্লাহ পাকের লা'নত। আফরার পুত্রদ্বয় তাকে হত্যা করেছে। অথবা বলেছেন, ফেরেশতাগণ তাকে হত্যা করেছেন। আর এবনে মাসউদ (রাঃ) তার কাজ সমাধা করেছে।

وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ

আর একথা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক মোমেনদের সঙ্গে রয়েছেন। তাই বিজয় লাভের অধিকার মোমেনদেরই। যদিও কোন বিশেষ কারণবশতঃ কখনো তা প্রকাশ পায় না। অতএব, যদি কাফেররা পুনরায় মোমেনদের উপর হামলা করে তবে আল্লাহ পাক অনুরূপভাবে মোমেনদের সাহায্য করবেন এবং কাফেরদের পরাজিত করবেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ
اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ
لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ
لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ
لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ
وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا
تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

তরজমা

(২০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূলের আদেশ মেনে চল, আর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, এমন অবস্থায় যখন তোমরা তাঁর কথা শ্রবণ কর।

(২১) এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা যারা বলে আমরা শ্রবণ করলাম, অথচ তারা শ্রবণ করে না।

(২২) আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব সেই বধির মূক যারা কিছুই বোঝে না।

(২৩) আর আল্লাহ্ পাক যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন তবে তাদেরকেও শুনিয়ে দিতেন, আর তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তবুও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিত।

(২৪) হে ঈমানদারগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া

দেবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে অন্তরাল হয়ে থাকেন, আর নিশ্চয় তাঁরই নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে।

(২৫) আর তোমরা সেই পাপ কার্য থেকে বেঁচে থাক যার আযাব শুধু তোমাদের জালেমদের উপরই পতিত হবে না, এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ- "নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মোমেনদের সঙ্গে আছেন"। আর আলোচ্য আয়াতে সেই সৌভাগ্যবান মোমেনদের কর্তব্যের বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ্ পাকের কথা চির সত্য, তাঁর ওয়াদা চির অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সে ওয়াদা প্রতিফলিত হবে শুধু যোগ্য পাত্রে। অতএব, মোমেন মাত্রকে এ পর্যায়ে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। আর সে যোগ্যতা হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য। অবস্থা যত প্রতিকূলই হোক না কেন, পরিস্থিতি যত জটিল ও ভয়াবহ হোক না কেন, মোমেন মাত্রকে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধান সম্পূর্ণ রূপে মেনে চলতে হবে। কথায়-কাজে, আচার-আচরণে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি স্তরে তথা সর্বাবস্থায় মোমেনকে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত থাকতে হবে। এ আনুগত্য এবং তাবেদারীই হলো আল্লাহ্ পাকের রহমত লাভের যোগ্যতার মানদণ্ড। তাই আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর। আর কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে বিমুখ হয়োনা। যেভাবে তোমরা আকীদা এবং বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্ পাকের কালাম শ্রবণ কর তেমনি তার উপর আমলও কর।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ۝

"(হে মোমেনগণ!) তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা যারা বলে যে, আমরা শ্রবণ করেছি, অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা শ্রবণ করে না"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর দ্বারা মুনাফেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারা বলতো, তারা আল্লাহর রসূলের কথা শ্রবণ করেছে অথচ তারা মনে প্রাণে তা আদৌ শ্রবণ করতো না। তাই মোমেনদেরকে তাগিদ করা হয়েছে যেন তারা কাফের এবং মুনাফেকদের মত না হয়। এ আয়াতে মোমেনদেরকে কাফের মুনাফেক অথবা ইহুদী তথা কোন পথভ্রষ্ট লোকের অনুসারী না হওয়ার জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে। কেননা, তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হতো এবং তাঁর কথা মনে প্রাণে শ্রবণ করতো না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতো আমরা শ্রবণ করলাম কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই, তারা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করতো না। এজন্যে মুসলমানদেরকে এ আয়াতে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে যেন কাফের মুনাফেকদের মত তাদের আচরণ না হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে কোন সম্প্রদায়ের ন্যায় হবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন ব্যক্তি কোন শাসনকর্তার আনুগত্যের দাবীদার হয়, অথচ শাসনকর্তার শত্রুদের ন্যায়ই হয় তার চলাফেরা, ওঠা বসা তবে সে শাসনকর্তা তাকে বিশ্বাস করে না। ঠিক এমনিভাবে মোমেন মাত্রই আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ অনুগত হয়। কিন্তু কেউ যদি দূরাত্মা কাফের মুনাফেকদের মত জীবন যাপন করে তবে তা কোন ভাবেই সমর্থনযোগ্য হয় না। তাই আলোচ্য আয়াতে সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুগত হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের চিরশত্রু কাফের এবং মুনাফেকদের মত না হওয়ার বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মদীনা তৈয়্যেবার ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে হাযির হতো, এমনকি নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করতো। এভাবে তাদের কথা ও কাজে কোন প্রকার মিল থাকতো না। কপটতা, ভণ্ডামী, ছলচাতুরীই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। মক্কার পৌত্তলিকরাও বলতো, "আমরা শুনেছি তবে মানিনা"। তাই পরবর্তী বাক্যে তাদের সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছেঃ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব হলো সে বধির ও মূক, যে কিছুই বোঝে না তথা যে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত আকল-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। আলোচ্য আয়াতে বধির এবং মূক তাদেরকে বলা হয়েছে যারা আল্লাহ পাক প্রদত্ত নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করেনা। তাদের শ্রবণ শক্তি আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা সত্য বাণী শ্রবণ করেনা, বিবেক-বুদ্ধি আছে কিন্তু তারা ভেবে দেখে না। রসনা আছে কথা বলতে পারে কিন্তু কথা বলে না। প্রকৃত অবস্থা এই, তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীব। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا

"এবং নিশ্চয় আমি তৈরী করেছি অনেক জ্বীন ও মানুষকে দোযখের জন্যে, তাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা সত্য উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা সত্যকে দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা সত্য বাণী শ্রবণ করেনা। তারা হলো চতুঃষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও বেশী পথভ্রষ্ট"।

মূলতঃ এ আয়াতে কাফের এবং মুনাফেকদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কেননা তাদের সম্মুখেই পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে। তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সচক্ষে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। কিন্তু এ সৌভাগ্য তারা ধরে রাখতে পারেনি। কেননা তারা আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআন মনে প্রাণে শ্রবণ করেনি। তাই তারা সর্বাধিক নিকৃষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আলোচ আয়াতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা বনী আবদুদ দারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারা বলতো, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে আমরা বধির এবং তাঁর সে সব কথা স্বীকার করার ব্যাপারে আমরা মূক এবং তা দেখার ব্যাপারে আমরা অন্ধ। ওহোদের যুদ্ধে এই সকলের মৃত্যু হয়েছে। ওহোদের যুদ্ধের দিন তারাই ছিল কাফেরদের পতাকাবাহী। তাদের মধ্যে শুধু দু'জন ইসলাম কবুল করেছেন, তাঁরা হলেন মাসআব এবনে ওমায়ের এবং সোয়াইদ এবনে হারমা।

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ط

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেনঃ মক্কার কাফেররা একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে এ আবদার

করলো যে, আমাদের পূর্ব পুরুষ কুশাই এবনে কেলাব সহ অন্যদেরকে আপনি জীবিত করুন, যদি তারা এসে আপনার নবুওয়্যতের সত্যতার সাক্ষ্য দেয় তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ্ পাক যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেতেন তবে তাদের পূর্ব পুরুষের কথা শুনিয়ে দিতেন"।

অর্থাৎ যদি তাদের মৃত পূর্ব পুরুষরা জীবিত হয়ে ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য দেয় তবুও তারা ঈমান আনবে না। কেননা, তারা সত্যকে গ্রহণের জন্যে এই আবদার করছে না; বরং কলহ দন্দ্বের উদ্দেশ্যেই এমন অন্যায় আবদার করেছে। এমনকি যদি তাদের মৃত পূর্ব পুরুষদেরকে আল্লাহ্ পাক জীবিত করে দেন তবুও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না, বরং উপেক্ষা করে প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা, তাদের মধ্যে কল্যাণ বলতে কিছুই নেই। এ কারণে তারা মানবতার পরিমণ্ডল থেকে বের হয়ে পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছে।

يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেক বে-দ্বীনদের কথা ছিল আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহর রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণের আহবান জানিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূল যখন তোমাদেরকে আহবান করেন এমন কাজের জন্যে, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন তথা জীবন-সাধনার সার্থকতা এবং সার্বিক কল্যাণ যে কাজে নিহিত রয়েছে, এমন কাজের জন্যে যখন তিনি তোমাদেরকে ডাকেন তবে তোমরা অনতিবিলম্বে তাঁর ডাকে সাড়া দিও। আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল যে কাজের জন্যে তোমাদেরকে ডাকেন সে ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার গাফলত করা তোমাদের সর্বনাশের কারণ হবে।

তফসীরকারগণ এ বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করেছেন যে, মানুষের জীবন-সাধনার সার্থকতা আনয়নকারী কোন বস্তুর প্রতি আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিখ্যাত তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, তা হলো ঈমান। কেননা কাফের মৃত, মোমেন জীবিত। আর তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পবিত্র কোরআন। কেননা পবিত্র কোরআনের হেদায়েতের মাধ্যমেই জীবন-সাধনা সার্থক হয় এবং দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত পাওয়া যায়। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা হক্ব উদ্দেশ্য

করা হয়েছে। তথা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে যে চিরন্তন সত্যের দিকে আহবান জানান তাই এখানে উদ্দেশ্য। এবনে এসহাক বলেছেনঃ এর দ্বারা জেহাদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে কেননা, জেহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে বিশেষ সম্মান এবং মর্যাদা দান করেছেন।

আর কোতায়বা বলেছেনঃ এর অর্থ হলো শাহাদাতের মর্তবা লাভ করা। কেননা আল্লাহ পাক শহীদগণের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ

"শহীদগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত, তাদেরকে রিয্‌ক দেয়া হয়, তারা আনন্দিত অবস্থায় রয়েছে"।

এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা কিছু গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন এ আয়াতে সে সবের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করার কারণে মানব অন্তরের মৃত্যু হয়। আর তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে অন্তর জীবনী শক্তি লাভ করে। এর তাৎপর্য এই, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই মানব জীবন সার্থক হয়। তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে জীবন বোধ সৃষ্টি হয়। আর অন্তর জীবিত হওয়ার অর্থ হলো অন্তরের কালিমা দূর হওয়া। তিরমিজী এবং নেসায়ী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) নামাযে রত ছিলেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিকে গমন করেছেন এবং হযরত উবাইকে (রাঃ) ডাক দিয়েছেন। হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে দরবারে হাযিরী দেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমি যখন তোমাকে ডেকেছিলাম তখন তুমি সাড়া দাওনি কেন? তিনি বললেন আমি নামাযে রত ছিলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি কি জান না আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

তখন হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার ডাকে সাড়া দেয়া একান্ত জরুরী ছিল।

এরপর আপনি যখন আমাকে ডাকবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে হাযির হব, যদি আমি নামাযে থাকি তবুও।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে কাজের জন্যে আহবান করেন সে কাজ করা তথা তাঁর আদেশ পালন করা একান্ত জরুরী।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, নামাযের অবস্থায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডাকে জবাব দিলে নামায বিনষ্ট হয় না। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন, যদি কোন আকস্মিক প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আহবান করেন তবে তাঁর হুকুম পালনার্থে নামায ছেড়ে দেয়া কর্তব্য।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ দু'টি কথার মধ্যে প্রথম কথাটি অধিকতর শুদ্ধ মনে হয়। কেননা এমন জরুরী কাজ যা বিলম্ব হলে বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তার জন্যে নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এমন অবস্থা যদি হয় যে, কোন অন্ধ ব্যক্তি কূপে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, সেখানে কোন ব্যক্তি নামাযে রত রয়েছে এবং তখন ধারণা হয় যে, যদি নামায ছেড়ে দেয়া না হয় তবে অন্ধ ব্যক্তিটি কূপে নিক্ষিপ্ত হবে তখন নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে পথ দেখান এবং তাকে রক্ষা করা বৈধ।[২]

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ

"নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক মানুষ এবং তার অন্তরের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে থাকেন"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মানুষের মনের চেয়েও মানুষের অধিকতর নিকটবর্তী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

(অর্থাৎ) "আমি মানুষের গলার শিরা থেকেও নিকটতর"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭১-৭২
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭২

এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই, তোমরা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চল এবং একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের অত্যন্ত নিকটে। তোমাদের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। অতএব, কোন ফাঁকি বা ছল-চাতুরী তাঁর নিকট চলবে না, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ

'সেদিনকে স্মরণ যেদিন সকল রহস্য উদঘাটিত হবে, যেদিন তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না, শক্তিও থাকবেনা'।

বস্তুতঃ মানুষের মন আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ্ পাক যখন ইচ্ছা করেন কোন বন্দাকে মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করতে তখন তার অন্তর ও পাপ কার্যের মধ্যে তিনি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। আর যখন কারো বদনসীবি মঞ্জুর হয় তখন সে ব্যক্তির অন্তর ও নেক কাজের মধ্যে আড়াল করে দেয়া হয়। এজন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেনঃ

يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك

হে মনের অবস্থা পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখ। আলোচ্য আয়াতের আরও একটি অর্থ এই, যখন কোন নেক কাজ করার বা গুনাহ থেকে বাঁচার কোন সুযোগ আসে তখন তা সঙ্গে সঙ্গে কর, বিলম্ব করোনা এবং প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর নেয়ামত মনে কর।

কেননা কখনো মানুষ কোন কাজের ইচ্ছা করে কিন্তু আল্লাহ্ পাকের এমন হুকুম হয় যে, সে ইচ্ছা আর কার্যকর হয় না। কোন সময় সে রুগ্ন হয়ে যায় অথবা মৃত্যু আসে বা এমন কোন জরুরী কাজ এসে পড়ে যার কারণে পূর্বে কৃত ইচ্ছা বাস্তবায়নের সুযোগই থাকে না। এজন্যে পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো, কোন ভাল কাজের ইচ্ছা হলে প্রথম সুযোগেই তা সু-সম্পন্ন করা। আজকের কাজ কালকের জন্যে না রাখা। কবি বলেছেনঃ

غنیمت جان لو اس مل بیٹھنے کو= جدائی کی گھری سر پے کھری ہوئی ہے

এই একত্রিত হওয়াকে আল্লাহর নেয়ামত মনে কর। কেননা বিদায়ের মুহূর্ত নিকটবর্তী।[১]

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৬২-৬৩

হযরত ওমর (রাঃ) একজন যুবককে দেখলেন এভাবে আল্লাহর দরবারে দোয়া করছে, হে আল্লাহ! তুমি মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে অন্তরাল হয়ে দাড়াও। অতএব, আমার ও আমার গুনাহর মধ্যে অন্তরাল হও, যেন আমি কোন মন্দ কাজ না করি। হযরত ওমর (রাঃ) এই বলে ঐ যুবকের জন্যে দোয়া করলেন, আল্লাহ পাক তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন।

وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

আর নিশ্চয় তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে একত্রিত হতে হবে এবং আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার আমলের বিনিময় দান করবেন। অতএব, তোমরা নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে দু'ভাবে আল্লাহ পাক অন্তরাল হন।

১. যেহেতু মোমেনগণ আল্লাহ পাকের অনুগত হয়, এ আনুগত্যের বরকতে আল্লাহ পাক মোমেনকে পাপাচার থেকে রক্ষা করেন।

২. আর যেহেতু কাফেরদের অন্তরে থাকে অবিশ্বাস-অনাস্থা এবং সত্য বিরোধিতা, তাই সে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে আকৃষ্ট হয় না।[১]

এ আয়াত সম্পর্তে আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে, আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি মানব মনকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। এমনকি যার মন সে-ও তা করতে পারে না। এজন্যেই দেখা যায় মানুষ অনেক কাজেরই ইচ্ছা করে, এমনকি সংকল্পও করে কিন্তু আল্লাহ পাক তার সংকল্প পরিবর্তন করে দেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেনঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে,

يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك

এ দোয়াটি এত অধিক পরিমাণে কেন পাঠ করেন? তখন তিনি এরশাদ করেছেনঃ হে উম্মে সালমা! এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তর আল্লাহ পাকের দুটি আঙ্গুলের মধ্যে নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে রাখেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেন।[২]

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৮
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯১

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক মোমেন ও তাঁর অন্তরের মধ্যে অন্তরাল হন তথা মোমেনের অন্তরকে আল্লাহ পাক হেফাজত করেন কুফর ও নাফরমানী থেকে তথা ঈমানের ওপর তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফলে তার দ্বারা কুফর ও নাফরমানীর কাজ হয় না। আর কাফেরের অন্তরকেও হেফাজত করেন, পরিণামে সে ঈমান আনে না।[১]

মুজাহেদ (রঃ) বলেন, "আল্লাহ পাক অন্তরাল হন"-এর অর্থ হলো কাফেরকে তিনি সত্য উপলব্ধি করতে দেন না। আর সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে পারেনা বা কুফর ও নাফরমানী করতে পারে না।[২]

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ج

তোমরা সেই ফেতনাকে ভয় কর যার পরিণাম শুধু তারাই ভোগ করবে না যারা জুলুম-অত্যাচার করেছে, বরং সেই বিপদ সবার জন্য হবে। বিশেষত সেই গুনাহর শোচনীয় পরিণাম তারাও ভোগ করবে যারা শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যায়কে বাধা দেয়নি।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের "ফেতনা" শব্দটি সম্পর্কে বলেছেন, এর অর্থ হলো গুনাহ।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো সত্যের নির্দেশ এবং মন্দ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা পরিত্যাগ করা। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, কোন মন্দ চরিত্র নিজেদের মধ্যে যেন স্থান না দেয়া হয়। অন্যথায় আল্লাহ পাক এমন আযাবে পতিত করবেন যা, যে অপরাধী এবং যে অপরাধী নয় সবাইকে গ্রেফতার করবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এ মর্মে একটি ফরমান জারী করেছিলেন, হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন কর। যদি তোমরা হেদায়েতের উপর সুদৃঢ় থাক তবে যে পথভ্রষ্ট হয় সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ যদি মানুষ জালেমকে জুলুম করতে দেখে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে বিরত না রাখা হয় তবে খুব সম্ভব তাদের সকলকে আল্লাহ পাক এক সাধারণ আযাবে পতিত করবেন।

১। তানবীরুল মেকবাস, মিন তফসীরে এবনে আব্বাস খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৩

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দিতে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ, সে সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে (বিপদ মুক্তির জন্য) দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। তোমরা গুনাহর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবে কিন্তু তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। ভাল করে বুঝে নাও, ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা তোমাদের রিয্‌ককেও বাধা দেয় না এবং তোমাদের মৃত্যুকেও কাছে আনে না (অর্থাৎ এ কারণে তোমাদের জান-মালে কোন ক্ষতি হয় না)। ইহুদী ও নাসারা জাতির ধর্মযাজকরা যখন ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ পরিত্যাগ করে তখন আল্লাহ পাক পয়গম্বরগণের মাধ্যেমে তাদের প্রতি লা'নত প্রেরণ করেন এবং অবশেষে সকলকে আযাবে পতিত করেন।

হযরত নোমান এবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে (বিভিন্ন অপরাধের জন্য) যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে তা জারী করার ব্যাপারে যারা অবহেলা করে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, একটি জাহাজে একদল লোক আরোহন করলো, তন্মধ্যে কিছু লোক জাহাজের উপরের তলায় এবং কিছু লোক নীচের তলায় অবস্থান করলো, উপরের লোকদের পানি নীচের তলা দিয়ে প্রবাহিত হয় ফলে তাদের কষ্ট হয়। এজন্যে নীচের তলার অধিবাসীরা কুড়াল নিয়ে জাহাজের নীচ তলায় একটি ছিদ্র করতে শুরু করে, তখন উপরের তলার লোকেরা বলে, তোমরা এ কি করছো? তারা বললো পানি প্রবাহিত হওয়ার কারণে লোকদের কষ্ট হচ্ছে। তাই ছিদ্র করে দিচ্ছি। এমন অবস্থায় উপরের তলার অধিবাসীরা যদি ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখে তবে ছিদ্রকারী ও উপরের অধিবাসী দু'ই বাঁচবে। অন্যথায় ছিদ্রকারীও নিমজ্জিত হবে এবং উপরের তলার অধিবাসীরাও মৃত্যু মুখে পতিত হবে। (বোখারী)

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "ফেতনা" শব্দের অর্থ হলো অশান্তি, দেশে অশান্তি-উচ্ছৃংখলা এবং ধ্বংসযজ্ঞের কারণে অনেক বেকসুর লোকের মৃত্যু হয়, অনেকে লুণ্ঠিত হয়।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম উপলব্ধি করলেন যে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোন ফেতনা পয়দা হবে।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ফেতনা অর্থ মুসলমানদের পরস্পরের কলহ-দন্দ্ব।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আলী (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যোবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে।

মাতরাফ (রাঃ)-এর বর্ণনা এই, আমি হযরত যোবায়ের (রাঃ)-কে বললাম, আপনি নিজে খলীফাতুল মুসলেমীনের (হযরত ওসমান (রাঃ) সাহায্য করেননি, পরিণামে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। এখন তাঁর কেসাস বা খুনের বদলা দাবী করছেন। হযরত যোবায়ের (রাঃ) বললেন, এ আয়াত আমি বহুবার পাঠ করেছি কিন্তু এ সত্য উপলব্ধি করিনি যে, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তিনি এ কথা দ্বারা জমলের যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যেদিন হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়। তফসীরকার সুদ্দী (রঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "ফেতনা" শব্দটির অর্থ হলো জেহাদ না করা বিশেষত, সে সময়ে যখন ইমামুল মুসলেমীনের তরফ থেকে সাধারণভাবে জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্যে আহবান করা হয়। এমন অবস্থায় যদি জেহাদ পরিত্যাগ করা হয় তাহলে কাফেররা মুসলমানদের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে। তখন মুসলমান নারী শিশু সবাই জালেমদের জুলুমের শিকার হবে। লক্ষ্যনীয়, ওহোদের যুদ্ধে যখন মুসলমানগণ ভুলক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি আদেশ পালন করেননি তখন পেছনের পথ দিয়ে কাফেররা মুসলমানদের উপরে হামলা করে এবং সকল মুসলমানের জন্যেই তখন বিপদ দেখা দেয় এমনকি, এ যুদ্ধে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দান্দান মোবারক পর্যন্ত শহীদ হয়।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন যে, তোমরা এমন বিপদকে ভয় কর এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও যা তোমাদের কতিপয় লোকের অন্যায় আচরণের পরিণামে আসবে। কিন্তু সে বিপদ শুধু ঐ অন্যায়কারীদের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, বরং সামগ্রিকভাবে আসবে এবং সকলেই বিপদগ্রস্ত হবে। সমাজ ও জাতীয় জীবনের নিরাপত্তার দিক থেকে আলোচ্য আয়াতখানির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কোন সমাজ বা জাতির এক শ্রেণীর লোক যদি পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং সে জাতির অন্য লোকেরা নীবর দর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং পাপাচারীদেরকে অন্যায় আচরণ

থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট না হয় তবে তার শোচনীয় পরিণাম সকলকেই ভোগ করতে হবে।

এজন্যে পূর্ববর্তী আয়াতে যে নির্দেশ রয়েছে তার উপর আমল করাই হলো নাজাত লাভের একমাত্র পন্থা তথা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন কর। অতএব, আয়াতের মর্মকথা হলো আল্লাহর রসূলের আদেশ পালনে বিলম্ব করোনা, অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করোনা, মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দিতে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হও। কেননা, অন্যায় আচরণের শাস্তি শুধু পাপীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অন্যদেরকেও শাস্তির অংশীদার হতে হয়। সবাইকে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন অন্যায় কাজ দেখে তবে তার কর্তব্য হলো সে অন্যায় কাজকে প্রতিরোধ করা। যদি সে শক্তি না থাকে তবে মৌখিক প্রতিবাদ করা। যদি এ সাধ্যও না থাকে তবে মন্দকে মন্দ জানা।[১]

وَاعْلَمُوٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

এবং নিশ্চিন্তভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর, অতএব, আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন কর। আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক, ফেতনা থেকে দূরে থাক। ভাল কাজের নির্দেশ দিতে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে প্রয়াসী হও।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭১-৭২
~~তফসীরে কবীর~~ খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৪৯

وَاذْكُرُوْۤا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ
تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾
وَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ
اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

তরজমা

(২৬) এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা ছিলে অল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল হিসেবে পরিগণিত হতে, এ ভয় করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে হটাৎ ধরে নিয়ে যেতে পারে, এরপর আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে আশ্রয় দান করেন। নিজের মদদ দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তু সমূহ জীবিকা হিসেবে দান করেন, যেন তোমরা তাঁর শোকর গুজার হও।

(২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করোনা, আর নিজেদের মধ্যকার আমানত সম্পর্কেও জেনে শুনে বিশ্বাস ভঙ্গ করোনা।

(২৮) এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা মাত্র। আর আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে মহান পুরস্কার।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ রয়েছে। এরপর পাপাচার থেকে

আত্মরক্ষা করার এবং আল্লাহ পাককে ভয় করার আদেশ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাকের দান ও এহসান স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অতি অল্প। দ্বিতীয়তঃ তোমরা ছিলে অত্যন্ত দুর্বল। তৃতীয়তঃ তোমাদের দুর্বলতার কারণে তোমরা এ আশঙ্কা করতে যে, দুশমনরা তোমাদেরকে যে কোন সময় ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তোমাদের ঐ অসহায় অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রথমতঃ তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন তথা হিজরতের মাধ্যমে মদীনা মোনাওয়্যারায় মুসলমানদেরকে আশ্রয় দান করলেন, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন এবং শক্তিশালী করলেন এবং উত্তম রিয্ক দান করলেন। পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যে মালে গনিমত তথা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বৈধ ছিল না, কিন্তু আল্লাহ পাক মুসলমানদের জন্যে তা বৈধ ঘোষণা করলেন। এভাবে তিনি তোমাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করলেন। এসব নেয়ামতের জন্যে হয়তো তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হবে।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থা চিন্তা করে আল্লাহ পাকের অন্তহীন নেয়ামতের কথা স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! তোমরা তোমাদের অতীত অবস্থার কথা চিন্তা কর, তোমাদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প, তোমরা ছিলে অতি দুর্বল এবং অসহায়। দুশমন কখন ছোঁ মেরে তোমাদেরকে নিয়ে যায় তোমরা তখন এমন আশঙ্কা করতে, তোমাদের জানা উচিত শক্তির মূল উৎস এক আল্লাহ পাক, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শক্তিশালী করতে পারেন, যাকে ইচ্ছা তাকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছাধীন, সবই তাঁর কর্তত্বাধীন। অতএব, তোমাদের প্রথম কাজ হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য সুদৃঢ় করা। আল্লাহর রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই তোমাদের সাফল্য অর্জিত হবে। লক্ষ্য কর যখন তোমরা ছিলে ভীত-সন্ত্রস্ত, সংখ্যায় নগণ্য, তোমাদের অন্তর ছিল দুশমনের ভয়ে শঙ্কিত এবং কম্পিত, ঠিক এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দান করলেন মদীনা মোনাওয়্যারায় আশ্রয়, সারা আরব থেকে কাফেরদের দ্বারা নির্যাতীত উৎপীড়িত হয়ে তোমরা মদীনা মোনাওয়্যারায় আশ্রয় নিলে। এরপর আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হলো। এরপর বদরের রণাঙ্গনে কাফেরদের সঙ্গে যখন তোমাদের প্রথম যুদ্ধ হয় তখন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সরাসরি সাহায্য করলেন এবং তোমাদের দুশমনকে পরাজিত ও অপমানিত করলেন।

অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর শোকর গুজার হওয়া।[১]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করোনা"।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'খেয়ানত' শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, কেউ কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কোন কথা শ্রবণ করে তা কঠিন মনে হলে মুশরেকদের নিকট বলে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, মুনাফেকরা ঈমানের কথা প্রকাশ করতো এবং কুফর ও নাফরমানী গোপন রাখতো। আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা এমন বিশ্বাসঘাকতা না করে।

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আবু সুফিয়ান যখন মক্কা থেকে বের হয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সে সম্পর্কে অবগত হন এবং তার বিরুদ্ধে অভিযান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এক মুনাফেক চিঠি দিয়ে আবু সুফিয়ানকে এ সম্পর্কে অবহিত করে, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম জুহরী এবং কালবী (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআ (রাঃ) সম্পর্কে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন হযরত হাতেম এবনে আবি বলতাআ (রাঃ) মক্কাবাসীকে এ সম্পর্কে অবগত করার জন্যে চিঠি দিয়েছিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে অবগত করলেন তখন তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে পাঠিয়ে চিঠির বাহক থেকে চিঠিটি উদ্ধার করে নিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে সাহাবী আবু লোবাবা (রাঃ) সম্পর্কে। আল্লামা বগভী সাঈদ এবনে মনসুরের সূত্রে লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ এবনে আবি কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদী গোত্র বনু কোরায়জাকে ২১ দিন

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৫০

পর্যন্ত ঘেরাও করে রেখেছিলেন। তাদের অবাধ্যতা, ইসলাম বিরোধিতা, মুখে ইসলাম প্রকাশ এবং অন্তরে ইসলামের সাথে শত্রুতার অভিযোগে তাদেরকে ঘেরাও করা হয়। তখন তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। তারা বলে, অন্য ইহুদী ফেরকা বনু নযীরের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে আমাদের অবস্থাও তাই হোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের প্রস্তাব মানলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন, আমি এ সম্পর্কে সা'দ বিন মাআজ (রাঃ)-কে বিচারক মনোনীত করলাম এবং ঘোষণা সম্পর্কে যা কিছু করার সা'দ এবনে মাআজই করবেন। তাকে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অনুমতি দিলাম। বনু কোরায়জা সা'দ এবনে মাআজের শালিশী গ্রহণ করলো না। তারা বললো, আবু লোবাবা (রাঃ)-কে আমাদের নিকট প্রেরণ করুন। যেহেতু হযরত আবু লোবাবার (রাঃ) পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন বনু কোরায়জার বস্তিতে ছিল, তাই তিনি তাদের হিতৈষী ছিলেন।

বনু কোরায়জা যখন তাঁকে হযরত সা'দ এবনে মাআজের (রাঃ) বিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো তখন তিনি মুখে কিছু বললেন না তবে তাঁর গলার দিকে ইঙ্গিত করলেন, যার অর্থ হলো যদি তোমরা সা'দ (রাঃ)-এর বিচার মান তবে তোমাদের গলা কাটা যাবে।

হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) ইঙ্গিত করার পরই এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, এ কাজটি তিনি ভাল করেননি। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা হলো। তাই তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিলেন এবং তওবা এস্তেগফার করতে লাগলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, যে পর্যন্ত না তওবা কবুল হবে সে পর্যন্ত পানাহার করবেন না। যদি এ অবস্থায় মৃত্যু আসে তবুও না। হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) এভাবে নিজেকে বন্দী করে রাখলেন।

এক বর্ণনায় রয়েছে তিনি সাত দিন যাবত এভাবে বন্দী ছিলেন। তিনি পানাহার বলতে কিছুই গ্রহণ করেননি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ছয় দিন এভাবে ছিলেন।

এবনে আকাবা (রাঃ) বলেন যে, তিনি ২০ দিন যাবত এ অবস্থায় ছিলেন, আর এবনে ওহাব (রঃ) বলেছেন, তিনি দশ দিন এ অবস্থায় ছিলেন। যাহোক, ক্ষুধা তৃষ্ণার কারণে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁর তওবা কবুল করেন।

এবনে এসহাক ইয়াজিদ এবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবু লোবাবার (রাঃ) সম্পর্কে এ আয়াত তখন নাযিল হয় যখন তিনি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর বাড়ীতে ছিলেন। রাতের শেষ প্রহরে এ সুসংবাদ আসে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন মুচকি হাসলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ সময় মুচকি হাসার কারণ কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ আবু লোবাবার (রাঃ) তওবা কবুল করা হয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরজ করলেন, আমি কি এ সুসংবাদ মানুষকে দেব না? তিনি এরশাদ করলেনঃ অবশ্যই। তখনও পর্দার বিধান জারী হয়নি। তাই হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) নিজেই সুসংবাদ দিলেনঃ হে আবু লোবাবা! তোমার জন্যে সুসংবাদ, আল্লাহ পাক তোমার তওবা কবুল করেছেন। লোকেরা তখন দ্রুত তাঁর বন্ধন খুলতে গেল। তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! যে পর্যন্ত স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার বন্ধন খুলে না দেবেন সে পর্যন্ত আমি এ অবস্থায়ই থাকবো। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের জন্যে গমনকালে তাঁর দস্তে মোবারকে হযরত আবু লোবাবা (রাঃ)-কে মুক্ত করেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ পাক এ আয়াতে মোমেনগণকে বিশেষভাবে সম্বাধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করোনা। আর তোমাদের পরস্পরের আমানতের ব্যাপারেও খেয়ানত করোনা। তোমরা যখন জান যে, এটি পবিত্র আমানত তবে তাতে কোন অবস্থাতেই খেয়ানত করবে না। অথবা এর অর্থ হলো, তোমরা জান যে গলার দিকে ইঙ্গিত করা খেয়ানত, তাই এমন কাজ করোনা। অথবা এর অর্থ হলো, তোমরা এ সম্পর্কে অবগত রয়েছ এবং ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পার, এমন অবস্থায় তোমরা খেয়ানত করোনা।[১]

আমানতের ব্যাখ্যা

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে আমানতের তাগিদ রয়েছে, আর পরস্পরের আমানতের সত্যিকার মর্মার্থ হল আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের আমানত। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর তরফ থেকে আরোপিত ফরজ ত্যাগ করা আল্লাহ পাকের সঙ্গে খেয়ানত। আর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নত পরিত্যাগ করা তাঁর সঙ্গে খেয়ানত। আর আল্লাহ পাকের তরফ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭৮-৮১
তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৫১

থেকে যে সব ফরজ বন্দার উপর আরোপিত হয়েছে যা মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন, সেগুলো মানুষের আমানত। অতএব, আয়াতের তাৎপর্য হলো ফরজ ও সুন্নত যথাযথ ভাবে পালন কর। প্রকাশ্য ও গোপন সকল দায়িত্ব পালন কর।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, ফরজ হোক অথবা কোন শাস্তির বিধান হোক দ্বীন ইসলামের বিধানই আল্লাহ পাকের আমানত। অতএব, সমস্ত বিধান সঠিকভাবে পালন কর, কোন বিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে ত্রুটি করোনা, যদি ত্রুটি হয় তবে তাকে খেয়ানত বলা হবে, আর যার আমানতই হোক না কেন তা হক্বদারের কাছে আদায় কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর কথার সারমর্ম হলো, যদিও এ আয়াত হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কিন্তু তার হুকুম সবার জন্যে এবং সর্বকালের জন্য। আর তা হলো আমানতে খেয়ানত করোনা। সে আমানত আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হোক অথবা তোমাদের পরস্পরের হোক।

আমানত সর্বক্ষেত্রে

এখানে একথাও প্রনিধানযোগ্য যে, আমানতের ব্যাপারটি জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

المستشار مؤتمن

অর্থাৎ যার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় তার আমানতদার হওয়া উচিত। তথা কাউকে ভুল পরামর্শ দেয়া উচিত নয়। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ

المجالس بالامانة

মজলিস সমূহ আমানতদারীর সঙ্গে, অর্থাৎ মজলিসে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে মজলিসের কথা বার্তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। মজলিসের কথার আমানতদারী হলো বাইরে তা প্রকাশ না করা। এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ

الصلوة امانة والوضوء امانة والوزن امانة

নামায আমানত, অজু আমানত, কোন জিনিসের ওজন করা তাও আমানত। পক্ষান্তরে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন সৎ কাজ করা মুনাফেকী, কোন কথার বর্ণনায় ভুল তথ্য সরবরাহ করা বা সত্য গোপন করা, সর্বপ্রকার প্রতারণা ছল চাতুরী-

এসবই খেয়ানত। আলোচ্য আয়াতে আমানতদারীর তাগিদ করা হয়েছে এবং খেয়ানত থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

الا لا ايمان لمن لا امانة ولا دين لمن لا عهد له

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার মধ্যে দ্বীনও নেই"।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

আবু লোবাবা আনসারী (রাঃ) ইহুদীদের সাথে যে সহযোগিতা করেছেন তা এক প্রকার খেয়ানত হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) যে ভূমিকা পালন করেছেন তার কারণ ছিল এই, তাঁর ধন-সম্পদ এবং পরিবারবর্গ বনু কোরায়জা গোত্রের বস্তিতে ছিল। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। তোমাদেরকে এসব এজন্যে দান করা হয়েছে যেন তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় কর এবং তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চল। কিন্তু সন্তান-সন্ততি বা ধন-সম্পদের মায়ায় তোমরা আল্লাহ ও রসূলের বিধি-নিষেধের ব্যাপারে খেয়ানত করবে না। নিশ্চতভাবে জেনে রাখ, আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে মহান পুরস্কার, বিরাট সাফল্য, যার তুলনায় দুনিয়ার সম্পদ হীন ও তুচ্ছ। অতএব, দুনিয়ার জন্যে আখেরাতের ক্ষতি করা কোন অবস্থাতেই সমীচিন নয়। সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে সব কিছুর ওপর। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ ..... الحديث

সে পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মোমেন হবে না যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় না হই। বস্তুত এটিই হলো প্রকৃত মর্দে মোমেনের বৈশিষ্ট্য।

আর একথা সর্বজন-বিদিত যে, আল্লাহর রসূলের অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জিত হয় আল্লাহর পাকের সন্তুষ্টি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ
فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ
هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن
كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ
أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

তরজমা

(২৯) হে মোমেনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহ দূরীভূত করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ পাকের দান অতি মহান।

(৩০) (হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে যখন কাফেররা আপনাকে বন্দী করার কিংবা হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং তারা ফন্দি আটকেছিল, আর আল্লাহ পাকও কৌশল করেছিলেন, আর আল্লাহ পাকের কৌশল অতি উত্তম।

(৩১) এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে আমরা শ্রবণ করলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন কথা বলতে পারি, পূর্ববর্তী লোকদের ইতিবৃত্ত ব্যতীত এ আর কিছুই নয়।

(৩২) আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! যদি তোমার তরফ থেকে এ ধর্মই সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর, অথবা আমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দাও।

(৩৩) (হে রসূল!) আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে রয়েছেন ততক্ষণ আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর আল্লাহ পাক এমনও নন যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ফেতনা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আবু লোবাবা (রাঃ)-এর সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদের নিরাপত্তার চিন্তায় তাঁর দ্বারা ভুল হয়েছিল। পরবর্তী আয়াতে পথ নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই জান- মালের নিরাপত্তা রয়েছে, আর পরিপূর্ণ আনুগত্য আসে তখন, যখন মানুষ তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে, যখন মানুষ আল্লাহ পাককে ভয় করে চলে এবং সততা ও সাধুতার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ পাককে ভয় করে চল তবে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তিনটি ব্যবস্থা করবেন-

প্রথমতঃ তোমাদেরকে "ফোরকান" দান করবেন। আলোচ্য আয়াতে "ফোরকান" শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

(ক) ফোরকান অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত সেই আলো, যার দ্বারা মানুষ ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এজন্যে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ

اتقوا فراسة المؤمن

মোমেনের ধী শক্তিতে ভয় কর। যখন মানুষ আল্লাহকে ভয় করে, পরহেযগারী অবলম্বন করে এবং একথা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাক আমার যাবতীয় কথা ও কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন, অবশেষে আমাকে তাঁর মহান দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে, তখন সে যাবতীয় পাপাচার পরিহার করে চলে। সকল অন্যায় আচরণ বর্জন করে

এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্তি লাভ করে। এ সময় আল্লাহ পাক তার ক্বলবের মধ্যে একটি শক্তি দান করেন যাকে আধ্যাত্মিক শক্তি বলা হয়। ঐ ব্যক্তির ক্বলব তখন জ্যোতির্ময় হয়, সব কিছুর ভাল-মন্দ তার অন্তরের দৃষ্টিতে সে দেখতে পায়, "ফোরকান" শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্যে আল্লামা আলুসী (রঃ) "ফোরকান" শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

أى هداية ونورا فى قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل

অর্থাৎ- ফোরকানের তাৎপর্য হলো হেদায়েত এবং নূর যা মানব অন্তরকে উদ্ভাসিত করে, যার মাধ্যমে মানুষ হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আর এ ব্যাখ্যাই পেশ করেছেন এবনে যোবায়ের এবং এবনে যায়েদ (রঃ)।[১]

এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আয়াতের মর্ম হবে এই, হে মোমেনগণ! যদি তোমরা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর তবে তোমাদের অন্তর এমন জ্যোতি লাভ করবে যার মাধ্যমে তোমরা ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।

(খ) 'ফোরকান' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো সেই সাহায্য, যার কারণে আল্লাহ পাক তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে সুস্পষ্ট মীমাংসা করে দেবেন। তোমাদেরকে আল্লাহ পাক সম্মান দান করবেন।

আল্লামা আলুসীর ভাষায়ঃ

اونصرا يفرق بين المحق والمبطل باعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين

"ফোরকান" শব্দের এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের মর্ম হবে এই, হে মোমেনগণ! যদি তোমরা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, ফলে তোমরা বাতিল পন্থীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, মোমেনদেরকে আল্লাহ পাক সম্মানিত এবং কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো হে মোমেনগণ! যদি তোমরা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর তবে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে সকল বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো সকল সন্দেহ থেকে হেফাজতের পথ বাতলে দেবেন। তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, মূলতঃ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯৬
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৬৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৩

"ফোরকান" শব্দটি আলোচ্য আয়াতে নাজাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা যদি পরহেযগারী অবলম্বন কর তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে নাজাত লাভের ব্যবস্থা করবেন।

তফসীরকার এবনে এসহাক বলেছেন, "ফোরকান" অর্থ হক্ব ও বাতিলের মধ্যে ফয়সালা যে, হে মোমেনগণ! যদি তোমরা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর তবে আল্লাহ্ পাক সত্য ও অসত্যের মধ্যে একটি ফয়সালা করে দেবেন। তোমাদের সত্যতা এবং তোমাদের দুশমনদের বাতুলতা প্রমাণ করে দেবেন।[১]

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের শর্তে আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে তিনটি দানের কথা ঘোষণা করেছেন। একটি হলো 'ফোরকান' যার আলোচনা সংক্ষিপ্ত ভাবে করা হলো। দ্বিতীয়টি হলো–

وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

অর্থাৎ- তাকওয়া পরহেযগারীর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ পাক তোমাদের গুনাহ্ সমূহ দূরীভূত করবেন।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো দুনিয়াতে তোমাদের গুনাহ্ সমূহ গোপন রাখবেন, আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তোমাদেরকে নেক আমলের তৌফিক দান করবেন যা গুনাহ্ সমূহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের তৃতীয় পুরস্কার হলো আখেরাতে মাগফেরাত দান। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে আখেরাতে মাগফেরাত দান করবেন। আর তাই হলো মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।

وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"আর আল্লাহ্ পাক মহান দাতা, তাঁর দান অনন্ত-অসীম"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, প্রত্যেকটি আমলের বিনিময় আল্লাহ্ পাক সেই আমলের এখলাস অনুযায়ী বন্দাকে দান করবেন, কিন্তু তাঁর দানের কোন হিসাব নিকাশ নেই। তাই যে বন্দার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হবেন সে বন্দাকে তিনি অনন্ত অসীম নেয়ামত দানে ধন্য করবেন। এটিই আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৯৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৩

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণতঃ সকল মুসলমানের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে বিশেষতঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামে প্রতি যে খাছ অনুগ্রহ করা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ ১৩টি বছর ইসলাম প্রচার করেছেন কিন্তু অত্যন্ত সামান্য সংখ্যক লোকই ইসলাম কবুল করেছেন, মক্কাবাসী পৌত্তলিকরা শুধু যে তাঁর বিরোধিতা করেছে তাই নয়, বরং যারা তাঁর সান্নিধ্যে হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করে ধন্য হতেন তাদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন চালানো হতো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ধীরে ধীরে কিছু লোক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মক্কা শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানগণ নির্যাতীত হলেও মদীনা শরীফ থেকে কিছু লোক এসে ইসলাম কবুল করেছেন। এদিকে নির্যাতীত মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক আবিসিনিয়ায় ও কিছু লোক মদীনা তৈয়েবার পর্যায়ক্রমে হিজরত করলেন। এভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভক্ত অনুরক্তদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

এবনে এসহাক, আবদুর রাজ্জাক, ইমাম আহমদ, আবু নাঈম, এবনুল মুনজের এবং তেবরানী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, মদীনাবাসীগণ যখন ইসলাম কবুল করলেন তখন মক্কার কাফেররা প্রমাদ গুণতে লাগলো এবং অবিলম্বে এর কোন বিহিত ব্যবস্থা করার জন্যে পরামর্শ শুরু করলো। ঐ মজলিসে ইবলিস শয়তান একজন বৃদ্ধ লোকের রূপ ধারণ করে হাযির হলো। লোকেরা তার পরিচয় জানতে চাইলে সে বললো আমি নজদের একজন অধিবাসী, তোমাদের পরামর্শের কথা শুনে হাযির হলাম। এ পরামর্শ সভায় এবনে রবীয়া, শাইবা, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, তাইমা এবনে আদি, নজর এবনুল হারেস, আবুল বক্তরী এবনে হিশাম এবং হাকীম এবনে হেজাম সহ অনেকেই ছিল। সিদ্ধান্ত হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণের। যখন একাধিক লোকের মত নেয়া হলো তখন আবুল বক্তরী বললো, আমার মত হলো মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ধরে এনে সুদৃঢ় ভাবে বেধে একটি ঘরে বন্দী করে রাখ। এরপর অপেক্ষা করতে থাক। অন্যান্য কবিদের মত সে-ও একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে। নজদী শেখের রূপ ধারণকারী ইবলিস বললো তোমার মত সঠিক নয়, কেননা তোমরা যখন তাকে বন্দী করবে তখন তার ভক্ত

লোকেরা এসে তাকে বের করে নিয়ে যাবে। তখন হেশাম এবনে আমর দাড়িয়ে বললো, তাকে একটি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়ে মক্কা থেকে বহিষ্কার কর। সে যখন এখান থেকে বের হয়ে যাবে তখন তোমাদের আর কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। ইবলিস শয়তান পুনরায় বললো, তোমার মতও সঠিক নয়। কেননা সে অন্যত্র গমন করে লোকদেরকে আকৃষ্ট করবে। এরপর তোমাদের উপর হামলা করবে। পূর্বের ন্যায় এবারও লোকেরা ইবলিস শয়তানের মতকে পছন্দ করলো। এরপর আবু জেহেল দাড়িয়ে বললো আমার মতে, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক মনোনীত কর এবং সবাই সমবেত ভাবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি হামলা কর এবং তাকে হত্যা কর। যেহেতু সবাই এ হত্যাকাণ্ডে শরীক হবে, তাই তাঁর গোত্রের লোকেরা সকলের মোকাবেলা করতে পারবে না। তখন তার বিনিময়ে অর্থ সম্পদ দিয়ে তথা দিয়ত আদায় করে বিষয়টির মীমাংসা করা হবে। আবু জেহেলের এ মত সবাই পছন্দ করলো এবং সিদ্ধান্ত হলো আজ রাতে সবাই মিলে তাঁকে হত্যা করবে।

এদিকে আল্লাহ পাক কাফেরদের এ পরামর্শের বিস্তারিত বিবরণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন, আপনি এ রাতেই এখান থেকে মদীনা তৈয়্যেবায় হিজরত করুন।

পরামর্শ মোতাবেক কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাড়ী ঘেরাও করে রাখলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্থলে, তাঁর সবুজ বর্ণের চাদর গায়ে দিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-কে শুয়ে থাকতে নির্দেশ দিলেন। কাফেররা মনে করলো তিনি ঘরে আছেন কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ইয়াসীনের প্রথম আয়াত সমূহ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ পাঠ করে এক মুষ্টি বালু কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষণিকের জন্যে অন্ধ করে দিলেন। তিনি তাদের সম্মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেন। কিন্তু তারা দেখতে পেলো না। তিনি প্রথমে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়ী গেলেন, তাঁকে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। এদিকে সকালে যখন কাফেররা দেখলো যাকে হত্যা করার জন্য এতসব চেষ্টা-তদবীর অথচ তিনি নেই, তাঁর শয্যায় শায়িত রয়েছেন হযরত আলী (রাঃ), তখন কাফেররা বললো মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কোথায়?

হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ আমি জানি না, এভাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াসাল্লামকে রক্ত পিপাসু দুবৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে যখন কাফেররা আপনাকে বন্দী করার অথবা হত্যা করার অথবা দেশত্যাগে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র করে।

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

অর্থাৎ মুশরেকরা এ ষড়যন্ত্র করেছিলো যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেষ্টা ব্যর্থ হোক এবং আল্লাহ পাকের নূর নিষ্প্রভ হয়ে যাক। কিন্তু আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলেন তাঁর দ্বীন কায়েম হোক এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর হল। কেননা, আল্লাহ পাকের কৌশল সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতে বাধা দিতে পারে এমন কেউ নেই। যারা তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক হয়েছিলো তাদের অধিকাংশই বদরের যুদ্ধে চির বিদায় নেয়। আবু জেহেল সহ যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যার কুপরামর্শ করেছিলো, আল্লাহ পাক তাদের নিপাত করলেন।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের অনুগত থাক এবং আল্লাহর রহমত তোমাদের প্রতি থাকে তবে কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। যেভাবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হেফাজত করেছেন, ঠিক তেমনি তোমাদের পরিবারবর্গের যে সব লোক এখনও মক্কা শরীফে রয়েছে তাদেরকেও তিনি হেফাজত করতে পারেন।[১]

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা এবং চক্রান্তের কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৭

শানে নুযুল

এবনে জরীর সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গে আকাবা এবনে আদি এবং নজর এবনে হারেস বন্দী হয় এবং মারা যায়। নজর এবনে হারসেকে বন্দী করেছিলেন হযরত মেকদাদ (রাঃ)। তার সম্পর্কে যখন মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয় তখন হযরত মেকদাদ (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম)! সে আমার কয়েদী! তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করতো তাই তার শাস্তি একান্ত জরুরী। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, নজর এবনে হারেস একবার ব্যবসায়ের জন্যে সফরে যায়। তখন সে কিচ্ছা-কাহিনীর কিছু বই নিয়ে আসে। ঐ বইগুলো পাঠ করার জন্যে সে মজলিস করতো এবং গল্প-গুজব ও হাসি-ঠাট্টায় মশগুল হত। আর এ আপত্তিকর মন্তব্যও করতো যে, (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যে গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন তাও এমন কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।[২]

قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا

"আমরা কোরআন শ্রবণ করেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন কথা বলতে পারি"।

অথচ পবিত্র কোরআন বারে বারে বহু বছর ধরে এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসেছে যে, যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তবে তোমরা পবিত্র কোরআনের অনুরূপ কালাম পেশ কর। কিন্তু তোমরা তার মোকাবেলা করতে সক্ষম হওনি। যদি কেউ বলে, আমার অশ্ব যদি চলতে পারে তবে এক দিনেই সমগ্র বিশ্বভ্রমণ করতে পারে কিন্তু তার অশ্ব কোন দিন চলে না– একথাটি যেমন সম্পূর্ণ অর্থহীন, তেমনি নজর এবনে হারেসের কথাও অর্থহীন। শুধু তাই নয়; নজর এবনে হারেস আরও জঘন্য কথা বলেছে যা পরবর্তী আয়াতে রয়েছেঃ

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ

হে আল্লাহ! যদি এই কোরআন অথবা এই দ্বীন ইসলাম সঠিক হয় আর তোমার তরফ থেকেই হয় তবে (আমরা তা মানবো না), আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা কর, আমাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ কর, আসমানী আযাব দ্বারা আমাদের মূলোৎপাটন কর, আমাদের শাস্তির ব্যাপারে বিলম্ব কেন? এমন চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাও বলেছে নজর এবনে হারেস। তার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের এ আয়াতও নাযিল হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৯
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৫৬

سَالَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, নজর এবনে হারেস এমন সব আপত্তিকর মন্তব্য করতো, তার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। অবশেষে বদ্‌রের যুদ্ধের দিন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। যুগে যুগে কাফেররা আল্লাহর আযাবকে ত্বরান্বিত করার জন্যে এমন ঔদ্ধত্য এবং ধৃষ্টতার পরিচয় দিত। কিন্তু আল্লাহ পাক কারো কথায় আযাব নাযিল করতেন না, তাঁর বিধান কার্যকর হয় যথা নিয়মে। নজর এবনে হারেসের ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যে কারণে বর্তমানে তাদের প্রতি আযাব প্রদান করা হয় না তা হল (হে রসূল!) আপনি রাহমতুল্লিল আলামীন, যতদিন আপনি তাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন ততদিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে না। আর একটি কারণেও আযাব মূলতবী রাখা হয় তা হল, যদি লোকেরা তাদের কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, ঐ অবস্থায়ও করুণাময় আল্লাহ পাক আযাব নাযিল করেন না।[১] পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ.....

অর্থাৎ (হে রসূল!) যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে রয়েছেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে আযাব দেবেন না। আর যে পর্যন্ত তারা ক্ষমাপ্রার্থী হতে থাকবে আল্লাহ পাক তাদেরকে আযাব দেবেন না।

এ বাক্যে একদিকে আপাততঃ আযাব নাযিল না হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মক্কা শরীফ ছেড়ে চলে যাবেন তখন তাদের প্রতি আযাব নাযিল হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপত্তার দু'টি পন্থা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

১. আল্লাহর নবীর বর্তমান থাকা।

২. আল্লাহ পাকের দরবারে এস্তেগফার করা তথা কৃত অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আল্লাহর নবী পৃথিবী থেকে তশরীফ নিয়ে গেছেন। আর এস্তেগফারের পন্থা কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। যে আল্লাহ পাকের দরবারে এস্তেগফার করবে আল্লাহ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৯-২৩০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৯০-৯১

পাক তাকে আযাব দেবেন না। এ ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা এবং সুদ্দী (রঃ)। তাঁরা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে এস্তেগফারের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এস্তেগফারের পন্থাই অবশিষ্ট রয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে এস্তেগফার অর্থ ইসলাম অর্থাৎ তারা যদি ইসলাম কবুল করে তবে তাদের প্রতি আযাব হবে না। যেমন অনেক লোক পরবর্তীতে ইসলাম কবুল করেছে। যেমন আবু সুফিয়ান এবনে হারব, হারেস এবনে হেশাম, হাকিম এবনে হেজাম এবং আরো অনেকে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও করেছেন যে, আল্লাহ পাক কাফেরদের এমন অবস্থায় আযাব দেবেন না যখন তাদের মাঝে কিছু মোমেন এস্তেগফাররত অবস্থায় থাকবে, আর আলোচ্য বাক্যটির এ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ কাফেরদেরকে আল্লাহ্ পাক আযাব দেবেন না এজন্যে যে, আল্লাহ পাকের জানা আছে যে, তাদের বংশধরদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনবে ও আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার করবে।[১]

وَمَا لَهُمْ أَلَّا
يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا
أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ
عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ
بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৫৮

তরজমা

(৩৪) আর তাদের এমন কি আছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আযাব দেবেন না, তারা তো মানুষকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়, অথচ তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

(৩৫) আর কা'বা গৃহের নিকট তাদের নামায কি ছিল? শুধু শিষ ও করতালি দেয়া, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অতএব, তোমরা শাস্তি ভোগ কর তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে।

(৩৬) নিশ্চয় যারা কাফের তারা আল্লাহ পাকের পথ থেকে মানুষকে বারণ রাখার উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে, তারা ব্যয় করতে থাকবে, অবশেষে তাই তাদের আক্ষেপে পরিণত হবে। অতঃপর তারা পরাজয় বরণ করবে এবং যারা কাফের তাদেরকে দোযখে একত্রিত করা হবে।

(৩৭) কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করবেন এবং অপবিত্রদের এককে অপরের উপর রাখবেন। অতঃপর স্তূপীকৃত করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন, তারাই হবে সর্বস্বান্ত।

তফসীরুল কোরআন

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বর্তমান থাকার কারণে এখন তাদের প্রতি আযাব নাযিল হয় না, কিন্তু তারা তাদের অন্যায় আচরণের কারণে অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কি কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে আযাব দেবেন না? কেননা তারা অমার্জনীয় অপরাধ করে চলেছে।

وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তারা মানুষকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়। আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করতে দেয় না। আর এ ভিত্তিহীন দাবী করে যে, তারা পবিত্র মসজিদে হারামের মোতাওয়াল্লী বা অভিভাবক।

وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ط

অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা মসজিদের মোতাওয়াল্লী নয়, কেননা যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, যারা মানবতার কলংক শেরক ও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস

করে, যারা সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, পবিত্র কাবা শরীফের মোতাওয়াল্লী হওয়ার তাদের কোন অধিকারই নেই কিন্তু এ সত্য তাদের অনেকেই জানে না। এ আয়াতের তফসীরে শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেন, কোরায়শরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর বলে দাবী করে নিজেদেরকে ওয়ারিশ সূত্রে কা'বা শরীফের মোতাওয়াল্লী মনে করতো। তাই পবিত্র কোরআনও আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে–

اِنْ اَوْلِيَاؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ

অর্থাৎ- শুধু মোত্তাকী পরহেযগারগণই পবিত্র কা'বা শরীফের মোতাওয়াল্লী হবে, আর মোত্তাকী বা পরহেযগার হওয়ার জন্যে ঈমান বা ইসলাম গ্রহণ পূর্বশর্ত। এতদ্ব্যতীত, কা'বা শরীফের মোতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকার শুধু সে ব্যক্তির যে এর হক্ব আদায় করে এবং সঠিক ভাবে নামায কায়েম করে। কিন্তু তাদের অবস্থা কি? এ প্রশ্নের জবাবেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةًط

আর তাদের নামায-তো হলো শুধু পবিত্র কা'বা শরীফের নিকট শিষ ও করতালি দেয়া, এছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, এমন লোক কিভাবে কা'বা শরীফের মোতাওয়াল্লী হতে পারে? বস্তুতঃ তারা হলো শাস্তির যোগ্য অপরাধী। অতএব, হে মোতাওয়াল্লী হওয়ার দাবীদার!

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

'তোমরা তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে আল্লাহ পাকের আযাব ভোগ করতে থাক'।

বর্ণিত আছে জাহেলিয়াতের যুগে মুশরেকরা শুধু যে পবিত্র কা'বা শরীফের নিকট শিষ দিতো তাই নয়, বরং কি নারী কি পুরুষ সবাই উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতো। কোরায়শ গোত্রের লোক ব্যতীত অন্যদের জন্যে পোশাক পরিহিত অবস্থায় তওয়াফ করার অনুমতি ছিল না। এভাবে তারা পবিত্র কা'বা শরীফের অসম্মান করতো। অতএব, এমন লোকের আল্লাহর ঘরের মোতাওয়াল্লী হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুশরেকদের শারীরিক এবাদত নাফরমানী ব্যতীত আর কিছু নয়। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুশরেকদের আর্থিক এবাদতও কুফরী এবং নাফরমানী ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, "নিশ্চয় যারা কাফের, তারা তাদের অর্থ সম্পদ এজন্যে ব্যয় করে যেন মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে পারে। তারা এভাবে আরো সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে তবে তাদের এ অর্থ সম্পদ ব্যয় তাদের জন্যে অত্যন্ত আক্ষেপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাজিত হবে এবং এ কাফেরদেরকে অবশেষে দোযখে একত্রিত করা হবে"।

আলোচ্য আয়াতে বদরের যুদ্ধে কাফেররা যে ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের এ অর্থ ব্যয়ের জন্যে অবশেষে তারা আক্ষেপ করতে থাকবে।

বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে মুশরেকরা যে এক হাজার সৈন্য এনেছিল তার ব্যয় ভার বহন করেছিল বার জন মুশরেক সর্দার। তারা প্রত্যেক দিন বারটি করে উষ্ট্রী জবেহ্ করতো। এ অর্থ ব্যয়ের জন্যে আক্ষেপ করতে থাকে, পরাজিত হয়ে যখন মুশরেকরা মক্কায় প্রত্যবর্তন করে তখন আবু সুফিয়ানের কাফেলার যাবতীয় সম্পদও বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্যে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَسَيُنْفِقُوْنَهَا

তারা এভাবে ব্যয় করতেই থাকবে, তবে কোন লাভ হবে না। দুনিয়াতে পরাজয়ের গ্লানি, অর্থ সম্পদ ব্যয় করার জন্যে আক্ষেপ এবং অবশেষে দোযখের কঠিন শাস্তি। এই হবে তাদের পরিণাম।

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

আর এ ব্যবস্থা এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাক সত্য-অসত্য এবং পবিত্র-অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য করে দিতে চান।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "খবিস" বলা হয়েছে কাফেরকে, আর "তৈয়্যেব" শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্যে করা হয়েছে মোমেনকে, যারা মোমেন তারা থাকবে জান্নাতে, আর যারা কাফের তারা থাকবে দোযখে। এজন্যে সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

দুনিয়াতে ভাল-মন্দ একই সঙ্গে থাকে। কিন্তু কেয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে- হে পাপীষ্ঠরা! আজকের দিনে তোমরা পৃথক হয়ে যাও। অতএব, যারা আল্লাহ্‌র রসূলের বিরোধিতা করে তারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানই হারায়। তাই তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অর্থাৎ- তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, একুল ওকুল দু' কুলই হারিয়ে তারা হলো সর্বস্বান্ত।

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ
مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۳۸
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ
لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۳۹ وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۴۰

তরজমা

(৩৮) (হে রসূল!) কাফেরদেরকে বলে দিন, তারা যদি বিরত হয় তবে তাদের অতীতের গুনাহ মাফ করা হবে, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তী লোকদের দৃষ্টান্ততো রয়েছেই।

(৩৯) (হে মোমেনগণ!) তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভুত হয় এবং আল্লাহ পাকের দ্বীন সম্পূর্ণ ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ করছেন।

(৪০) আর যদি তারা না মানে তবে জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সহায়ক তিনি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে যত ধনবল এবং জনবলই ব্যবহার করুক না কেন, অবশেষে ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তারা হবে তখন অনুতপ্ত, লজ্জিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত, আর আখেরাতে হবে কোপগ্রস্ত। আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কিভাবে এ ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা যায় তার পন্থা, সে পন্থা হলো ইসলামের বিরোধিতা বর্জন করা এবং ইসলাম গ্রহণ করে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্যমণ্ডিত হওয়া। যদি তা কর তবে অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। তাই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

(হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন, যদি তারা কুফরী ও নাফরমানী পরিহার করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে তবে

اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ج

'তাদের অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আল্লাহ পাক তাঁর হক্ব মাফ করে দেবেন। কিন্তু বন্দার হক্ব থাকবে অর্থাৎ মানুষের দেনা পাওনা মাফ হবে না তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। যেমন হাদীস শরীফে আছে-

الاسلام يهدم ما كان قبله

ইসলাম গ্রহণের পূর্বের কৃত গুনাহ ইসলাম বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু তারা যদি এখনও কুফর ও নাফরমানী বর্জন না করে তবে সত্যদ্রোহীতার জন্যে পূর্বকালের লোকেরা যে শোচনীয় পরিণাম ভোগ করেছে সেই পরিণাম এ কাফেরদের জন্যেও প্রস্তুত রয়েছে।

وَقَاتِلُوْهُمْ

অর্থাৎ- যদি কাফেররা ইসলামের প্রচারে বাধা দিতে থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জেহাদ করতে থাক, যে পর্যন্ত না তাদের দৌরাত্ম এবং ইসলামদ্রোহীতা বন্ধ না হয়।

মুসলমানগণ যেন নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করতে পারে, আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলতে পারে বিনা বাধায়, কাফেরদের অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে মুসলমানদের জান-মাল ইজ্জত যেন নিরাপদ থাকে– এ উদ্দেশ্যেই জেহাদের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ অশান্তি হলো শেরক। তাই শেরক ও কুফরের দাপট বন্ধ করা এবং এক আল্লাহ পাকের দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হলো জেহাদের মূল লক্ষ্য। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য ধর্ম নিয়ে, যেন তিনি সকল বাতিল মতবাদের উপর সত্য ধর্ম দ্বীন ইসলামকে প্রাধান্য দেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর এ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদেরকে জেহাদ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন মক্কা বিজয়ের দিন এ অবস্থাই হয়েছিল।

فَاِنِ انْتَهَوْا

তবে যদি তারা কুফর ও নাফরমানী থেকে, ইসলামের শত্রুতা থেকে এবং মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার থেকে বিরত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে তবে আল্লাহ পাক তাদের নেক আমলের বিনিময় অবশ্যই দান করবেন। কেননা, তিনি তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে সে পর্যন্ত কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" স্বীকার করে নেয়, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, যখন এ কাজগুলো তারা করে নেবে তখন আমার তরফ থেকে তাদের জান মাল সংরক্ষিত থাকবে। অবশ্য যদি হক্কুল এবাদের কারণে কোন কিছু আদায় করতে হয় তা স্বতন্ত্র কথা যেমন খুনের বদলা কেসাস বা দিয়ত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ পাকের কাছে হবে। অর্থাৎ কে শুধু জান মালের হেফাজতের জন্যে ইসলাম কবুল করেছে, আর কে সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়েছে এ বিষয়ের বিচার আল্লাহ পাকই করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের আরও একটি অর্থ হলো যদি তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয় মুসলমান হয়ে, অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের জিম্মি

হয়ে তবে তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করোনা, তাদের অবস্থা আল্লাহ পাক পর্যবেক্ষণ করেছেন, যদি তারা খাঁটি মুসলমান হয় তবে তার শুভ পরিণতি তারা লাভ করবে। আর যদি কাফের থাকে তবে তার শাস্তিও ভোগ করবে।

وَاِنْ تَوَلَّوْا

আর যদি তারা ইসলামের দাওয়াত না মানে, কুফর ও নাফরমানী থেকে বিরত না হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে এবং জেহাদ থেকে বিরত হয় তবে-

فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, আল্লাহ পাকই তোমাদের অভিভাবক, আল্লাহ পাকই তোমাদের সহায়, তিনি অতি উত্তম সহায়, উত্তম সাহায্যকারী। তিনি তাঁর আপন বন্দাদের হেফাজত করেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, আনুগত্য প্রকাশ করে তারা তাঁর রহমত থেকে মাহরুম হয় না। অতএব, মুসলমানের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের উপরই ভরসা করা, আল্লাহ পাকের সাহায্য মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট, তাই কাফেরদের জনবল, ধনবল, অস্ত্রবলের কারণে মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা মুসলমানদের শক্তির মূল উৎস সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আর ঈমানী শক্তির মোকাবেলা করার সাধ্য কারোই নেই। আর আল্লাহ পাকের চেয়ে বড় সাহায্যকারীও কেউ নেই। বদরের যুদ্ধের ঘটনা একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৯৯

আলহামদুলিল্লাহ্! অদ্য ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং মোতাবেক ২৪শে জমাদিউল আউয়াল ১৪১১ হিজরী, রোজ বৃহস্পতিবার তফসীরে নূরুল কোরআনের নবম খন্ড (নবম পারা) সমাপ্ত হলো।